কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণী

রচনা

মোহাম্মদ হোসেন ভূঁইয়া

ডঃ মোঃ আবদুল হক

মোঃ আমিনুল ইসলাম

আলাউদ্দিন বিশ্বাস

সম্পাদনা

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

চিত্রাঙ্কন
বীরেন সোম

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে : অঙ্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওয়েব বিন্যাস)

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নকর্ম মুলত কৃষিভিত্তিক এবং কৃষিশিক্ষা গ্রহণ ও দক্ষতা অর্জন হচ্ছে কৃষি-উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। তাই মাধ্যমিক স্তরে কৃষি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে কৃষির প্রয়োগযোগ্য প্রযুক্তিসমূহের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক- এই উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। সেদিক বিবেচনা করে এই পুস্তকে কৃষিশিক্ষা, উদ্যান ও ফসল, বনায়ন, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশুপাখি পালনের প্রায়োগিক প্রযুক্তিসমূহ সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থান, শ্রম ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য ব্যবহারিক কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণীর কৃষিশিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষি জলবায়ু

আবহাওয়া ও জলবায়ু

কোনো দেশের জলবায়ু সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমে সে দেশের আবহাওয়া সম্পর্কে জানা দরকার। আবহাওয়া বলতে কোনো স্থানের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, সূর্য কিরণ, বায়ুর চাপ, কুয়াশা প্রভৃতির দৈনিক সামগ্রিক অবস্থাকে বোঝায়। আবহাওয়া দিনের যে কোনো সময়ের জন্য হতে পারে। আবহাওয়া প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। কোনো স্থানের ২০-২৫ বছরের আবহাওয়ার গড়কে সেই স্থানের জলবায়ু বলা হয়। জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ, সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, সমুদ্র হতে দূরত্ব, বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, সমুদ্র স্রোত, পাহাড় ও গাছপালার ওপর। জলবায়ু কৃষি উৎপাদনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই গাছপালা ও কৃষি উৎপাদন দেখেও কোনো স্থানের জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, দূরত্ব, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ বা সমভাবাপন্ন। পরিমিত বৃষ্টিপাত, মধ্যম শীতকাল ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের জলবায়ু কৃষি উৎপাদনের জন্য খুবই সহায়ক।

বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে ফসল উৎপাদনের জন্য সারা বছরকে প্রধানত ২টি মৌসুমে ভাগ করা হয়েছে; যথা-

ক. রবি মৌসুম

খ. খরিপ মৌসুম।

ক. রবি মৌসুম

আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়কে (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য মার্চ) রবি মৌসুম বলে। এই মৌসুমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত কম। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, গাজর, লাউ, শিম, টমেটো, শীতকালীন সবজি, বোরো ধান, গম, আলু ও সরিষা এই মৌসুমের প্রধান মাঠ ফসল। ফসল ফলানোর জন্য এই মৌসুমে পানি সেচের দরকার হয়।

খ. খরিপ মৌসুম

খরিপ মৌসুমকে পুনরায় ২ ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

১. খরিপ-১

২. খরিপ-২।

খরিপ-১

চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়কে (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুলাই) খরিপ-১ বলা হয়।

এই সময়কে গ্রীষ্মকালও বলে। এই মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকে। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হয়। এই মৌসুমে আউশ ধান, পাট, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া, করলা, পটল, কাকরোল, বরবটি ইত্যাদির চাষ হয়। বৃষ্টিপাত কম হলে খরিপ-১ মৌসুমেও পানিসেচের ব্যবস্থা করতে হয়। আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ফল।

খরিপ-২

আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে (মধ্য জুন থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর) খরিপ-২ বলা হয়। এই মৌসুমকে বর্ষাকালও বলা হয়। এই মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে এবং তাপমাত্রা মাঝারি মাত্রার হয়। এই মৌসুমে আমন ধান ও বর্ষাকালীন শাকসবজির চাষ হয়। এই মৌসুমে জাম্বুরা (বাতাবি লেবু), তাল, নাবী জাতের আম, কাঁঠাল, আমলকি, জলপাই ইত্যাদি ফল পাওয়া যায়।
বারমাসি সবজি যেমন- লালশাক, বেগুন, ঢেঁড়স ইত্যাদি সারা বছরই জন্মে।

কৃষি আবহাওয়া ও জলবায়ু

ফসল উৎপাদনের জন্য বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা, বায়ুর চাপের দৈনন্দিন অবস্থাকে কৃষি আবহাওয়া বলে। বাংলাদেশের ফসল উৎপাদন মূলত কৃষি আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। কৃষি আবহাওয়া বিবেচনা করে কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি আবহাওয়ায় বিভিন্নতা রয়েছে। কৃষি আবহাওয়ার এই বিভিন্নতার কারণেই এক এক অঞ্চলে এক এক রকম ফসল ভালো জন্মে। জলবায়ু ও আবহাওয়ার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ৩টি কৃষি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

১. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
২. উত্তর-পূর্বাঞ্চল
৩. দক্ষিণাঞ্চল।

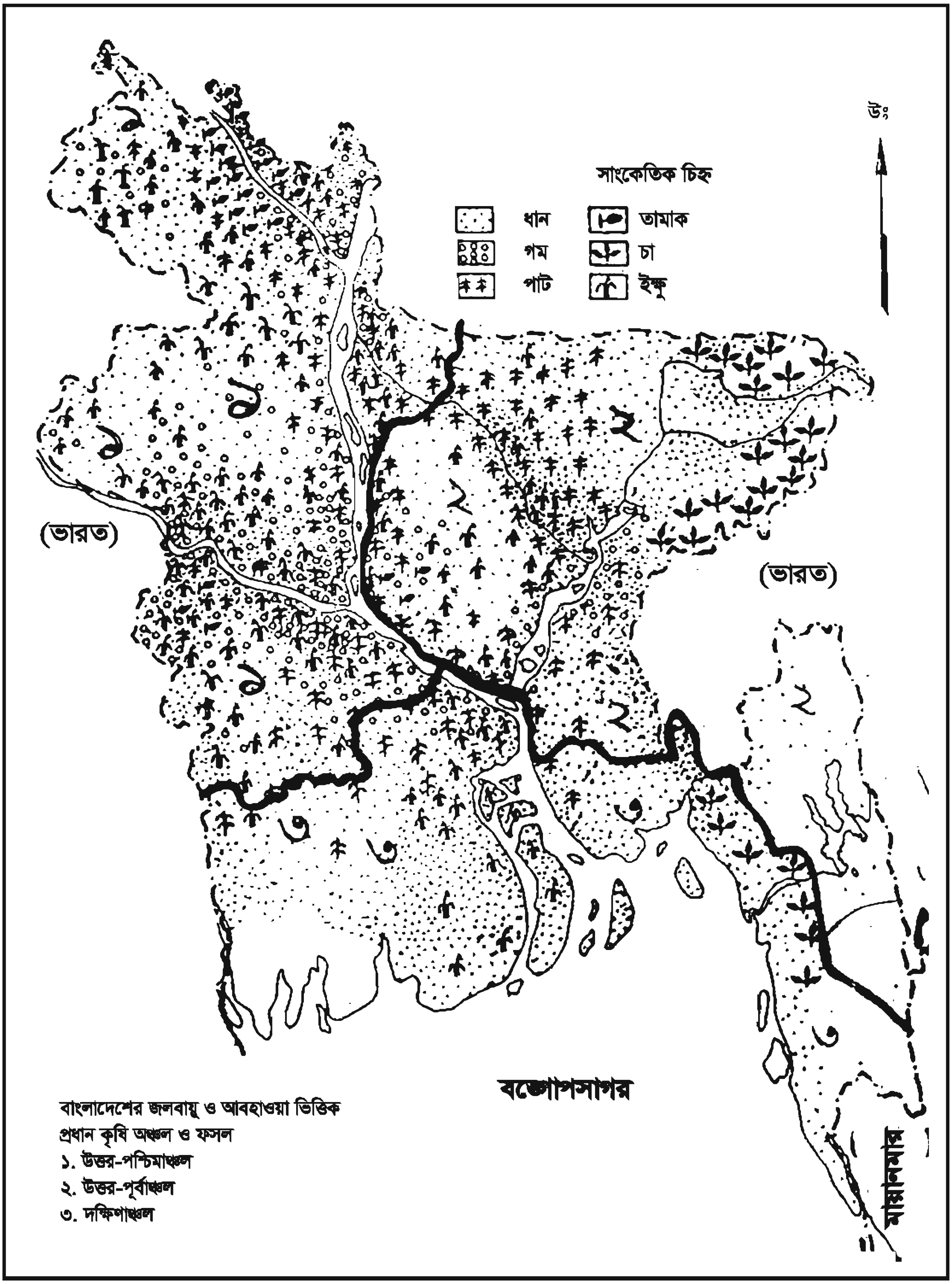
নিচে এসব অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের উত্তরাংশে আর্দ্রতা তুলনামূলকভাবে কম। ধান, গম, আলু, আখ, বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, আম, কাঁঠাল, কুল, লিচু, তামাক, মরিচ, ডাল ইত্যাদি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ফসল।

২. উত্তর-পূর্বাঞ্চল

সিলেট, ঢাকার পূর্বাঞ্চল ও চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা কম থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। এখানকার প্রধান প্রধান ফসল ধান, পাট, চা, আনারস, তেল ফসল এবং নানা প্রকার শাকসবজি।


উঃ
সাংকেতিক চিহ্ন
ধান
গম
পাট
তামাক
চা
ইক্ষু
(ভারত)
(ভারত)
বঙ্গোপসাগর
মায়ানমার
বাংলাদেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া ভিত্তিক
প্রধান কৃষি অঞ্চল ও ফসল
১. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
২. উত্তর-পূর্বাঞ্চল
৩. দক্ষিণাঞ্চল

৩. দক্ষিণাঞ্চল

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। সমগ্র বরিশাল বিভাগ, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের দক্ষিণাঞ্চল, ঢাকা বিভাগের দক্ষিণের কিছু অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রার তারতম্য তুলনামূলকভাবে কম। সমুদ্রের কাছাকাছি বলে এখানে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশি। এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান ফসল ধান, ডাল, নারিকেল, পান, সুপারি, কলা, পেঁয়াজ, মরিচ ও আলু।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন?

ক. চরম ভাবাপন্ন খ. নিরক্ষীয়
গ. ভূমধ্যসাগরীয় ঘ. সমভাবাপন্ন

২. বৃষ্টিপাত বেশি হয় বাংলাদেশের -

i. উত্তর-পূর্বাঞ্চলে
ii. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে
iii. দক্ষিণাঞ্চলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাবিনা বেগম পড়ন্ত বিকালে গায়ের পথ ধরে হাঁটছিলেন; হঠাৎ ঝড়ো বাতাস আর মেঘের গর্জন শুরু হলে তিনি দৌড়ে নিকটবর্তী একটি স্থানে আশ্রয় নিলেন। এর পরই শুরু হল ব্যাপক শীলাবৃষ্টি।

৩। অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌসুম হল -

i. রবি
ii. খরিপ- ১
iii. খরিপ- ২।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৪. বর্ণিত মৌসুমে কোন কোন ফসল উৎপাদিত হয়?

ক. ফুলকপি, বাঁধাকপি ও শিম খ. লালশাক, বেগুন ও ঢেঁড়স

গ. ঢেঁড়স, পুঁইশাক ও মিষ্টিকুমড়া ঘ. টমেটো, মুলা ও গাজর

সৃজনশীল প্রশ্ন

কৃষিবিদ মি. জাবেদ একদিন গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে গিয়ে কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে স্থানীয় কৃষি আবহাওয়া ও ফসল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন অঞ্চল ভেদে সামান্য তারতম্য থাকলেও পরিমিত বৃষ্টিপাত, মধ্যম শীতকাল ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষি আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক রকম ফসল ভালো জন্মে। তাই তিনি কৃষি আবহাওয়া বিবেচনায় রেখে এলাকার কৃষকদেরকে ফসল উৎপাদনের পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

ক. জলবায়ু বলতে কী বোঝ?

খ. ''কৃষি আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক রকম ফসল ভালো জন্মে'' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. কৃষিবিদ জাবেদ চাঁদপুরের কৃষকদেরকে খরিপ-১ মৌসুমে সম্ভাব্য কোন ফসল চাষ করার পরামর্শ দিচ্ছিলেন? কেন?

ঘ. চাঁদপুরে গম চাষের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাটি

মাটির ধারণা

মাটি বলতে সাধারণত পৃথিবীর নরম উপরিভাগকে বোঝায়। মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের মতে ভূপৃষ্ঠের যে নরম স্তরে গাছপালা জন্মে ও গাছ পুষ্টি শোষণ করে বড় হয় তাকে মাটি বলে। মাটি বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থ, অজৈব পদার্থ, পানি ও বায়ু দ্বারা গঠিত।

মাটির গঠন

মাটিকে আমরা এখন যে অবস্থায় দেখছি আদিতে এরূপ ছিল না। মাটির বর্তমান অবস্থা লাভ করতে বহু বছর লেগেছে। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন একটি উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড রূপে পৃথিবীর সৃষ্টি। এই গ্যাসপিণ্ড সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমান্বয়ে ঠান্ডা হয় এবং এর উপরিভাগে অনেক বড় বড় শিলার উৎপত্তি হয়। এই শিলাগুলো হচ্ছে আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলা। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় তাপ, ঠান্ডা, তুষারপাত, বায়ুপ্রবাহ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলাগুলো ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হয়। আরো পরে গাছপালা ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ পচে মাটিতে মিশে কৃষিকার্যের উপযোগী হয়। অতএব, মাটি হচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিলাকণা, জৈবকণা, পানি ও বায়ুর সংমিশ্রণে গঠিত একটি মিশ্র পদার্থ।

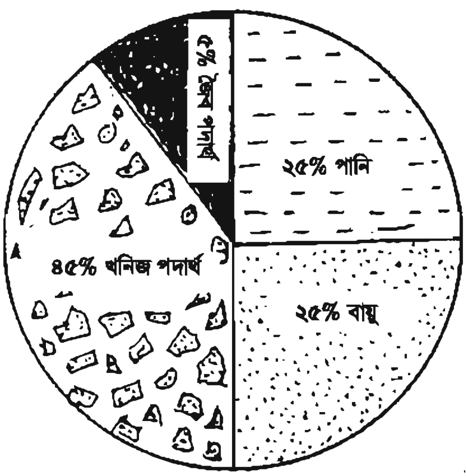
মাটি গঠনের উপাদান

মাটির উপাদান ৪টি; যথা-

১. খনিজ ও অজৈব পদার্থ
২. জৈব পদার্থ
৩. পানি
৪. বায়ু।

১. খনিজ পদার্থ

সূর্যের তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বহু বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের আদি শিলা ক্ষয়ীভূত হয়ে খনিজ পদার্থে পরিণত হয়েছে। বালিকণা, কর্দমকণা, পলিকণা হচ্ছে খনিজ পদার্থ। এই সব খনিজ পদার্থ নানাভাবে মিশে মাটির বুনট সৃষ্টি হয়েছে। এক এক শ্রেণীর মাটির বুনট এক এক ফসলের জন্য উপযোগী। মাটির খনিজ কণাগুলো পরস্পর মিলে যৌগিক কণা গঠন-করে একে বলা হয় মাটির দানাবন্ধন বা গঠন। দানাবন্ধন হওয়ার ফলেই মাটি সছিদ্র হয় এবং তাতে সহজে বায়ু ও পানি স্থান করে নিতে পারে। দানাযুক্ত এবং সচ্ছিদ্র মাটি কৃষি কাজের জন্য উপযোগী। মাটিতে শতকরা ৪৫ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে।



আদর্শ মাটির গঠন উপাদানের পরিমাণ

২. জৈব পদার্থ

মৃত গাছপালা ও জীবজন্তু মাটিতে পচে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে জৈব পদার্থ বলে। মাটিতে জৈব পদার্থ যুক্ত হলেই মাটির গঠন কাজ সম্পূর্ণ হয়। জৈব পদার্থ মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি করে। যেমন- শক্ত এঁটেল মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটলে মাটি নরম হয় এবং মাটির গঠন উন্নত মানের হয়।

জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয়। কারণ, জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে মাটিস্থ অণুজীবগুলো ক্রিয়াশীল হয়। ফলে কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খাদ্য উপাদান গাছের গ্রহণ উপযোগী হয়। এছাড়া

হিউমাস সৃষ্টি হয়, যা মাটির উর্বরতার জন্য খুবই দরকারি। জৈব পদার্থ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৫ ভাগ।

৩. পানি

পানি মাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাটিস্থ পানি গাছের খাদ্য উপাদানগুলোকে দ্রবীভূত রাখে এবং মাটিকে রসালো রাখে। ফলে গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে সেগুলো শোষণ করে নিতে পারে। বৃষ্টির পানি ও সেচের পানিই মাটির পানির প্রধান উৎস। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে পানি জমা থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় মাটিতে শতকরা ২৫ ভাগ পানি থাকা দরকার।

৪. বায়ু

বায়ু মাটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। মাটির বায়ুতে বিদ্যমান অক্সিজেন জীবকার্যে লাগে। জমি চাষ দিলে মাটিতে বায়ু চলাচল বাড়ে। মাটিতে বায়ুর পরিমাণ হল শতকরা ২৫ ভাগ।

মাটির প্রকার

মাটির অজৈব অংশ বিভিন্ন প্রকার কণা দ্বারা গঠিত; যথা– মোটা বালিকণা, সূক্ষ্মকণা, পলিকণা ও কর্দমকণা। আন্তর্জাতিক পরিমাপ অনুযায়ী কণাগুলোর আকৃতি নিম্নরূপ-

মাটির কণার নাম	ব্যাস (মিলিমিটার)
মোটা বালিকণা	০.২-২.০
সূক্ষ্ম বালিকণা	০.০২-০.২
পলিকণা	০.০০২-০.০২
কর্দমকণা	০.০০২ এর চেয়ে কম

উল্লিখিত কণাগুলো বিভিন্ন অনুপাতে মিশে মাটির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বুনট সৃষ্টি করে। মাটির বুনটের ওপর ভিত্তি করেই মাটিকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা-
ক. বেলে মাটি খ. দোআঁশ মাটি গ. এঁটেল মাটি

ক. বেলে মাটি

যে মাটিতে শতকরা ৭০ ভাগ বা তারও বেশি বালিকণা থাকে তাকে বেলে মাটি বলে। মরুভূমি চরাঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলে বেলে মাটি দেখা যায়। বেলে মাটির কণাগুলো বড় বড়। এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম। মাটির ছিদ্র বেশি হওয়ার কারণে পানি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং অধিক পরিমাণে বায়ু চলাচল করে। এতে জৈব পদার্থ নেই। বেলে মাটি কৃষি কাজের উপযোগী নয়। বালির কণা মিহি হলে এবং মাটিতে প্রচুর গোবর, কমপোস্ট, সবুজ সার ইত্যাদি প্রয়োগ করলে চিনা, কাউন, ফুটি, তরমুজ, আলু এসব চাষ করা যায়।

খ. দোআঁশ মাটি

যে মাটিতে বালি, পলি ও কর্দমকণা প্রায় সমান অনুপাতে বিদ্যমান থাকে তাকে দোআঁশ মাটি বলে। তবে আদর্শ দোআঁশ মাটিতে অর্ধেক বালি এবং বাকি অর্ধেক পলি ও কর্দম কণার মিশ্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়। দোআঁশ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি। এই মাটির পানি শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা উভয়ই বেশি। এই মাটি চাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এসব কারণে প্রায় সব ধরনের ফসলই এই মাটিতে ভালো জন্মে। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মাটিই দোআঁশ মাটি। কৃষিক্ষেত্রে দোআঁশ মাটিকে আদর্শ মাটি বলা হয়।

দোআঁশ মাটিকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন-

১. বেলে দোআঁশ মাটি
২. পলি দোআঁশ মাটি
৩. এঁটেল দোআঁশ মাটি।

নিচে বিভিন্ন প্রকারের মাটির পরিচয় দেওয়া হল।

১. বেলে দোআঁশ মাটি

যে দোআঁশ মাটিতে বালিকণার পরিমাণ বেশি থাকে তাকে বেলে দোআঁশ মাটি বলে। তিস্তার অববাহিকায় এই মাটির আধিক্য লক্ষ করা যায়। এই মাটিতে মুলা, তামাক, মরিচ এসব ফসল ভালো জন্মে।

২. পলি দোআঁশ মাটি

যে দোআঁশ মাটিতে পলিকণার পরিমাণ বেশি, তাকে পলি দোআঁশ মাটি বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পলি দোআঁশ মাটি দেখা যায়। এই মাটিতে ধান, পাট, গম, আখ, আলু ও শাকসবজি ভালো জন্মে।

৩. এঁটেল দোআঁশ মাটি

যে দোআঁশ মাটিতে কর্দমকণার পরিমাণ বেশি তাকে এঁটেল দোআঁশ মাটি বলে। গঙ্গার অববাহিকা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই মাটিতে ধান, তুলা, গম, ডাল, তেল ফসল ফলন ভালো হয়।

গ. এঁটেল মাটি

যে মাটিতে শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ কর্দম কণা থাকে তাকে এঁটেল মাটি বলে। এঁটেল মাটিকে ভারী মাটিও বলা হয়। এই মাটির সচ্ছিদ্রতা কম। তাই এর পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। কিন্তু নিষ্কাশন ক্ষমতা কম। পানির সংস্পর্শে এঁটেল মাটি খুবই নরম হয় আবার শুকালে খুব শক্ত হয়। প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ করে এই মাটিকে দোআঁশ মাটিতে রূপান্তর করা যায়। ধান, পাট, আখ ও শাকসবজি এই মাটিতে ভালো জন্মে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ মাটির বুনট নির্ধারণ

উপকরণ

মাটি, পাত্র ও পানি।

কাজের ধাপ

১. মাঠ হতে কিছু মাটি সংগ্রহ কর।
২. সংগৃহীত মাটি একটি পাত্রে রেখে গুঁড়া কর।
৩. এক মুঠ গুঁড়া মাটি হাতে নিয়ে পানি মেশাও।
৪. দলা বানাতে চেষ্টা কর।
৫. মাটি যদি দলা না হয় তবে তা হবে বেলে মাটি।
৬. যদি দলা বানানো যায় এবং চ্যাপ্টা করা যায় তাহলে হবে এটেঁল মাটি।
৭. যদি দলাটি চ্যাপ্টা না হয়ে ভেঙে যায় তবে তা হবে দোআঁশ মাটি।
৮. পরীক্ষার প্রতিটি ধাপের ফলাফল ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আদর্শ মাটির উপাদানগুলোর শতকরা অনুপাতের কোন চিত্রটি সঠিক?

ক. 
খ. 
গ. 
ঘ. 

২. মাটিস্থ খনিজ পদার্থের ফাঁকে ফাঁকে থাকে -
i. বায়ু
ii. পানি
iii. জৈব পদার্থ।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দুবলারচরের মোর্শেদ মিয়ার বসতভিটা ছাড়া অন্য কোনো জমি নাই। বসত ভিটায় সে দুটি গাভী পালন করত। তার পাশেই সে এক বিঘা জমি বর্গা নিয়ে আলু চাষ করে। সে গাভীর গোবর ঐ জমিতে ফেলত। হঠাৎ বর্গাজমির মালিক জমিটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলে মোর্শেদ মিয়া তার গাভী দুটি বিক্রি করে জমিটি কিনে নেয়। পরবর্তীতে ঐ জমিতে ফলন কম হয়।

৩. জমিটির ফলন হ্রাসের কারণ কী?
ক. আগাছা দমন না করা খ. পানি সেচ না দেওয়া
গ. রাসায়নিক সার ব্যবহার না করা ঘ. জৈব সারের ঘাটতি সৃষ্টি হওয়া

৪. এ ক্ষেত্রে মোর্শেদ মিয়ার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?
i. প্রচুর গোবর সার প্রয়োগ করা
ii. সবুজ সার প্রয়োগ করা
iii. রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. দুবলার চরের মাটি প্রধানত-
ক. বেলে খ. বেলে দোআঁশ
গ. এঁটেল দোআঁশ ঘ. এঁটেল

সৃজনশীল প্রশ্ন

গাইবান্ধার মোল্লার চরের ভূমিহীন কৃষক করিম এক বিঘা জমি বর্গা নিয়ে প্রথমে বোরো ধান চাষ করেন। মাটির বুনট অনুকূল না থাকায় তাকে লোকসান গুণতে হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে একই জমিতে তরমুজ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পান।

ক. মাটি কাকে বলে?
খ. কৃষক করিম কেন ধান চাষ করে ক্ষতিগ্রস্থ হলেন- ব্যাখ্যা কর।
গ. মোল্লার চরের মাটির গঠন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কৃষক করিম বোরো ধান চাষ করে লোকসান গুণল কেন? বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাটির উর্বরতা ও ভূমিক্ষয়

মাটির উর্বরতা

উদ্ভিদ বা ফসলের চাহিদা অনুযায়ী কোনো জমির পুষ্টি উপাদান সরবরাহের সামর্থ্যকে মাটির উর্বরতা বলে। যে জমিতে সকল খাদ্য উপাদান যথাযথ পরিমাণে উপস্থিত থাকে তাকে উর্বর ভূমি বলে। প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে ভূমি অনুর্বর হয়। মাটির উর্বরতা শস্য উৎপাদনের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। মাটির উর্বরতার নিয়ন্ত্রকগুলো হল।

১. খনিজ পদার্থ

আদি শিলা ভেঙে যে খনিজ পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে তাতে গাছের সবগুলো পুষ্টি উপাদানই রয়েছে। এই পুষ্টিগুলো গ্রহণ করে গাছ বড় হয়, ফুল ও ফল উৎপাদন করে।

২. জৈব পদার্থ

মাটিতে গাছপালা, জীবজন্তুর বিষ্ঠা ও মৃতদেহ পচে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। জৈব পদার্থ মাটিতে মিশে ফসলের খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে।

৩. ভূমির বন্ধুরতা

ভূমির বন্ধুরতার কারণে বৃষ্টিপাতের জন্য পাহাড়ের ঢালু জায়গা ও তলদেশের মাটি বেশি উর্বর হয়।

৪. জমি চাষ

জমি ভালোভাবে চাষ করলে মাটি ঝুরঝুরে হয় এবং নরম হয়। এতে জৈব পদার্থ ও সার মাটির সর্বত্র সমভাবে মিশ্রিত হয়। এর ফলে গাছ সহজে মাটিতে শিকড় বিস্তার করতে পারে ও খাদ্য উপাদান শোষণ করে নিতে পারে। পরিণামে মাটির উর্বরতা বাড়ে।

৫. পানি সেচ

জমিতে পানি সেচ দিলে মাটি রসালো হয় এবং খাদ্য উপাদানগুলো ফসল সহজে গ্রহণ করতে পারে।

৬. জৈব সার প্রয়োগ

মাটিতে জৈব সার প্রয়োগ করলে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি মাটিতে যুক্ত হয়। আর অণুজীবগুলো ক্রিয়াশীল হয়। ফলে মাটি উর্বর হয়।

৭. রাসায়নিক সার প্রয়োগ

অবিরাম ফসল উৎপাদনের ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি রাসায়নিক সার হিসেবে জমিতে দেওয়া হয়। এই সারগুলো প্রয়োগের ফলে যথাক্রমে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ মাটিতে যুক্ত হয়।

কমপোস্ট সার ও সবুজ সার তৈরি

কমপোস্ট সার তৈরি

গবাদি পশুর উচ্ছিষ্ট, খড়কুটা, বিভিন্ন প্রকার কৃষিবর্জ্য, আগাছা, কচুরিপানা প্রভৃতি খামার প্রাঙ্গণে স্তরে স্তরে সাজিয়ে অণুজীবের সাহায্যে পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে কমপোস্ট সার বলা হয়। অনেকগুলো জিনিস একত্রে পচিয়ে

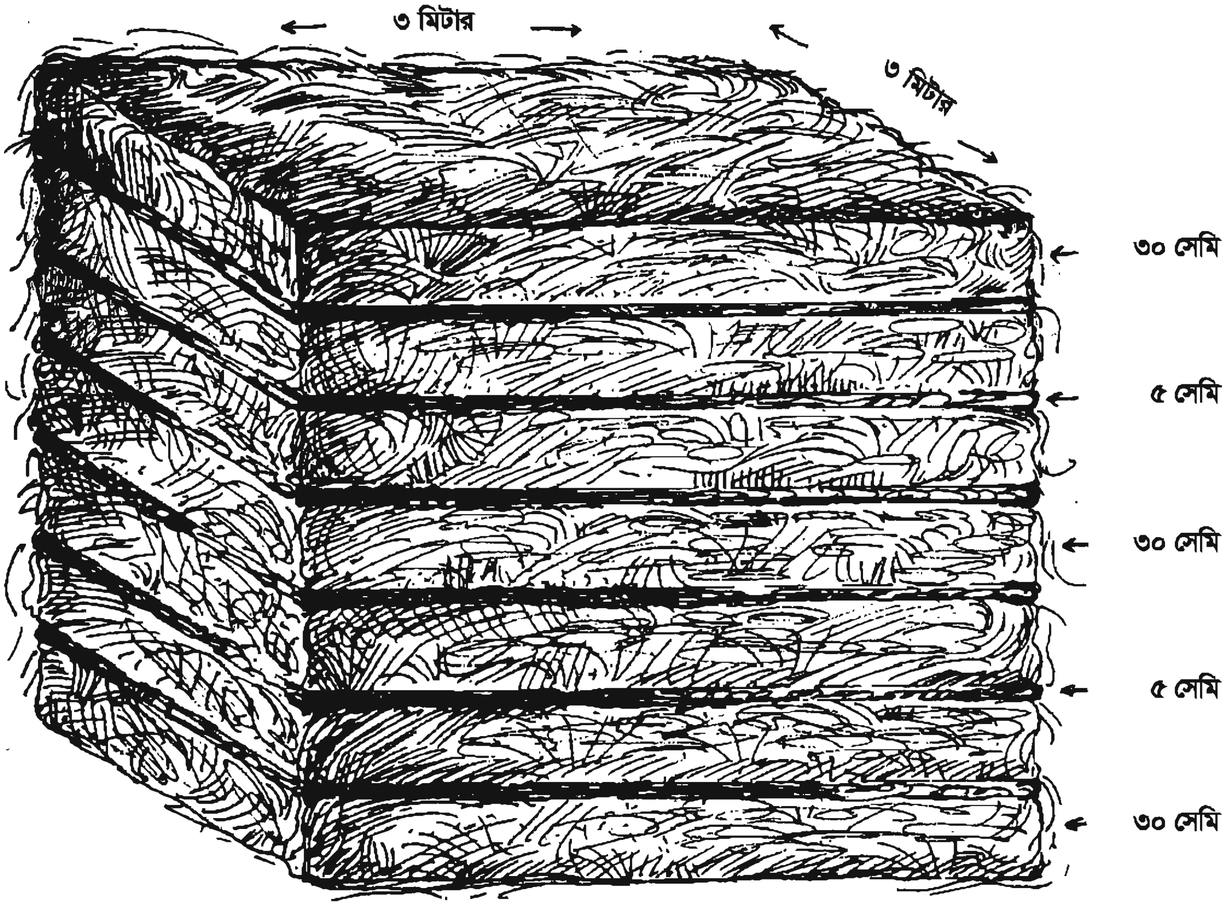
কমপোস্ট প্রস্তুত করা যায়। আবার একটি মাত্র উপাদান দ্বারাও তৈরি করা যায়। দুটি পদ্ধতিতে কমপোস্ট সার প্রস্তুত করা যায়; যথা-

১. স্তূপ পদ্ধতি ও ২. পরিখা পদ্ধতি

নিম্নে কমপোস্ট তৈরির দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

স্তূপ পদ্ধতি

স্তূপ পদ্ধতিতে কমপোস্ট সার তৈরির জন্য এমন একটি উঁচু জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে পানি জমে না। গোয়াল ঘরের পাশে বা খামার প্রাঙ্গণে জায়গা নির্বাচন করা ভালো। গাছতলায়ও কমপোস্ট সার তৈরি করা যায়।



কমপোস্ট স্তূপের স্তরবিন্যাস

প্রথমে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২ মিটার প্রস্থ পরিমিত জায়গা মেপে নিতে হবে। চার কোনায় চারটি খুঁটি পুঁতে চতুর্দিকে রশি জড়িয়ে আয়তকার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। ক্ষেত্রের ভেতরে খড়কুটা, আবর্জনা, আগাছা ইত্যাদি কমপোস্ট তৈরির কাঁচামাল স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি স্তর ৩০ সেমি উঁচু হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কমপোস্ট তৈরির জিনিসগুলো সেখানে রাখতে হবে। প্রথম স্তরটি ৩০ সেমি উঁচু হলে ১ কেজি গুঁড়া খৈল, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম টিএসপি ছিটাতে হবে। পরবর্তীতে ২ কেজি বায়ো এক্টিভেটর ছিটিয়ে দিতে হবে। পরে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। এতে আর্বজনার স্তরটি আঁটসাট হবে এবং পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। তারপর স্তরটির উপর ৫ সেমি পরিমাণ পুরু করে গোবরের লেপ দিতে হবে। এভাবে ৭টি স্তর সাজাতে হবে।

সপ্তম স্তরটি কুঁড়ে ঘরের চালার মতো করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি স্তূপের ভেতর প্রবেশ না করে গড়িয়ে নিচে পড়তে পারে। স্তূপ পলিথিন দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। নিচের ছকে বায়ো এক্টিভেটর তৈরির উপাদান ও পরিমাণ উল্লেখ করা হল।

কমপোস্ট এক্টিভেটর	**পরিমাণ**
১। ছত্রাক ইনোকুলাম দ্রব্য	১ কেজি
২। শুকনো গুঁড়া গোবর	৭ কেজি
৩। খৈল গুঁড়া	৫ কেজি
৪। ইউরিয়া	৪ কেজি
৫। টিএসপি	১ কেজি
৬। এমপি	১ কেজি
৭। পাতা পচা মাটি	১ কেজি
মোট	**২০ কেজি**

কমপোস্ট সার দেড় দুই মাসের মধ্যে জমিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়। কমপোস্টের প্রত্যেকটি স্তরের জিনিসগুলো যাতে সমানভাবে পচে সেজন্য ১ মাসের মধ্যে স্তরগুলো ওলট পালট করে দিতে হবে। স্তর উল্টিয়ে উপরের স্তর নিচে এবং নিচের স্তর উপরে দিতে হবে। আবর্জনার স্তর ওলট-পালটের পর পরবর্তী মাসের মধ্যে সঠিকভাবে পচবে ও কমপোস্টে পরিণত হবে।

পরিখা পদ্ধতি

প্রথমে একটি উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত স্থানে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২ মিটার প্রস্থ ১.২ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট পরিখা খনন করতে হবে। এরূপ ৬টি পরিখা পাশাপাশি খনন করতে হবে। পরিখার উপর চালার ব্যবস্থা করতে হবে। পাঁচটি পরিখা স্তূপ পদ্ধতির ন্যায় আবর্জনা, খড়কুটা, গোবর দিয়ে পর্যায়ক্রমে সাজাতে হবে। প্রতিটি পরিখার আবর্জনার স্তূপ ভূপৃষ্ঠ হতে ৩০ সেমি উঁচু হবে। একটি পরিখা খালি থাকবে। চার সপ্তাহ পর নিকটবর্তী পরিখার কমপোস্ট খালি পরিখায় স্থানান্তর করতে হবে। এভাবে কমপোস্টের উপাদানগুলো ওলটপালট হবে ও পচন ক্রিয়াও ত্বরান্বিত হবে। ২-৩ মাসের মধ্যে উপাদানগুলো সম্পূর্ণ পচে কমপোস্ট তৈরি হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে সারা বছর কমপোস্ট তৈরি করা যেতে পারে।

কমপোস্ট সারের উপকারিতা

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে এই সার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমপোস্ট সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম যুক্ত হয়। তাছাড়াও কমপোস্ট মাটির গঠন ও বুনটের উন্নয়ন করে ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তোলে। ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলাচল বাড়ে। কমপোস্ট সার প্রস্তুত করতে খরচ কম হয়। এজন্য এ সার ব্যবহার বেশ লাভজনক।

সবুজ সার প্রস্তুত পদ্ধতি

জমিতে যে কোনো সবুজ উদ্ভিদ জন্মিয়ে কচি অবস্থায় জমি চাষ করে মাটির নিচে ফেলে পচিয়ে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে সবুজ সার বলে। ধইঞ্চা, গোমটর, শণ, কালাই এসবের চাষ করে ফুল আসার আগে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মেশালে তা পচতে শুরু করে। তারপর আরও ৩-4 বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ওলটপালট করে মাটির সাথে ভালোভাবে মেশালে ২ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পচে যায়। সবুজ সারের সুবিধা এই যে যেখানে এই সার তৈরি হয় সেখানেই এর ব্যবহার হয়।

ধইঞ্চার চাষ ও সার প্রস্তুত

ধইঞ্চা চাষের জন্য যে কোনো জমি নির্বাচন করা যেতে পারে। দু একটি চাষ দিয়ে শতক প্রতি ৭০ গ্রাম ফসফেট ও ৫০ গ্রাম পটাশ ছিটাতে হবে। এরপর শতক প্রতি ২০০ গ্রাম বীজ বুনলে খুব ঘন হয়ে চারা গজাবে। বীজ বপনের প্রায় আড়াই মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসা শুরু করলে লাঙল দ্বারা গাছগুলো মাটির নিচে ফেলতে হবে। গাছ লম্বা হলে কাস্তে বা দা দিয়ে কেটে ছোট করে জমি চাষ করতে হবে।

পচন শুরু হলে ২ সপ্তাহ পর পর ৩টি চাষ দিলে ধইঞ্চার গাছ সম্পূর্ণভাবে পচে সারে পরিণত হবে। সবুজ সার হতে প্রতি শতকে ৩৫০ গ্রাম হতে ৪৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন যুক্ত হয় এবং ১২ কেজি হতে ১০০ কেজি পর্যন্ত জৈব পদার্থ যুক্ত হয়।

সবুজ সারের উপকারিতা : সবুজ সার মাটির উর্বরতা রক্ষায় অনেক উপকার করে। যেমন-

১. সবুজ সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদন শক্তিও বাড়ায়।
২. সবুজ সার মাটিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব পদার্থ যোগ করে।
৩. সবুজ সার মাটিতে নাইট্রোজেন বাড়ায়।
৪. সবুজ সার প্রয়োগের ফলে মাটিস্থ অণুজীবগুলো ক্রিয়াশীল হয়।
৫. সবুজ সার মাটিস্থ পুষ্টি উপাদান সংরক্ষণ করে।

ভূমিক্ষয় ও ভূমি সংরক্ষণ

পানি প্রবাহ, বায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটি অন্যত্র চলে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে। কৃষি জমির ১৫-২০ সেমি নিচ পর্যন্ত উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সঞ্চিত থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে এই পুষ্টি উপাদানগুলো সরে যায়। ফলে কৃষি জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

ভূমিক্ষয়ের প্রকার

প্রধানত দুই প্রকারে ভূমিক্ষয় হয়; যথা-

ক. পানি ভূমিক্ষয় ও
খ. বায়ু ভূমিক্ষয়।

ক. পানি ভূমিক্ষয়

পানি প্রবাহের কারণে যে ভূমিক্ষয় হয় তাকে পানি ভূমিক্ষয় বলে। পানি ভূমিক্ষয় নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

১. **আস্তরণ ভূমিক্ষয় :** বৃষ্টির পানি বা সেচের পানির প্রবাহের ঢালযুক্ত জমি হতে মাটির উপরিভাগের যে নরম আস্তরণ সরে যায় তাকে আস্তরণ ভূমিক্ষয় বলে। ঢালু জমিতে আস্তরণ ভূমিক্ষয় বেশি। সমতল জমিতে এরূপ ভূমিক্ষয়ের মাত্রা কম।

২. **রিল ভূমিক্ষয় :** রিল ভূমিক্ষয় আস্তরণ ভূমিক্ষয়ের দ্বিতীয় পর্যায়। পানি প্রবাহ বেশি হলে জমির উপর হাতের রেখার মতো ছোট ছোট লম্বা রেখার সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে রেখাগুলো ছোট ছোট নালায় পরিণত হয়। একে রিল ভূমিক্ষয় বলে।

৩. **নালা ভূমিক্ষয় :** নালা ভূমিক্ষয় রিল ভূমিক্ষয়ের পরের পর্যায়। রিল ভূমিক্ষয়ের ফলে যে ছোট নালার সৃষ্টি হয় তা বিরামহীন চলতে থাকলে কালক্রমে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় বড় হয়ে নালায় পরিণত হয় এবং নালা ভূমিক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। জমির অবস্থা এরূপ হলে এর উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

৪. **নদীকূলের ভূমিক্ষয় :** প্রবল স্রোতে নদী তীরের জমি ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হওয়াকে নদীকূলের ভূমিক্ষয় বলে। প্লাবনের শুরু ও শেষে এ ভাঙনের তীব্রতা বেশি হয়। নদী ভাঙনের ফলে প্রতি বছর অনেক কৃষক জমি ও বাড়ি ঘর হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

৫. **সাগরকূলের ভূমিক্ষয় :** সমুদ্র উপকূলের মাটি জলোচ্ছ্বাস ও সাগরের ঢেউ এবং জলোচ্ছ্বাসের প্রবল আঘাতে ভেঙে সাগর বক্ষে বিলীন হয়। উপকূলীয় এলাকা ও সাগরবক্ষের দ্বীপগুলোয় এরূপ ভূমিক্ষয় হয়।

খ. বায়ু ভূমিক্ষয়

পানি প্রবাহের মতো বায়ু প্রবাহেও ভূমিক্ষয় হয়। ঝড়ো গতির বায়ু এক স্থানের মাটি অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করে। বায়ু প্রবাহ দ্বারা মরুভূমির বালি মাটি শত শত মাইল দূরে এসে উর্বর ভূমি অনুর্বর করে ফেলে।

ভূমিক্ষয়ের কারণ

ভূমিক্ষয়ের কারণগুলো হচ্ছে-

১. অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত
২. ঢালু জমি
৩. মাটির প্রকৃতি
৪. চাষ পদ্ধতি
৫. বায়ু প্রবাহ
৬. মানুষের কার্যাবলি।

১. অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত

মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে মাটিতে সজোরে আঘাত লাগে। এর ফলে মাটির কণা সহজে ভেঙে যায়। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি হলে মাটি পানি শোষণ ক্ষমতা হারায়। ফলে অতিরিক্ত পানি মাটির উপর দিয়ে নিচের দিকে গড়ায়। এই পানির সাথে জমির উর্বর মাটি চলে যায়।

২. ঢালু জমি

ঢালু জমির মাটি তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়। বৃষ্টির পানি দ্রুত নিচের দিকে নামার ফলে সহজেই উপরের স্তরের মাটির বিচ্যুতি ঘটে।

৩. মাটির প্রকৃতি

এঁটেল বা কাদা মাটি ভারী বলে এর সচ্ছিদ্রতা কম। তাই এরূপ মাটির পানি শোষণ ক্ষমতাও কম। অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে যায়। আর মাটির উপরিভাগের মাটি নিচের দিকে গড়ায়। পক্ষান্তরে জৈব পদার্থযুক্ত সচ্ছিদ্র মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা বেশি বলে ভূমিক্ষয়ও কম।

৪. চাষ পদ্ধতি

ক. কম শিকড় বিশিষ্ট ফসল চাষ করলে ভূমিক্ষয় বেশি হয়।
খ. পাহাড়ি জমিতে ঢালের বরাবর চাষ করলে ভূমিক্ষয় বেশি হয়।
গ. জমি ঘন ঘন চাষ করলেও পানি ও বায়ুর প্রভাবে ভূমিক্ষয় হয়।

৫. বায়ু

বায়ু প্রবাহের প্রভাবে মাটির উপরিভাগ ক্ষয় হয়ে যায়।

৬. মানুষের কার্যাবলি

বনজঙ্গল প্রকৃতির দান। মানুষ অবিবেচকের মতো এই বনজঙ্গল উজাড় করে ফেলছে। ফলে মাটি সহজেই স্থানান্তর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

ভূমিক্ষয়ের অপকারিতা

মাটির উপরিভাগের ১৫-২০ সেমি গভীর পর্যন্ত গাছের পুষ্টি ও মাটির উর্বরতা মজুদ থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির এই উপরিভাগ অন্যত্র অপসারিত হয়। এর সাথে মাটির উর্বরতা ও গাছের পুষ্টি চলে যায়। এভাবে ক্রমশ মাটি উর্বরতা হারাতে থাকে। একসময় মাটি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীনালা, খালবিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদীতে চর জেগে উঠেছে। এর ফলে প্রায়ই বন্যা হয় এবং শুকনো মৌসুমে নৌ চলাচলের অসুবিধা হয়।

ভূমি সংরক্ষণ

দীর্ঘদিন ধরে ভূমিক্ষয় হতে থাকলে কৃষি জমির বিলুপ্তি ঘটার আশঙ্কা আছে। তাই বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করে ভূমি সংরক্ষণ করা দরকার।

নিম্নে ভূমি সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১। পানি প্রবাহের বেগ কমানো

বৃষ্টির পানির বেগ কমিয়ে ভূমি সংরক্ষণ করা যায়। পানির বেগ কমানোর উপায়গুলো হচ্ছে।
ক. জমিতে পানি প্রবাহের দিকে বাঁধ বা আইল দেওয়া।
খ. ছোট ছোট নালা সমান করে দেওয়া।
গ. বড় বড় নালায় আগাছা জন্মানো এবং শেষ প্রান্তে তারের জাল দেওয়া।
উল্লিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করলে নালাগুলো ভরাট হয়ে জমি সমান হবে।

২. পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করা

বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ভালো বন্দোবস্ত করে ভূমি সংরক্ষণ করা যায়। এজন্য বৃষ্টির পানি সরার জন্য মাটির নিম্নস্তরে টাইল নালা করে দিতে হবে যাতে পানি ধীর গতিতে সরে যায়।

৩. জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা

জমিতে অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে কম পরিমাণ পানি নিচের দিকে গড়ায়। অর্থাৎ জৈব পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি করলে ভূমি সংরক্ষণ হয়।

৪. ধাপে চাষ করা

পাহাড়ি অঞ্চলের ঢালু জমি ধাপ করে কেটে কেটে চাষ করলে বৃষ্টির পানি দ্রুত বেগে গড়াতে পারে না। এভাবে পাহাড়ি জমির মাটি সংরক্ষণ করা যায়।

৫. কন্টোর পদ্ধতিতে চাষ করা

পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়ি লাইনে চাষ করার নাম কন্টোর পদ্ধতি। দীর্ঘস্থায়ী ফসল এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ভূমি সংরক্ষণ হয়।

৬. জমিকে খন্ড খন্ড করে চাষ করা

এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের গায়ে আড়াআড়িভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি তৈরি করে এক একটি অংশে এক এক ফসল জন্মালে ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

৭. বনজঙ্গল সৃষ্টি করা

বনজঙ্গল সৃষ্টি করে পানি ও বাতাসের গতিরোধ করা যায়। এতেও ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ কমপোর্স্ট সার তৈরি

উপকরণ

১. আবর্জনা ২. গোবর ৩. ইউরিয়া ৪. টিএসপি ৫. কাদা মাটি ৬. পানি ৭. ফিতা ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. বিদ্যালয়ের পাশে একটি উঁচু জায়গা নির্বাচন কর।
২. জায়গাটি হতে ৩ মিটার দীর্ঘ এবং ২ মিটার প্রস্থ স্থান ফিতা দিয়ে মেপে নাও।
৩. মেপে নেওয়া স্থানটির চার কোনায় চারটি খুঁটি দিয়ে চিহ্নিত কর।
৪. চতুর্দিকে রশি জড়িয়ে চিহ্নিত স্থানটি আয়তকার ক্ষেত্র বানাও।
৫. তারপর আবর্জনা, খড়কুটা, আগাছা ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্য ফেলে ৩০ সেমি উঁচু স্তর বানাও।
৬. প্রথম স্তর সম্পন্ন হলে আবর্জনার উপর ১ কেজি গুঁড়া খৈল, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম টিএসপি ছিটিয়ে দাও। অথবা প্রতি স্তরে ২ কেজি করে এক্টিভেটর ছিটিয়ে দাও।
৭. এরপর পানি দিয়ে স্তরটি ভিজিয়ে দাও।

৮. তারপর ৩ সেমি পুরু করে গোবরের প্রলেপ দাও। পরিবর্তে আরো ১ কেজি এক্টিভেটর ছিটিয়ে দাও।
৯. এভাবে ৭টি স্তর সাজাও। প্রতিটি স্তরের উপরিভাগে একই হারে ইউরিয়া ও টিএসপি এক্টিভেটর ছিটাও বা গোবরের প্রলেপ দাও।
১০. সপ্তম স্তরটি কুঁড়েঘরের চালার মতো বানাও এবং পলিথিন দিয়ে ঢেকে দাও।
১১. স্তূপে নিয়মিত পানি দাও।
১২. তাড়াতাড়ি পচনের জন্য একমাস পর কমপোস্ট উল্টে দাও। স্তূপ উল্টানোর সময় স্তরে স্তরে মোট ১০ কেজি এক্টিভেটর দাও।
১৩. দেড় দুই মাসের মধ্যে কমপোস্ট তৈরি হবে। স্তূপ ভেঙে শুকিয়ে গুঁড়া করে বস্তায় ভরে রাখ। কমপোস্ট তৈরির ধাপগুলো অনুশীলন কর ও ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সবুজ সার তৈরিতে ধইঞ্চার চাষ করা হয়; কারণ-
   i. ধইঞ্চার পাতা বেশি সবুজ থাকে
   ii. চাষ দিয়ে মাটিতে মিশালে দ্রুত পচে
   iii. মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ভূমিক্ষয় মাটির উর্বরতা হ্রাসের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে যে ধরনের ভূমিক্ষয় হয় তার মধ্যে নদী ও সাগরকূলের ভূমিক্ষয় রোধ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় পাহাড়ি ভূমিক্ষয় সহজেই রোধ করা যায়।

২. পাহাড়ি ভূমিক্ষয় রোধের উপায় কোনটি?
ক. পাহাড়ের ঢালে রাবার চাষ করে খ. পাহাড়ের ঢালে আড়াআড়ি চাষ করে
গ. কম শিকড় বিশিষ্ট ফসল চাষ করে ঘ. জমি ঘন ঘন চাষ করে।

৩. কর্ণফুলী নদী পাড়ের জমিতে কোন ধরনের ভূমিক্ষয় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?
ক. রিল ভূমিক্ষয় খ. সাগরকূলের ভূমিক্ষয়
গ. নদীকূলের ভূমিক্ষয় ঘ. নালা ভূমিক্ষয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

গণি মিয়ার বিশাল জোত জমি। প্রতি বছর বর্ষার শেষে তার জমি প্রায় একমাস পতিত থাকে। চাষের কাজে সে ২০টি বলদ পালন করে। এছাড়াও ১৫-১৬ জন শ্রমিক/কামলা তার বাড়িতে সব সময় কাজ করে। পরিবারের গৃহস্থালি বর্জ্য ও গো-বর্জ্যের কারণে তার বাড়ির পরিবেশ নোংরা থাকে। ইদানিং প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহার করেও ভালো ফলন না পাওয়ায় তিনি স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার নিকট পরামর্শ করতে গেলে কৃষি কর্মকর্তা তাকে সবুজ সার ও কমপোস্ট সার ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

ক. কমপোস্ট সার কী?
খ. গণি মিয়ার কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে কেন?
গ. গণি মিয়া কীভাবে সবুজ সার উৎপাদন করতে পারে? বর্ণনা কর।
ঘ. গণি মিয়ার জন্য কমপোস্ট সার ব্যবহারের সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য মাটি, বায়ু ও পানি হতে যে সব পদার্থ শোষণ করে ঐগুলোকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলা হয়। মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টির অভাব হলে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে না। লাভজনকভাবে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য সার প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে পুষ্টির অভাব পূরণ করা দরকার। মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কী পরিমাণে আছে তা উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পাতা, কাণ্ড ও ফলন দেখে বোঝা যায়। এছাড়া রাসায়নিকভাবে মাটি পরীক্ষা করেও পুষ্টির অবস্থা জানা যায়। উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য পুষ্টির শ্রেণীবিভাগ, কোন পুষ্টি কী কাজ করে, পুষ্টির অভাব হলে কী কী লক্ষণ দেখা দেয় এসব বিষয় সম্পর্কে জানা দরকার।

পুষ্টির শ্রেণীবিভাগ

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান ১৭টি। যথা- কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, কপার, দস্তা, বোরন, কোবাল্ট ও ক্লোরিন। এই পুষ্টি উপাদানগুলোকে উদ্ভিদের গ্রহণমাত্রার ওপর ভিত্তি করে ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যথা-

১. মুখ্য পুষ্টি উপাদান

২. গৌণ পুষ্টি উপাদান

১. মুখ্য পুষ্টি উপাদান

যে সব পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য বেশি পরিমাণে প্রয়োজন সে সব পুষ্টি উপাদানকে মুখ্য পুষ্টি উপাদান বলে। মুখ্য পুষ্টি উপাদান ৯টি; যথা- ১. কার্বন ২. হাইড্রোজেন ৩. অক্সিজেন ৪. নাইট্রোজেন ৫. ফসফরাস ৬. পটাশিয়াম ৭. ক্যালসিয়াম ৮. ম্যাগনেসিয়াম ৯. সালফার।

২. গৌণ পুষ্টি উপাদান

যে সব পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের অল্পমাত্রায় প্রয়োজন হয় সে সব পুষ্টি উপাদানকে গৌণ পুষ্টি উপাদান বলা হয়। গৌণ পুষ্টি উপাদান ৮টি; যথা- ১. লৌহ ৫. ম্যাঙ্গানিজ ২. মলিবডেনাম ৬. তামা ৩. দস্তা ৭. বোরন ৪. কোবাল্ট ৮. ক্লোরিন এই উপাদানগুলো অল্পমাত্রায় প্রয়োজন হলেও উদ্ভিদের জীবন রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

পুষ্টি উপাদানের উৎস

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের উৎস ২টি; যথা-

১. প্রাকৃতিক উৎস

২. কৃত্রিম উৎস।

মাটি, বায়ু ও পানি এই তিনটি হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস। জৈব ও রাসায়নিক সার হচ্ছে কৃত্রিম উৎস।

প্রাকৃতিক উৎস

ক. মাটি

কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ব্যতীত বাকি ১৪টি পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদ মাটি থেকে পেয়ে থাকে।

খ. বায়ু

উদ্ভিদ কার্বন ও অক্সিজেন বায়ু হতে গ্রহণ করে।

গ. পানি

উদ্ভিদ পানি হতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পায়। এছাড়া পানিতে অনেক খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে যা উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

কৃত্রিম উৎস

ক. জৈব সার

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের সবগুলোই জৈব সারে পাওয়া যায়। গোবর, কমপোস্ট, আবর্জনা, খড়কুটা ও আগাছা পচিয়ে জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ. রাসায়নিক সার

ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি রাসায়নিক সার। রাসায়নিক সার উদ্ভিদের প্রাথমিক পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সরবরাহ করে।

পুষ্টি উপাদানের কাজ

উদ্ভিদের জীবনচক্রে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন কাজ করে থাকে। কোনো পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের বর্ধন ক্রিয়ায় সাহায্য করে, কোনোটি রোগ প্রতিরোধ করে আবার কোনোটি বীজ পরিপক্ব করে। আবার কোনোটি অন্য পুষ্টি উপাদান পরিশোষণে সহায়তা করে। এ সকল কাজের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে ফসলের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। পুষ্টি উপাদানগুলোর উপকারী প্রভাব যেমন আছে তেমনি ক্ষতিকর প্রভাবও রয়েছে। পুষ্টি উপাদান পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগ করা হলে উপকারী প্রভাব দেখা যায়। অন্যদিকে প্রয়োগ বেশি বা কম হলে ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায়। নিম্নে উদ্ভিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানের কার্যাবলি বর্ণনা করা হল।

নাইট্রোজেন

উদ্ভিদের জীবনচক্রে নাইট্রোজেনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে নাইট্রোজেন জাতীয় সার হিসেবে ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। ইউরিয়ায় শতকরা প্রায় ৪৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে।

নাইট্রোজেনের কাজ

১. গাছকে ঘন সবুজ রাখে।
২. উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ, বিপাক ও শ্বসন কাজে সহায়তা করে।
৩. গাছের পাতা, কাণ্ড ও ডালপালার বৃদ্ধি ঘটায়।
৪. দানা জাতীয় শস্য, গোখাদ্য ও পাতা জাতীয় শাকসবজির গুণগতমান বৃদ্ধি করে।
৫. দানা জাতীয় গাছে কুশি গজাতে সাহায্য করে।

ফসফরাস

ট্রিপল সুপার ফসফেট ও ডাই এমোনিয়াম ফসফেট উল্লেখযোগ্য ফসফেট জাতীয় সার। টিএসপি সারে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ ফসফেট থাকে।

ফসফরাসের কাজ

১. উদ্ভিদের কোষ বিভাজন ক্রিয়ায় অংশ নেয়
২. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে
৩. উদ্ভিদের শিকড় গঠনে সাহায্য করে
৪. সময়মতো ফুল ফোটায় ও ফসল পাকায়
৫. ফসলের গুণগতমান বাড়ায়
৬. গাছকে শক্তি যোগায়।

পটাশিয়াম

মিউরেট অব পটাশ (এমপি) পটাশিয়াম জাতীয় সারের মধ্যে অন্যতম। এই সারে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ পটাশ থাকে।

পটাসিয়ামের কাজ

১. উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
২. উদ্ভিদের কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।
৩. উদ্ভিদের পাতায় শর্করা উৎপাদনে সহায়তা করে।
৪. উদ্ভিদের অভ্যন্তরে শর্করা ও রাসায়নিক পদার্থ চলাচলের ব্যবস্থা করে।
৫. উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ও ফসফরাস শোষণে সাম্য রক্ষা করে।

সালফার

ক্যালসিয়াম সালফেট বা জিপসাম সালফার জাতীয় সারের মধ্যে অন্যতম। এই সারে শতকরা ১৪ ভাগ সালফার আছে।

সালফারের কাজ

১. তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
২. শিম জাতীয় ফসলের মূলে নাইট্রোজেন গুটি উৎপাদনে সাহায্য করে।

দস্তা বা জিংক

জিংক সালফেট অন্যতম দস্তা জাতীয় সার। এই সারে শতকরা ৩৬ ভাগ দস্তা ও ১৭ ভাগ সালফার আছে।

দস্তার কাজ

১. গাছের বৃদ্ধি ও আমিষ গঠনে সহায়তা করে।
২. ফুল ও ফল উৎপাদনের সহায়তা করে।

ক্যালসিয়াম

জিপসাম বা ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়ামের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় শতকরা ২২ ভাগ।

ক্যালসিয়ামের কাজ

১. উদ্ভিদ কোষের প্রাচীর শক্ত করে।
২. উদ্ভিদের মূল গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
৩. উদ্ভিদ কোষকে শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করে।
৪. ডাল জাতীয় ফসলের ফলন বাড়ায়।

লৌহ

ফেরাস সালফেট লৌহ জাতীয় সারের মধ্যে প্রধান। এই সার মাটিতে কিংবা গাছের পাতায় ব্যবহার করা যায়।

লৌহের কাজ

১. উদ্ভিদের সবুজ কণা গঠন করে।
২. নাইট্রোজেন শোষণে সাহায্য করে।
৩. বিভিন্ন প্রকার জারক রসকে ক্রিয়াশীল রাখার জন্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ

পুষ্টি উপাদানের অভাব ঘটলে উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার গঠন ও আকৃতিতে নানা প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। নিচে কোন পুষ্টির অভাবে গাছে কী কী লক্ষণ দেখা যায় তা আলোচনা করা হল।

নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ

১. গাছের পাতা প্রথমে হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে।
২. অভাব প্রকট হলে হলদে বর্ণ ধারণ করে। হলদে বর্ণ গাছের নিচের পাতা থেকে শুরু হয়।
৩. উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৪. দানা জাতীয় ফসলের কুশি কম হয়।
৫. ফলন অনেক কম হয়।
৬. বীজ অপুষ্ট হয়।
৭. ফলগাছের পাতা ঝরে যায়।
৮. পার্শ্ব কুঁড়ি শুকিয়ে যায়।

ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ

১. বিটপ ও মূলের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না।
২. কোষ বিভাজনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
৩. গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না।
৪. পাতা কম হয়।
৫. উদ্ভিদে আমিষের পরিমাণ কমে যায়।
৬. ফুলের সংখ্যা কমে যায়।
৭. ফল ঝরে যায় ও ফলের আকার ছোট থাকে।

পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

১. উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
২. পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়ে।
৩. সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়।
৪. গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৫. গাছের পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে।
৬. শিকড়ের বৃদ্ধি ঘটে না।
৭. খরা সহ্য করার ক্ষমতাও কমে যায়।

সালফারের অভাবজনিত লক্ষণ

১. উদ্ভিদ কোষের বিভাজনে বিঘ্ন ঘটে।
২. গাছ খর্বাকৃতির হয়।
৩. পাতা ছোট ও বিবর্ণ হয়।
৪. ফসলের পরিপক্বতা বিলম্বিত হয়।
৫. কাণ্ড শুকিয়ে সরু হয়ে যায়।
৬. তেল জাতীয় শস্যের ফলন কমে যায়।

দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ

১. ধানের কচি পাতার গোড়া সাদা হয়ে যায়।
২. ভুট্টা, তুলা ইত্যাদি গাছের পাতার শিরার মধ্যবর্তী স্থানে বিবর্ণতা দেখা দেয়।
৩. পাতার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৪. ধানের পুরাতন পাতা মরচে পড়ার রং ধারণ করে।
৫. লেবু গাছের পাতা কুঁকড়ে যায়।

ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ

১. কচি পাতার অগ্রভাগের গঠন অস্বাভাবিক হয়।
২. পাতার সবুজ রং বিবর্ণ হয়।
৩. পাতার কিনারায় এবং মাঝখানে হলদে ও বাদামি রং হয়।
৪. পাতা ছোট থাকে।
৫. গাছ খর্বাকৃতির হয়।

লৌহের অভাবজনিত লক্ষণ

১. প্রথমে কচি পাতার সবুজ রং বিবর্ণ হয়।
২. পাতার দুই শিরার মাঝখানে বিবর্ণ রোগ হয়। পরে এই বিবর্ণতা সমগ্র পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।
৩. অভাব খুব বেশি হলে পাতা বাদামি রং ধারণ করে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ সার পরিচিতি

উপকরণ

১. বিভিন্ন প্রকার সার
২. সার রাখার পাত্র
৩. কাগজ ও কলম
৪. পানি
৫. চুন

কাজের ধাপ

নমুনা -ক

১. নমুনা সার হতে কিছু সার হাতে নাও।
২. সারের রং ও দানার আকার ভালোভাবে দেখ।
৩. সারের গন্ধও শুঁকে দেখ।
৪. যদি সারের রং সাদা, আকার সাগুদানার মতো গোলাকার ও তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ হয় তবে নমুনাটি ইউরিয়া সার।
৫. সারে একটু চুন মেশাও, যদি এমোনিয়ার গন্ধ বের হয় তবে এটা নিশ্চিত ইউরিয়া সার।
৬. কাজের ধাপ ও ফলাফল ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

নমুনা-খ

১. এবার অন্য প্রকার সার হাতে নাও।
২. সারের রং, দানার আকার ভালোভাবে লক্ষ কর।
৩. সারের গন্ধও শুঁকে দেখ।
৪. যদি সার মেটে বর্ণের হয়, আকার ইঁদুরের তোলা মাটির মতো হয় আর গন্ধ ঝাঁঝালো না হয় তবে মনে করবে এই সার টিএসপি।
৫. কাজের ধাপ ও ফলাফল তোমার ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

নমুনা -গ

১. এবার অন্য প্রকার নমুনা সার হাতে নাও।
২. সারের রং, আকার ও আকৃতি ভালোভাবে দেখ।
৩. সারের গন্ধও শুঁকে দেখ।
৪. যদি সার ইটের গুঁড়ার বা লালচে বা সাদাটে রঙের হয় এবং আকার লবণের দানার মতো হয় তবে নমুনাটি এমপি সার।
৫. কাজের ধাপ ও ফলাফল ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের গৌণ পুষ্টি উপাদান কোন গুলো?
   ক. লৌহ, বোরন, সালফার খ. পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সালফার
   গ. লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম ঘ. তামা, দস্তা, ম্যাগনেসিয়াম।

২. ১ বিঘা জমিতে ২৩ কেজি নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হলে কী পরিমাণ ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে?
   ক. ২৫ কেজি খ. ৫০ কেজি
   গ. ৭৫ কেজি ঘ. ১০০ কেজি।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কী করণীয় তা জানতে লক্ষীপুর গ্রামের কৃষক ছগির মিয়া স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার নিকট গেলেন। ঐ কর্মকর্তা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান ধানের জীবন চক্রে বিভিন্নভাবে কাজ করে তা জানিয়ে কিছু ধারণা দিলেন। শেষে তিনি ধানের ভালো ফলনের জন্য উন্নত জাতের বীজ ও সুষম সার ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ মতে ধান চাষাবাদে ছগির মিয়া আশানুরূপ ফলন পেলেন।

৩. কৃষি কর্মকর্তা ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কোন সার প্রয়োগের পরামর্শ দেন?
   ক. ইউরিয়া খ. টি এস পি
   গ. এম পি ঘ. জিপসাম।

৪. ধানের আশানুরূপ ফলন পেতে বেশি জরুরি-
   i. উন্নত জাতের বীজ
   ii. সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ
   iii. সময়মতো সেচ দেওয়া।

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i খ. ii
   গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

কৃষি শিক্ষক মেহেদী হাসান তার দশম শ্রেণীর ছাত্রদের উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দেওয়ার জন্য ছাত্রদের গোবিন্দগঞ্জ গ্রামের কৃষি জমি পরিদর্শনে নিয়ে গিয়ে দেখলেন ধানের কচি পাতার গোড়া সাদা হয়ে গেছে এবং পুরোনো পাতা মরচে পড়া রঙের হয়ে আছে। আলুর পাতা হলদে হয়ে আছে এবং সরিষা গাছে অত্যন্ত কম ফুল হয়েছে। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিলেন।

ক. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কাকে বলে?
খ. ধান গাছের কচি পাতা সাদা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. কীভাবে আলুর পাতা হলদে হওয়া প্রতিরোধ করা যাবে? বর্ণনা কর।
ঘ. সরিষা গাছে ফুল কম হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বীজ

বীজের ধারণা

সাধারণভাবে উদ্ভিদের বংশবিস্তারের জন্য যে জীবন্ত মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলে। বীজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি সংজ্ঞা জানা দরকার।

ক. উদ্ভিদ বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারে

বীজ হচ্ছে নিষিক্ত ও পরিপক্ব ডিম্বক; যেমন- ধান, গম, সরিষা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি। কেবলমাত্র সপুষ্পক উদ্ভিদই এরূপ বীজ উৎপন্ন করতে পারে।

খ. কৃষি তত্ত্ব অনুসারে

উদ্ভিদের যে কোনো অংশ যা উপযুক্ত পরিবেশে আপন জাতের নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে তাকে বীজ বলে। এক্ষেত্রে উদ্ভিদের শাখা, মূল, পাতা, কুঁড়ি ইত্যাদি বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আখের টুকরা, গোল আলু, মিষ্টি আলু, কাকরোলের মূল, আমের কলম ও কচু এই প্রকার বীজের উদাহরণ।

বীজের গুণাবলি

বীজের অনেক রকমের গুণ রয়েছে। পরীক্ষা করে এসব গুণাবলি নির্ণয় করা হয়। নিম্নে কয়েকটি গুণ নিয়ে আলোচনা করা হল।

১. বীজ বিশুদ্ধতা

বীজ বিশুদ্ধতা বলতে কোন বীজ নমুনার মধ্যে কী পরিমাণ বিশুদ্ধ বীজ রয়েছে তাকে বোঝায়। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ প্রক্রিয়াকরণ করলে বীজের সজীবতা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত টিকে থাকে। বীজের মধ্যে অন্য ফসলের বীজ, আগাছার বীজ ও কাঁকর জাতীয় দ্রব্য থাকলে বীজের গুণ নষ্ট হয়। বীজ উৎপাদনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে বীজে অন্য ফসলের বীজ, ময়লা বা আগাছার বীজের মিশ্রণ না ঘটে।

২. জাত বিশুদ্ধতা

কোনো বীজের নমুনার মধ্যে একই ফসলের অন্য জাতের বীজ থাকলে বীজের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করলে জাত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

৩. বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা

কোনো বীজ নমুনার শতকরা কয়টি বীজের অঙ্কুরোদগম হবে সেই হিসাব দ্বারা বীজের ভালোমন্দ গুণ বিচার করা হয়। নমুনা বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা যদি শতকরা ৭০-৮০ ভাগ হয় তবে সেই বীজ ভালো বলে বিবেচিত হয়।

৪. বীজের তেজ

নমুনা বীজের চারা যদি সতেজ, সজীব ও স্বাস্থ্যবান হয় এবং প্রতিকূল অবস্থায় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে পারে তবে সেই বীজকে তেজস্বী বীজ বলা হয়।

৫. বীজের আকার ও আকৃতি

ভালো বীজ পরিপক্ক, পুষ্ট ও স্বাভাবিক আকারের হবে।

৬. বীজের আর্দ্রতা

নমুনা বীজের মধ্যে শতকরা কত ভাগ পানি আছে তাই বীজের আর্দ্রতা।

৭. বীজের সুস্থতা

বীজ সর্বদাই নীরোগ ও কীটমুক্ত হবে।

বীজের শ্রেণী

বাংলাদেশ বীজ বিধি ১৯৮০ অনুসারে বীজকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে; যথা-

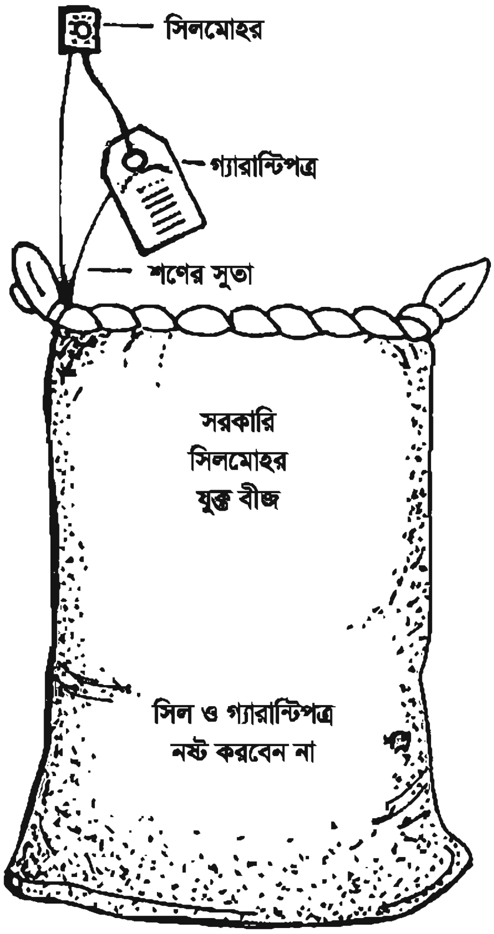
১. মৌল বীজ
২. ভিত্তি বীজ
৩. প্রত্যায়িত বীজ।

১. মৌল বীজ

উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে সকল বংশগত গুণাগুণ রক্ষা করে যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে মৌল বীজ বলে। মৌল বীজ হচ্ছে অনুমোদিত বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ।

২. ভিত্তি বীজ

মৌল বীজ হতে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয়। বীজ অনুমোদনকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ উৎপাদনের বিধি মেনে জাতের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে ভিত্তি বীজ বলে।



ট্যাগ সম্বলিত বীজ ব্যাগ

৩. প্রত্যায়িত বীজ

ভিত্তি বীজ হতে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা হয়। বীজ অনুমোদন সংস্থার তালিকাভুক্ত চাষি বীজ উৎপাদনের বিধি মেনে যে বীজ উৎপাদন করে তাকে প্রত্যায়িত বীজ বলে। বীজ অনুমোদন সংস্থা এই বীজকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন প্রদান করে। অতঃপর চাষিদের ব্যবহারের জন্য এই বীজ সরবরাহ করা হয়।

বীজ উৎপাদন কৌশল

বীজ উৎপাদন একটি জটিল প্রক্রিয়া। উন্নত মানের বীজ পেতে হলে যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ফসল উৎপাদনের জন্য যেসব ধাপ অতিক্রম করা হয় বীজ উৎপাদনের জন্যও সেভাবেই অগ্রসর হতে হবে। পার্থক্য হল এই যে, বীজ অনুমোদন সংস্থা কর্তৃক তালিকাভুক্ত কৃষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজ উৎপাদন করা হয়।

বীজ উৎপাদনের ধাপ

বীজ উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়।

১. বীজ জমি নির্বাচন
২. বীজ জমি পৃথকীকরণ
৩. বীজ সংগ্রহ
৪. বীজের হার নির্ধারণ
৫. নির্বাচিত জমি প্রস্তুতকরণ
৬. বীজ বপন
৭. রোগিং বা বাছাইকরণ
৮. পরিচর্যা।

১. বীজ জমি নির্বাচন

বীজ উৎপাদনের জন্য উর্বর জমি নির্বাচন করা উচিত। জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত ও আলোবাতাসযুক্ত হতে হবে। নির্বাচিত জমিতে পূর্ববর্তী বছরে একই জাতের বীজের চাষ না হয়ে থাকলে আরোও ভালো। নির্বাচিত জমিতে অন্তত ২% জৈব পদার্থ থাকা উচিত।

২. বীজ জমি পৃথকীকরণ

বীজের উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত জমি ও পার্শ্ববর্তী একই ফসলের জমির মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত শস্য বীজের সাথে যেন অন্য জাতের বীজের সংমিশ্রণ না ঘটে।

৩. বীজ সংগ্রহ

বীজ সংগ্রহ বীজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বীজ উৎপাদনের জন্য অবশ্যই প্রত্যায়িত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময় নিম্নোক্ত তথ্য জেনে নিতে হবে।

ক. জাতের নাম
খ. বীজ উৎপাদনকারীর নাম ও নম্বর
গ. অন্য জাতের বীজের শতকরা হার
ঘ. বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা
ঙ. বীজের আর্দ্রতা
চ. বীজ পরীক্ষার তারিখ।

উল্লিখিত তথ্যগুলো একটি গ্যারান্টি পত্রে ট্যাগ লিখে বীজের বস্তায় বা প্যাকেটে রাখা হয়।

৪. বীজের হার নির্ধারণ

বীজের বিশুদ্ধতা, সজীবতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, আকার, বপনের সময়, মাটির উর্বরতা শক্তি এসব বিবেচনা করে হেক্টর প্রতি বীজের হার নির্ধারণ করা হয়।

৫. নির্বাচিত জমি প্রস্তুতকরণ

এক এক জাতের বীজের জন্য জমির প্রস্তুতি এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন, রোপা ধানের বীজ উৎপাদন করতে জমি ভালোভাবে কর্দমাক্ত করে চাষ করতে হবে। আবার গমের বেলায় জমি শুকনো অবস্থায় ৪-৫ বার চাষ করে পরিপাটি করতে হবে। সার প্রয়োগের মাত্রাও এক এক বীজের জন্য এক এক রকম হবে।

৬. বীজ বপন

নির্বাচিত ফসলের বীজ উপযুক্ত সারিতে বপন করতে হবে। বীজতলায় প্রতিটি বীজ সমান গভীরতায় বপন করা উচিত। কোন বীজ কত গভীরতায় বপন করতে হবে তা বীজের আকার, আর্দ্রতা ও মাটির বুনটের ওপর নির্ভর করে।

৭. রোগিং বা বাছাইকরণ

বীজ বপনের সময় যতই বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করা হোক না কেন জমিতে কিছু কিছু অন্য জাতের উদ্ভিদ ও আগাছা দেখা যাবে। তাই প্রায়ই জমিতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ তুলে ফেলতে হবে। তিন পর্যায়ে রোগিং বা বাছাই করা হয়।

ক. ফুল আসার আগে
খ. ফুল আসার সময়
গ. পরিপক্ব পর্যায়ে।

৮. পরিচর্যা

বীজের উৎপাদনের জন্য খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। নিচে পরিচর্যার একটি তালিকা দেওয়া হল।

ক. সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা
খ. জৈব সার প্রয়োগ
গ. প্রয়োজন মতো সেচ দেওয়া
ঘ. বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি জমলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা
ঙ. আগাছা পরিষ্কার করা
চ. রোগ ও পোকা দমন করা
ছ. সারের উপরি প্রয়োগ করা।

৯. বীজ সংগ্রহ

বীজ পাকার রং ধারণ করার পর পরই কাটতে হবে। তারপর মাড়াই করে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ

ফসলের সাথে আগাছা বা অন্য শস্যের বীজ মিশে থাকতে পারে। বীজ মাড়াই ও ঝাড়ার পর খুব ভালোভাবে বীজ বাছাই করতে হবে। যাতে অন্য বীজ না থাকে। বাছাই করা বীজ রোদে কয়েকদিন ভালোভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ

বীজের আর্দ্রতা যত বেশি হবে বীজের সজীবতা ততই হ্রাস পাবে। ধান, গম ইত্যাদি দানা জাতীয় বীজের আর্দ্রতা শতকরা ৮-১০ ভাগ হলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। বীজের আর্দ্রতা এর বেশি হলে বীজ রোগাক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়। আবার আর্দ্রতা এর কম হলেও সজীবতা নষ্ট হয়।

বীজ সংরক্ষণের সাধারণ নীতি

১. বীজ রাখার গুদাম ঘর শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে হতে হবে।
২. বীজ উত্তমরূপে রোদে শুকিয়ে ছায়ায় ঠান্ডা করতে হবে।
৩. গুদাম ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. যে কোনো ধরনের পাত্রে বা পলিথিন মোড়কে বায়ু বুদ্ধ অবস্থায় বীজ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
৫. বীজ গুদাম ঘর হতে বের করে মাঝে মাঝে রোদে শুকাতে হবে।
৬. গুদাম ঘরে যাতে কীটপতঙ্গের আক্রমণ না হয় সেজন্য রাসায়নিক ধোঁয়া প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ বীজের বিশুদ্ধতার হার নির্ণয়

উপকরণ

বীজ ও নিক্তি।

কাজের ধাপ

১. যে কোনো ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ মেপে নাও।
২. বীজগুলো সাদা কাগজের উপর বিছাও।
৩. বীজগুলো হতে বিশুদ্ধ বীজ বাছাই কর ও মেপে নাও। ধর এর ওজন 'ক' গ্রাম।
৪. অন্য জাতের বীজও বাছাই কর ও মেপে নাও। ধর এর ওজন 'খ' গ্রাম।
৫. পাথর ও কাঁকর জাতীয় জড় পদার্থ বাছাই কর ও মেপে নাও। ধর এর ওজন 'গ' গ্রাম।

৬. এবার নিচের সূত্র ব্যবহার করে বীজের বিশুদ্ধতার হার নির্ণয় কর।

$$\text{বীজের বিশুদ্ধতার হার} = \frac{\text{ক} \times \text{১০০}}{\text{ক} + \text{খ} + \text{গ}} \qquad \text{অন্য বীজের হার} = \frac{\text{খ} \times \text{১০০}}{\text{ক} + \text{খ} + \text{গ}}$$

$$\text{জড় পদার্থের হার} = \frac{\text{গ} \times \text{১০০}}{\text{ক} + \text{খ} + \text{গ}}$$

৭. উল্লিখিত কাজের ধাপগুলো অনুসরণ করে বিভিন্ন বীজের হার নির্ণয় কর ও ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

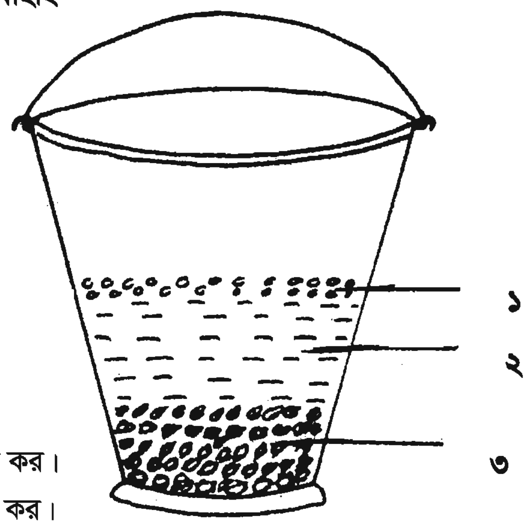
বিষয় ঃ ধানের বীজ বাছাই

উপকরণ

১. ১ কেজি ধানের বীজ
২. ১৩ লিটার পানি
৩. ১টি বালতি
৪. আধা কেজি ইউরিয়া।

কাজের ধাপ

১. ২০ লিটার পানি ধরে এরূপ একটি বালতি নাও।
২. বালতিতে ১৩ লিটার পরিষ্কার পানি নাও।
৩. আধা কেজি ইউরিয়া সার বালতির পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি কর।
৪. এবার ধানের বীজ উক্ত দ্রবণে ছেড়ে দাও। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া কর।
৫. বালতির বীজ ভালোভাবে লক্ষ কর।
৬. ভারী, পুষ্ট ও সবল বীজগুলো বালতির তলায় জমা হয়েছে কিনা দেখ।
৭. অপুষ্ট বীজগুলো বালতির পানিতে ভাসছে কিনা দেখ।
৮. হাত বা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো তুলে ফেল।
৯. এবার বালতির তলায় পড়ে থাকা বীজগুলো তুলে পরিষ্কার পানিতে ২-৩ বার ভালোভাবে ধুয়ে ছায়ায় শুকাও।
১০. উল্লিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করে ধানের বীজ বাছাই কর ও ব্যবহারিক খাতায় লেখ।



১. চিটা ধান
২. ইউরিয়া ও পানির দ্রবণ
৩. পুষ্ট দানা বীজ

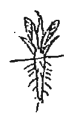
ইউরিয়া পদ্ধতিতে ধান বীজ বাছাই

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি কৃষিতাত্ত্বিক বীজ?

ক. 

খ. 

গ. 

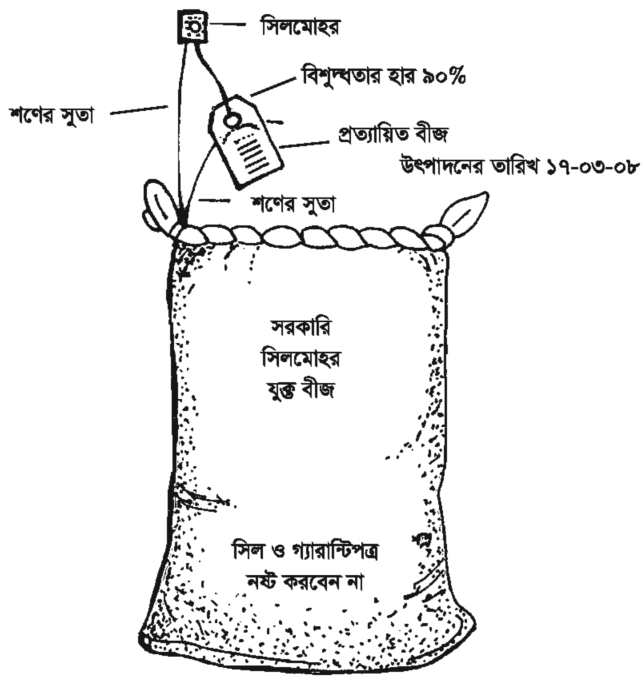
ঘ. 

২. বীজ সংরক্ষণের সাধারণ নীতি হল-
   i. গুদামঘর শুষ্ক ও ঠান্ডা হতে হবে
   ii. গুদামঘর বায়ুরুদ্ধ রাখতে হবে
   iii. বীজ উত্তমরূপে রোদে শুকিয়ে ছায়ায় ঠান্ডা করাতে হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



ক. গ্যারান্টি পত্রে উল্লিখিত প্রত্যায়িত বীজ কী?

খ. বীজ বস্তার সিল ও গ্যারান্টিপত্র নষ্ট না করার জন্য বলার গুরুত্বপূর্ণ ১টি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. গ্যারান্টিপত্রে উল্লিখিত বিশুদ্ধতার হার নির্ণয়ের পরীক্ষাটি বর্ণনা কর।

ঘ. বীজ উৎপাদন পদ্ধতির এবং সাধারণ ফসল উৎপাদন পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষি যন্ত্রপাতি ও সেচ

কৃষি যন্ত্রপাতি

কৃষিকাজ করার জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে কৃষি যন্ত্রপাতি বলে। কৃষির বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কৃষি যন্ত্রপাতিগুলোকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায় -

১. হস্তচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি
২. শক্তিচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি।

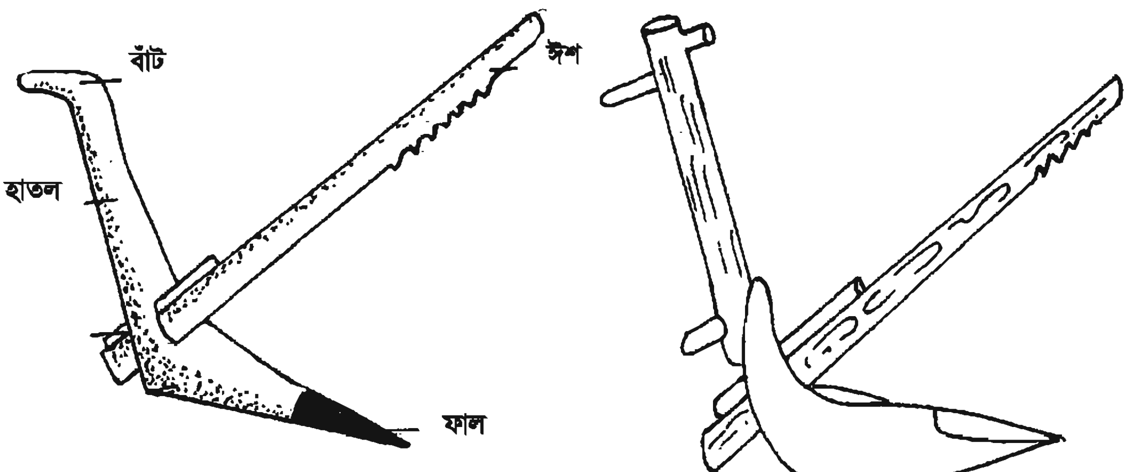
১. হস্তচালিত কৃষি যন্ত্রপাতি

নিচে বাংলাদেশে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয় এমন কতকগুলো হস্তচালিত যন্ত্রপাতির বর্ণনা দেওয়া হল।

লাঙল

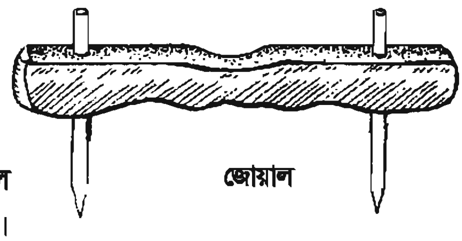
লাঙল বাংলাদেশের কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে অন্যতম। একটি বাঁকানো কাঠের অগ্রভাগে লোহার ফলাযুক্ত করে লাঙল তৈরি করা হয়। জমি চাষ ও অগভীর নালা তৈরির জন্য লাঙল ব্যবহার করা হয়। লাঙলের প্রধান অংশ হচ্ছে-

১. বাঁকানো কাঠ বা শরীর (বডি)
২. লোহার ফাল
৩. ঈশ ও খিল
৪. হাতল ও বাঁট।



লাঙল

জোয়াল



জোয়াল

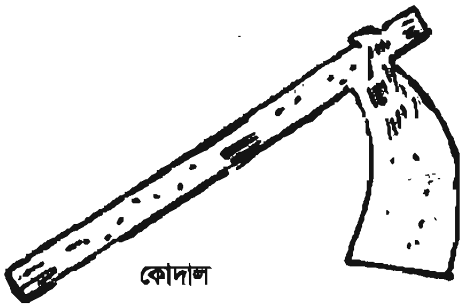
জোয়াল লাঙলের অংশ না হলেও অংশ বলে ধরা হয়। জোয়াল গরুর কাঁধে রেখে একটি রশির সাহায্যে লাঙলের সাথে জোড়া হয়। জোয়াল কাঠ অথবা বাঁশ দ্বারা তৈরি করা হয়।

কোদাল

জমির কোনা ও আইল বরাবর উত্তমরূপে চাষ করার জন্য কোদাল ব্যবহার করা হয়। কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে শাকসবজির বাগান করা হয়। ফলের বাগানে বা সারি করে লাগানো ফসলের জমিতে কোদাল ব্যবহার বেশ সুবিধাজনক। কোদালের অংশ ২টি;

১. ব্লেড বা ফলক- লোহার পাত

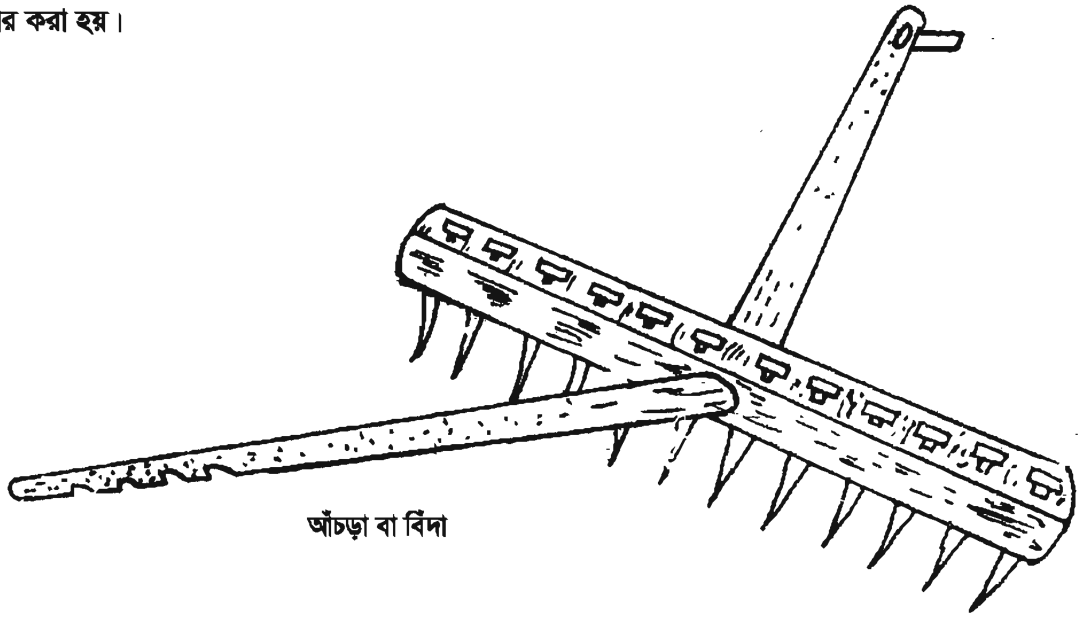
২. হাতল।



কোদাল

আঁচড়া বা বিঁদা

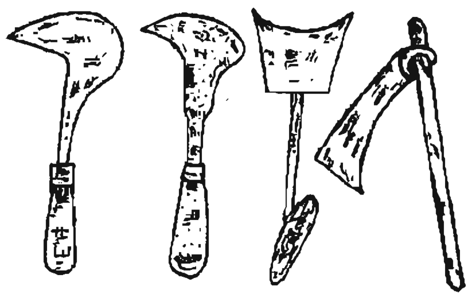
আঁচড়া বাঁশ ও কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়। আগাছা দমন, চারা পাতলাকরণ ও মাটি আলগা করার জন্য ফসলের জমিতে আঁচড়া ব্যবহার করা হয়।



আঁচড়া বা বিঁদা

নিড়ানি

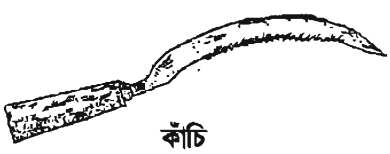
নিড়ানিও কৃষিকাজে খুব বেশি ব্যবহার করা হয়। আগাছা পরিষ্কার ও গাছের গোড়ার মাটি আলগা করার জন্য নিড়ানির প্রয়োজন



নিড়ানি

কাঁচি

কাঁচি ফসল কাটার যন্ত্র।

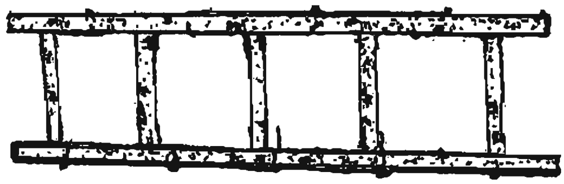


কাঁচি

মই

মই বাঁশ বা কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়। তবে বাঁশ দ্বারা তৈরি মই বেশি প্রচলিত। মই প্রধানত ৪টি কাজ করে-

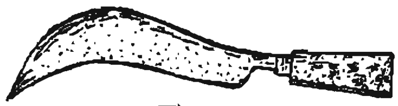
১. মাটির ঢেলা চূর্ণ করে
২. আগাছা দলন করে
৩. মাটি সমতল করে
৪. মাটিতে দৃঢ়তা আনে।



মই

দা

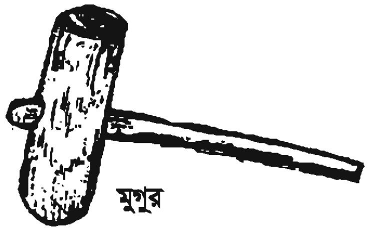
দা লোহার তৈরী কৃষির আনুষঙ্গিক কাজ করার একটি যন্ত্র। নিচের দিকে সরু করে একটি কাঠের বাঁট লাগানো হয়। কাঁচির চেয়ে দা ভারী ও পুরু।



দা

মুগুর

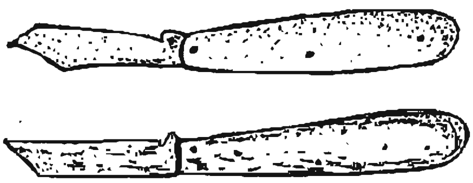
মাটির বড় বড় ঢেলা ভাঙার জন্য মুগুর ব্যবহার করা হয়। মুগুরের দুটি অংশ; -
১. মূল অংশ
২. হাতল।



মুগুর

কলম ছুরি

কলম ছুরি গাছের কলম তৈরি করার জন্য বিশেষভাবে তৈরী এক রকম ছুরি। সাধারণত এই ছুরি নার্সারিতে ব্যবহার করা হয়।



কলম ছুরি

মোল্ডবোর্ড লাঙল

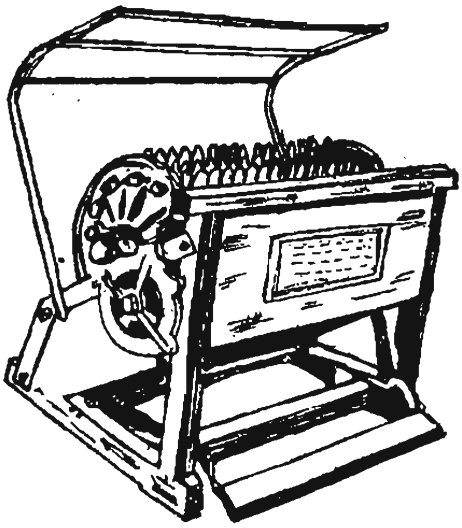
মোল্ডবোর্ড লাঙল দেশি লাঙলের চেয়ে উন্নত। মাটি গভীরভাবে চাষ করার জন্য এই লাঙল ব্যবহার করা হয়। এই লাঙলের কার্যক্ষমতা বেশি।

উন্নত নিড়ানি যন্ত্র

এই যন্ত্র লোহার তৈরী। ধান, পাট, গম ইত্যাদি ফসলের সারির মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করার জন্য এই নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

প্যাডেল থ্রেসার

এটি একটি গিয়ার সংযোগশক্তি সম্পন্ন মাড়াই যন্ত্র। এতে একটি টাইনযুক্ত ড্রাম থাকে। প্যাডেলের সাহায্যে ড্রামের ঘূর্ণন ঘটিয়ে এর উপর ফসলের শীষ রেখে টাইনের আঘাতে শস্য দানা বিচ্ছিন্ন করা হয় অর্থাৎ মাড়াই হয়। এই যন্ত্রটি দামে সস্তা। আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকেরাও ব্যবহার করতে পারে।



প্যাডেল থ্রেসার



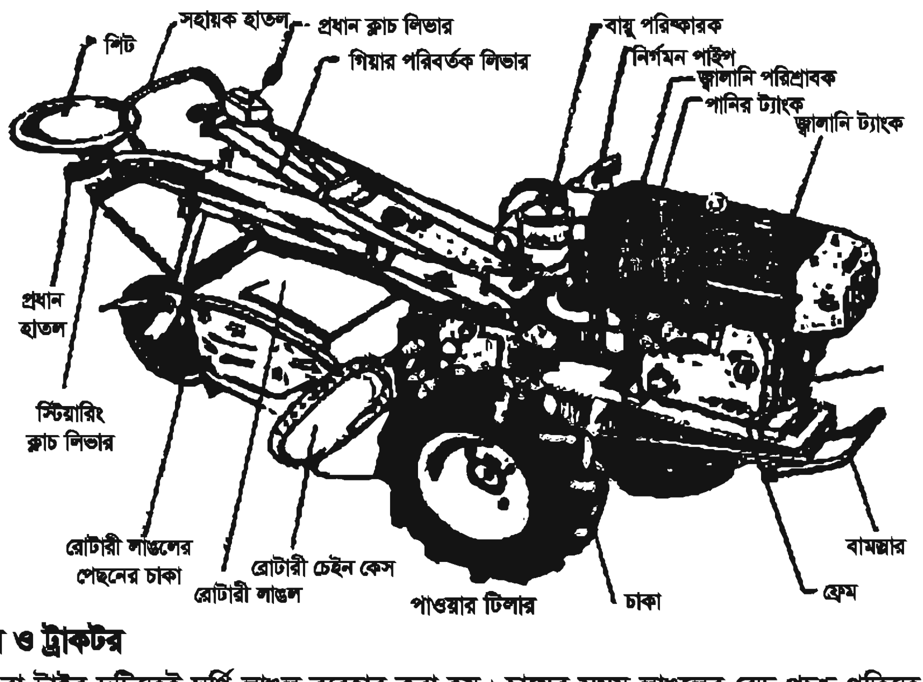
ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

প্যাডেল থ্রেসার ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

এটি একটি বিশেষ ধরনের ওষুধ ছিটানোর যন্ত্র। এর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় ট্রিগারযুক্ত লম্বা ল্যান্সের মাধ্যমে পানি মিশ্রিত তরল বালাইনাশক ছিটানো হয়। যন্ত্র কাঁধে বহন করা যায়। এই স্প্রেয়ার দ্বারা ফসলের মাঠে অথবা ফলের গাছে কীটনাশক ছিটিয়ে পোকামাকড় দমন করা যায়।

শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি

কৃষিকাজের জন্য শক্তিচালিত যন্ত্রপাতির মধ্যে পাওয়ার টিলার, ট্রাকটর, হ্যারো, পাওয়ার পাম্প, অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ, মাড়াই যন্ত্র ও স্প্রেয়ার ইত্যাদিই প্রধান।



পাওয়ার টিলার

পাওয়ার টিলার ও ট্রাকটর

পাওয়ার টিলার বা ট্রাক্টর দুটিতেই ঘূর্ণি লাঙল ব্যবহার করা হয়। চাষের সময় লাঙলের ব্লেড প্রচণ্ড গতিতে মাটি কর্ষণ করে। এতে মাটি ঝুরঝুরে হয় ও আগাছা ধ্বংস হয়। ঘূর্ণি লাঙল ছাড়াও পাওয়ার টিলারের ফালি লাঙল ব্যবহার করা

যায়। পাওয়ার টিলারের ফালি লাঙলে জমিতে গভীরভাবে চাষ দেওয়া যায়। প্রধানত প্রাথমিক চাষের সময় জমিতে ঘূর্ণি লাঙল চালাতে না পারলে ফালি লাঙল দিয়ে চাষ দেওয়া হয়।

পানি সেচ

ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জমিতে পানি সরবরাহকে সেচ বলে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় সেচ অত্যাবশ্যক। সেচ ব্যতীত উন্নত কৃষিকাজের কথা ভাবা যায় না। উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য মাটিতে পরিমিত পানি থাকা দরকার। পানির অভাব হলেই ফসলের জমিতে পানি সেচের প্রয়োজন দেখা দেয়।

সেচের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এই বৃষ্টিপাত সব সময় কৃষিকাজে লাগে না। তাই বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে ফসল চাষাবাদ করলে সব সময় ভালো ফলন পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেও শীত মৌসুমে বৃষ্টি হয় না। আর দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালেও বৃষ্টিপাত কম হয়। ফলে পানির অভাবে ফসলের ফলন কম হয়। এরূপ অবস্থায় ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচ দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পানি সেচের উদ্দেশ্য

পানি সেচের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ।

১. মাটিতে অবস্থিত উদ্ভিদের বিভিন্ন খাদ্য উপাদান দ্রবীভূত রাখা।
২. মাটির জৈব পদার্থের পচনক্রিয়ায় সাহায্য করা।
৩. জমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
৫. শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা।

সেচ পদ্ধতি

বিভিন্ন পদ্ধতিতে জমিতে পানি সেচ দেওয়া যায়। কতকগুলো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সেচ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। বিষয়গুলো হল-

১. মাটির প্রকার ও ভূমির ঢাল
২. পানির উৎস
৩. ফসল প্রকৃতি
৪. আর্থিক সংগতি।

পানি সেচ পদ্ধতিকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা হয়-

১. ভূপৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতি
২. ভূনিম্নস্থ সেচ পদ্ধতি
৩. ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি
৪. ড্রিপ সেচ পদ্ধতি।

ভূপৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতি

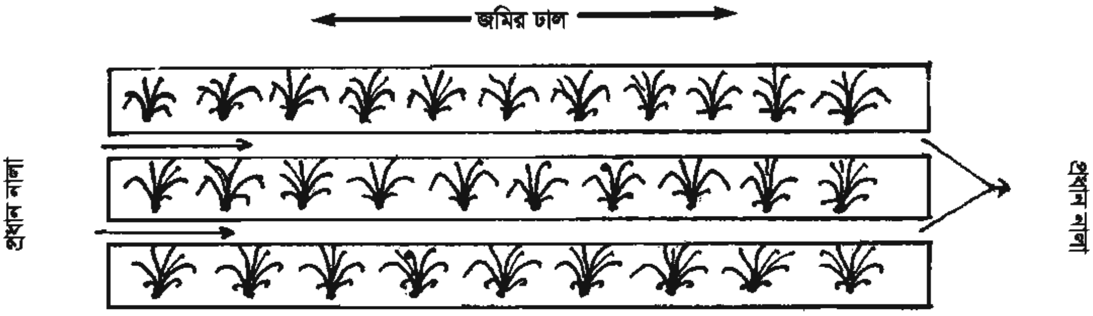
পৃথিবীর সব দেশেই এই পদ্ধতিতে সেচের প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফসলের জমিতে ভূপৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়।

ভূপৃষ্ঠ সেচ পদ্ধতি ৬ প্রকার-

১. প্লাবন সেচ পদ্ধতি
২. নালা সেচ পদ্ধতি
৩. আইল সেচ পদ্ধতি
৪. বাঁধ এবং নালা সেচ পদ্ধতি
৫. করুগেশন সেচ পদ্ধতি
৬. বৃত্তাকার সেচ পদ্ধতি।

১. প্লাবন সেচ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে প্রধান নালার সাহায্যে জমির উপরের অংশে পানি এনে জমির সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পানি জমিতে ধরে রাখার জন্য জমির চারদিকে আইল বেঁধে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে অল্প শ্রমে বেশি এলাকায় সেচ দেওয়া সম্ভব।

২. নালা সেচ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে পানি প্রধান নালা হতে শাখা নালায় সরবরাহ করা হয়। সারিতে লাগানো ফসলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নালা সেচ পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল একই পরিমাণ পানি দ্বারা বেশি পরিমাণ জমিতে সেচ দেওয়া যায়।



নালা সেচ

৩. আইল সেচ পদ্ধতি : আইল পদ্ধতিতে আইল দ্বারা জমিকে সুবিধামতো ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা হয় এবং তাতে প্লাবন আকারে সেচ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে পানি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

৪. বাঁধ এবং নালা সেচ পদ্ধতি : ঢালু জমিতে এই সেচ পদ্ধতিতে পানি সেচ দেওয়া হয়। প্রথমে জমির ঢালে আড়াআড়ি কতগুলো নালা কাটা হয়। পানির উৎস থেকে উঁচু নালায় পানি ছাড়া হয়। জমির সর্বত্র পানি ছড়ানোর জন্য প্রত্যেক নালার শেষ প্রান্ত কেটে দিতে হয়। বাঁধ ও নালা সেচ পদ্ধতিতে সহজে পানি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

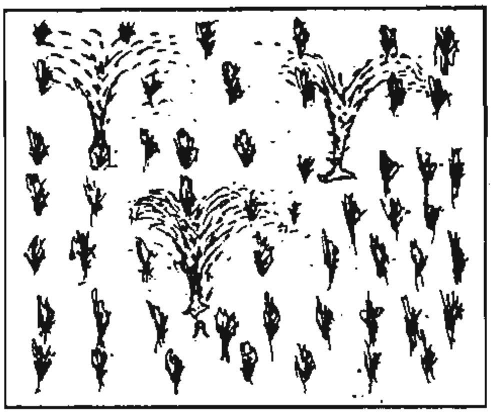
৫. করুগেশন সেচ পদ্ধতি : করুগেশন পদ্ধতিতে জমিতে ছোট ছোট নালা কাটা হয়। নালাগুলো এমন দূরত্বে কাটা হয় যাতে দুই নালার মধ্যবর্তী জমি নালার পানি দ্বারা সিক্ত হতে পারে। এঁটেল মাটির জন্য এই পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া সুবিধাজনক।

৬. বৃত্তাকার সেচ পদ্ধতি : সাধারণত বহুবর্ষজীবী গাছের ক্ষেত্রে এই সেচ প্রযোজ্য। এই পদ্ধতিতে প্রথমে গাছের সারির মধ্য দিয়ে প্রধান নালা কাটতে হয়। তারপর প্রতিটি গাছের গোড়ার চারদিকে বৃত্তাকার নালা কাটতে হয়। এরপর ছোট ছোট নালা কেটে প্রধান নালার সাথে বৃত্তাকার নালা যোগ করতে হয়। ফলের বাগানে এ ধরনের সেচ দেওয়া হয়।

ভূনিম্নস্থ সেচ পদ্ধতি : ভূনিম্নস্থ সেচ পদ্ধতি একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে এক প্রকার নল দ্বারা গাছের শিকড় ও মূল অঞ্চলে সেচ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, এতে মাটির উপর চটা বাঁধে না।

ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি : যে পদ্ধতিতে বৃষ্টির আকারে জমিতে পানি সেচ দেওয়া হয় তাকে ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে পাম্পের সাহায্যে নলের ভেতরে পানি সরবরাহ করে নলের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চতুর্দিকে পানি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অসমতল এবং ঢালু জমিতে এই সেচ পদ্ধতি বেশ উপযোগী।

ড্রিপ সেচ পদ্ধতি : যে পদ্ধতিতে ফোঁটায় ফোঁটায় গাছের গোড়ায় পানি প্রয়োগ করা হয় তাকে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি বলে। ফোঁটা ফোঁটা করে সব সময় গাছের গোড়ায় পানি দেওয়া হয় বলে এটাকে নিত্য সেচও বলে। এই পদ্ধতিতে সেচ দিলে মাটিতে রসের অভাব হয় না।



ফোয়ারা সেচ

ফসলের জমিতে সেচ দেওয়ার সময় : জমিতে আর্দ্রতার পরিমাণ নির্ণয় করে সেচ দেওয়া দরকার। কারণ রস থাকা অবস্থায় সেচ দিলে পানির অপচয় এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি এই দুই ধরনের ক্ষতি হবে। আবার জমি বেশি শুকিয়ে সেচ দিলেও ফসলের তেমন কাজে আসবে না। তাই ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য যথাসময়ে সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ১০ সেমি হতে ১৫ সেমি নিচ পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে মাটি সংগ্রহ করে হাতে চাপ দিলে যদি দলা বাঁধে তবে বোঝা যাবে মাটিতে রস আছে। আর যদি মাটি গুঁড়া হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে এখন ফসলে সেচ দেওয়ার সময় হয়েছে।

বাংলাদেশের সেচ প্রকল্প : দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন সেচ প্রকল্প আছে। নিচে প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পের নাম এবং আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হল।

এসব সেচ প্রকল্প এলাকায় সেচ দিয়ে প্রচুর বোরো, আউশ ও আমন ধান, পাট, গম, আলু, শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করা হয়।

সেচ প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)
১। গঙ্গা- কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (জি.কে. প্রজেক্ট)	১,৪০,০০০
২। বরিশাল সেচ প্রকল্প (বি.আই.পি)	১,০৬,০০০
৩। ভোলা সেচ প্রকল্প	৫২,০০০
৪। ঠাকুরগাঁও গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প	৪৬,০০০
৫। চাঁদপুর সেচ প্রকল্প (সি.আই.পি)	২৯,০০০
৬। মুহুরী সেচ প্রকল্প (এম.আই.পি)	২৭,০০০
৭। পাবনা আইআরডি	২৫,০০০
৮। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	১৭,০০০
৯। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (কে.আই.পি)	১৮,০০০

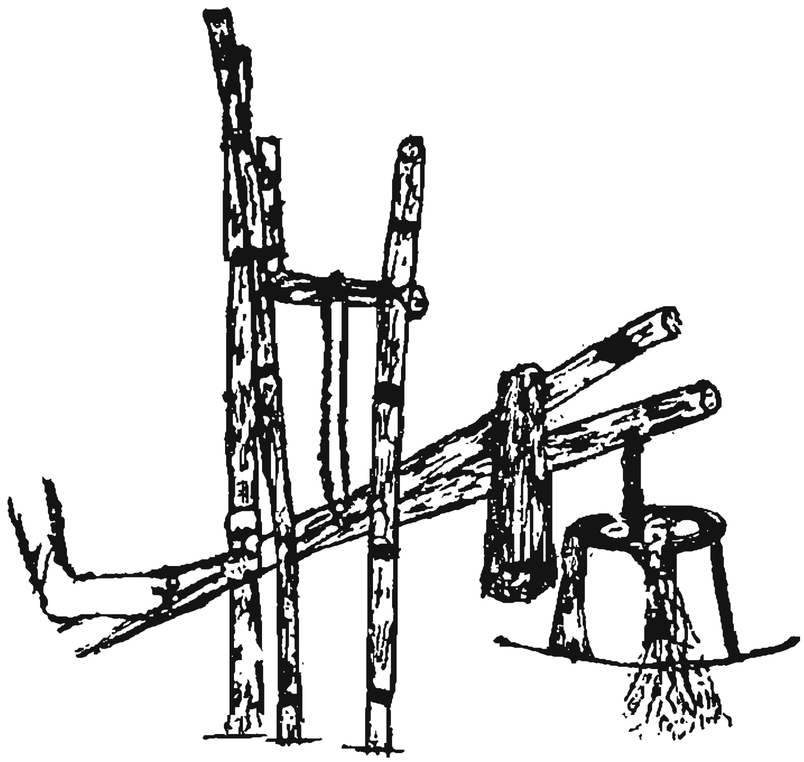
পানি সেচের যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশে ফসলের জমিতে সেচের জন্য নানা প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। নিচে কয়েকটি যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১. সেঁউতি : বাঁশ, বেত বা টিন দ্বারা তিন কোনা করে তৈরি করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই সেচের জন্য সেঁউতি এদেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

২. দোন : সরু নৌকার মতো করে তাল গাছের গুঁড়ি কিংবা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। এটিও প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

৩. ট্রেডেল পাম্প : ট্রেডেল পাম্প প্লাস্টিক ঢাকনাযুক্ত ধাতব এক বা দুই সিলিন্ডার বিশিষ্ট হস্তচালিত পাম্প। মাটির নিচে চালনিযুক্ত একটি বাঁশ পোঁতা হয়। অতঃপর পাম্পটি বাঁশের নলের মুখে সংযোগ করা হয়। এরপর লিভারের মতো দুটি বাঁশ লাগানো হয়। ঢেঁকির মতো করে পায়ের দ্বারা লিভার যন্ত্র চালিয়ে পানি উত্তোলন করা হয়। এটি একটি জনপ্রিয় পাম্প।



ট্রেডেল পাম্প

৪. সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প : এটি একটি বহুল ব্যবহৃত শক্তিচালিত সেচযন্ত্র। লোলিট পাম্প, অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ব্যবহার করে নদী ও ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সেচ দেওয়া হয়।



সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প

পানি নিকাশ

ফসলের জমি হতে কৃত্রিম উপায়ে অতিরিক্ত পানি সরানোর পদ্ধতিকে পানি নিকাশ বলে। অতিরিক্ত পানি গাছের জন্য খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই যেসব জমিতে বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি জমা হয়ে থাকে সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকাশ করা প্রয়োজন।

পানি নিকাশের গুরুত্ব

সমতল হলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিই উঁচুনিচু। অতিবৃষ্টির কারণে বর্ষাকালে এসব জমিতে পানি জমে। এর ফলে সময়মতো চাষাবাদ করা যায় না। অধিকন্তু, প্রতিবছর বন্যায় বিরাট এলাকা জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এসব জমিতে ঠিক সময়ে চাষাবাদ করতে হলে জমে থাকা পানি সরানো উচিত। নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জমিতে পানি বেশি জমে থাকে।

১. ভারি কাদা মাটির জমি
২. উঁচু নিচু জমি
৩. কঠিন স্তরবিশিষ্ট মাটির জমি।

ফসল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমি থেকে যথাসময়ে পানি নিকাশ করা দরকার।

অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর প্রভাব

১. গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত করে।
২. রোগ বালাইয়ের বিস্তার ঘটায়
৩. গাছের মূল ঠিকমতো বিস্তার লাভ করতে পারে না।
৪. উপকারী জীবাণু বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।
৫. গাছের খাদ্য উপাদান বিনষ্ট হয়।
৬. মাটির তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

পানি নিকাশ পদ্ধতি

দুই পদ্ধতিতে পানি নিকাশ করা হয়ে থাকে। ১। খোলা নালা পদ্ধতি ২। বন্ধ নালা পদ্ধতি।

খোলা নালা পদ্ধতি

আমাদের দেশে সাধারণত খোলা নালা পদ্ধতিতে আবাদি জমিতে পানি নিকাশ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে জমির সুবিধামতো স্থানে নালা কাটা হয়। পানি তাড়াতাড়ি অপসারণের জন্য নালা ঢালু করে কাটা দরকার। প্রয়োজনমতো প্রধান নালার সাথে ছোট ছোট নালাও যুক্ত করা হয়।

বন্ধ নালা পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে নালা কেটে মাটির ভেতরে আবদ্ধ করে সেই নালা দ্বারা পানি অপসারণ করা হয় তাকে বন্ধ নালা পদ্ধতি বলে। বন্ধ নালা পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হচ্ছে এতে কোনো জমি নষ্ট হয় না। এই পদ্ধতি আবার তিন প্রকার-

১. নল পদ্ধতি
২. বাক্স নালা পদ্ধতি
৩. পাথর নালা পদ্ধতি।

১. নল পদ্ধতি

প্লাস্টিক নল বিশেষভাবে ফসলের জমিতে স্থাপন করে জমির অতিরিক্ত পানি অপসারণ করা হয়।

২. বাক্স নালা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে আয়তকার নালা কেটে নালার দুই দিকের গায়ে পাথর বসানো হয়। এরপর নালায় পাথরের টুকরা বসিয়ে মাটি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়।

৩. পাথর নালা পদ্ধতি

বাক্স নালার মতোই আয়তকার নালা কেটে তাতে ছোট বড় পাথর দিয়ে ভরে মাটি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। পাথরের ফাঁক দিয়ে অতিরিক্ত পানি সরে যায়।

ব্যবহারিক

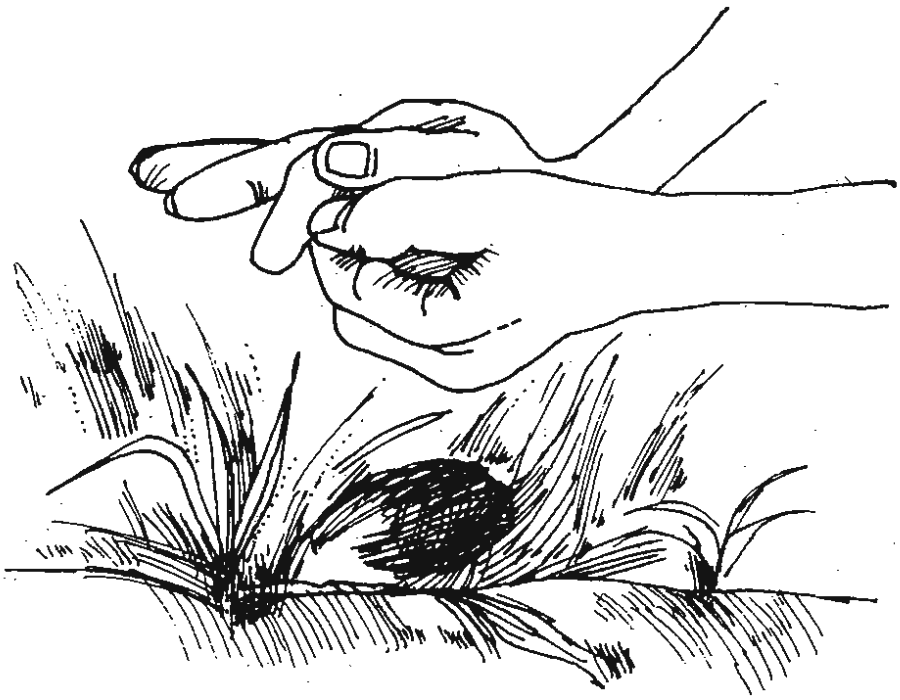
বিষয় ঃ মাটির আর্দ্রতা নির্ধারণ

উপকরণ

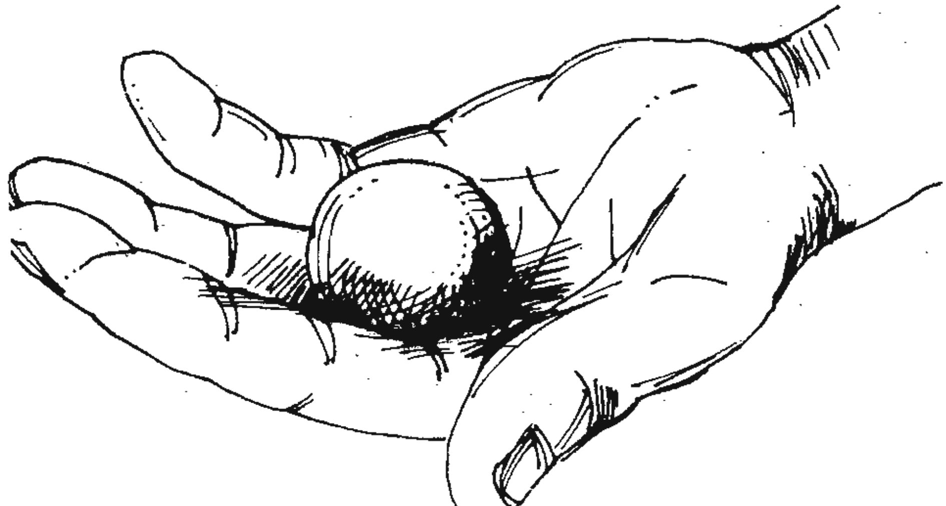
১. নিড়ানি বা কোদাল।

কাজের ধাপ

১. গম বা শাকসবজির যে কোনো একটি ফসলের মাঠে যাও।
২. জমিতে ১৫-২০ সেমি গভীর করে গর্ত কর।
৩. গর্ত থেকে এক মুঠ মাটি নিয়ে হাতের মুঠোয় চাপ দাও। যদি হাতের তালু ভিজে যায় তবে বুঝবে মাটিতে পানি আছে। এখনই সেচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
৪. হাতের মুঠোয় চাপ দেওয়ার পর যদি মাটি দলা হয় তবে দলাটি নিচে ফেল। দলা যদি ভেঙে যায় তবে বুঝবে মাটিতে পানির অভাব রয়েছে। দুই-তিন দিনের মধ্যে সেচ দিতে হবে।
৫. হাতের মুঠোয় চাপ দেওয়ার পর যদি দলা তৈরি না হয় তবে বুঝতে হবে মাটি খুবই শুকনো। অতএব, তাড়াতাড়ি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।



গর্তের তলা থেকে মাটি নিয়ে হাতের মুঠোয় চাপ



হাতের মুঠোয় চাপে মাটি দলা

বিষয় : কৃষি যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

উপকরণ

১. বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি।

কাজের ধাপ

১. কৃষি শিক্ষকের সাথে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বা পাশের কৃষকের বাড়িতে যাও।
২. সকল কৃষি যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ কর।
৩. পুস্তকে প্রদত্ত কৃষি যন্ত্রপাতির ছবির সাথে মিলিয়ে যন্ত্রপাতির চিত্র আঁক।
৪. প্রত্যেকটি কৃষিযন্ত্র শনাক্ত কর ও কাগজে যন্ত্রের নাম লেখ।
৫. কোন যন্ত্র দ্বারা কী কাজ করা হয় তা লেখ।

বিষয় : লাঙলের বিভিন্ন অংশ শনাক্তকরণ

উপকরণ

১. ১টি লাঙল ২. কাগজ কলম।

কাজের ধাপ

১. বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে লাঙল পর্যবেক্ষণ কর।
২. লাঙলের প্রধান প্রধান অংশগুলো শনাক্ত করে চিত্র আঁক।
৩. বইয়ে প্রদত্ত ছবির সাথে অংশগুলো মিলিয়ে দেখ।
৪. ব্যবহারিক খাতায় একটি লাঙল আঁক ও শনাক্তকৃত অংশ লেবেল করে দেখাও।
৫. লাঙলের বিভিন্ন অংশের কাজ ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

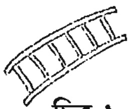
১. নিচের কোনটি পা চালিত যন্ত্র ?

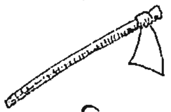
ক. পাওয়ার ট্রিলার　　খ. মাড়াই যন্ত্র
গ. ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার　　ঘ. প্যাডেল থ্রেসার

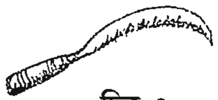
২. বৃত্তাকার সেচ পদ্ধতি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

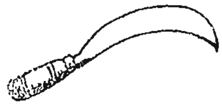
ক. মাঠ ফসল　　খ. সবজি বাগান
গ. ফল বাগান　　ঘ. চা বাগান

৩. নিচের চিত্রিত কোন যন্ত্র টি আগাছা দমনে ব্যবহৃত হয়-


চিত্র-১


চিত্র-২


চিত্র-৩


চিত্র-৪

ক. চিত্র- ১ খ. চিত্র- ২
গ. চিত্র- ৩ ঘ. চিত্র- ৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পাবনা সদর উপজেলার নয়া কৃষক নজরুল ইসলাম খরিপ-১ মৌসুমে পাট বীজ বোনার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কোনো বৃষ্টিপাতের লক্ষণ না থাকায় বাধ্য হয়ে সে জমিতে সেচ দেয়। এ পরিস্থিতিতে তাকে আরও ১৫-২০ দিন চাষের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এতে তার মনে পাট চাষে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়।

৪. নজরুল ইসলামকে সেচের পরেও ১৫-২০ দিন চাষের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে কারণ-
i. মাটির আর্দ্রতা পরিমাপ না করে সেচ দেওয়ায়
ii. মাত্রাতিরিক্ত সেচ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারায়
iii. পাওয়ার ট্রিলারের ব্যবস্থা করতে না পারায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. ইসলাম সাহেব পাট ছাড়াও এ মৌসুমে নিচের কোন সারির সবগুলো ফসলই চাষ করতে পারে?
ক. আউশ ধান, পাট ও বাদাম খ. বেগুন, আমলকি ও জলপাই
গ. পাট, আউশ ধান ও করলা ঘ. মিষ্টিকুমড়া, পটল ও তাল

সৃজনশীল প্রশ্ন

জামাল মিয়া তার লিচু বাগানে প্রতিবছর শক্তিচালিত সেচ যন্ত্রের সাহায্যে সেচ দেন। তিনি একই সেচ যন্ত্র দিয়ে আলুর জমিতেও সেচ দিয়ে থাকেন। এবার অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় তার আলুর জমিতে পানি জমে যায়। তিনি জমির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ক. সেচ কী?
খ. জামাল মিয়া কেন আলুর জমির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করেন।
গ. জামাল মিয়া তার আলুর জমিতে যে সেচ পদ্ধতির ব্যবস্থা করেছিলেন তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শক্তিচালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শস্য সংরক্ষণ

পোকামাকড়, রোগবালাই, ইঁদুর ইত্যাদির আক্রমণ থেকে খেতের শস্য রক্ষার ব্যবস্থাপনাকে শস্য সংরক্ষণ বলে। পোকামাকড়, রোগবালাই ও ইঁদুর ফসলের প্রধান শত্রু। উৎপাদিত ফসলের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতি বছরই এদের দ্বারা নষ্ট হয়। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা যায়।

ফসলের খেতে ক্ষতিকর পোকার সাথে নানাপ্রকার উপকারী পোকাও থাকে। এরা ফুলের পরাগায়ণে সাহায্য করে এবং ক্ষতিকর পোকামাকড়ের ডিম ও কীড়া খেয়ে অনেক উপকার করে। অতএব, উপকারী পোকা রক্ষা করেই ক্ষতিকর পোকা দমন করা উচিত।

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা বলতে উপকারী পোকা রক্ষা করে কয়েকটি দমন পদ্ধতি একযোগে গ্রহণ করে ক্ষতিকর পোকা দমন করাকে বোঝায়। সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে একাধিক দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে বালাইয়ের আক্রমণ প্রতিহত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্ণ বয়স্ক পামরি পোকা হাতজাল বা মশারি দ্বারা ধরে মারা যায়। ধান গাছের আক্রান্ত পাতার অগ্রভাগ কীড়াসহ কেটে মাঠ হতে মারা যায়। একই সাথে গাছের ডালে পাখির আগমন ঘটিয়ে পাখি দ্বারা পোকামাকড় কমানো যায়। এসব ব্যবস্থা এক সাথে গ্রহণ করার পরও যদি পোকা দমন সম্ভব না হয় তবেই সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সঠিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ক. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপকারিতা

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মধ্যে অনেক উপকার আছে। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হল।

১. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে ও পরিবেশের জৈবিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

২. উপকারী পোকামাকড়, ব্যাঙ ও মাছ সংরক্ষণ করে।

৩. কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনে।

৪. কম খরচে ফসল সংরক্ষণে সাহায্য করে।

৫. খাদ্য দ্রব্যকে কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্ত রাখে।

খ. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপাদান

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপাদান ৪টি।

১. আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি

২. যান্ত্রিক দমন

৩. জৈবিক দমন

৪. রাসায়নিক পদ্ধতি।

আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি

ক. গভীরভাবে জমি চাষ করা

গভীরভাবে জমি চাষ করা হলে মাটির নিচের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও কীট মাটির উপরে আসবে। এতে প্রখর রোদে কিছু মারা যাবে এবং কিছু পাখিরাও খাবে।

খ. পর্যায়ক্রমে চাষ করা

এক এক পোকা এক এক ফসল আক্রমণ করে। কোনো জমিতে একই ফসল বারবার চাষ করলে সেই জমিতে পোকার আক্রমণ বেশি হবে। কিন্তু উৎপাদন পরিকল্পনা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে একখণ্ড জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করলে পোকা ও রোগের আক্রমণ কম হয়। যেমন– পাট চাষের পর রোপা আমনের চাষ করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

গ. সুষম মাত্রায় সারের ব্যবহার

জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করলে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। কোনো ফসলে ইউরিয়া সার বেশি প্রয়োগ করলে গাছের ডগা ও পাতা বেশি রসালো হয়। এতে পোকা অধিক আকৃষ্ট হয়। আবার পটাশ সার কম পড়লে রোগের আক্রমণ বেশি হয়। অতএব, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা উচিত।

ঘ. সেচ ব্যবস্থাপনা

অনেক পোকা আছে যেগুলো মাটির নিচে কচি চারা কেটে দেয়। যেমন-উরচুঙ্গা। পাটের জমিতে উরচুঙ্গা অনেক ক্ষতি করে। উরচুঙ্গায় আক্রান্ত পাটের জমিতে প্লাবন সেচ দিলে পোকা দমন করা যায়। আবার ধান খেত হতে পানি সরিয়ে চুঙ্গি পোকা দমন করা যায়।

ঙ. রোপণ দূরত্ব

পাতলা করে চারা রোপণ করলে ধান খেতে বাদামি গাছ ফড়িং-এর আক্রমণ কমানো যায়।

চ. উন্নত জাতের ফসলের চাষ

ফসলের অনেক উন্নত জাত আছে যেগুলো রোগ ও পোকা প্রতিরোধক। যেমন বিআর- ১০ ধানের জাত টুংরো ভাইরাস ও ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। চান্দিনা ধান মাজরা পোকা প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

যান্ত্রিক দমন

হাত বা ফাঁদ দ্বারা পোকা দমনকে যান্ত্রিক দমন বলে। যান্ত্রিক দমনের অনেক উপায় আছে। নিচে কয়েকটি যান্ত্রিক দমনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ক. হাতে পোকা ধরা

ফসলের খেত হতে হাত দিয়ে পোকামাকড়ের ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে দমন করা যয়। ধান ও আখ খেতের মাজরা পোকা এভাবে দমন করা যায়। আবার ধানের পামরি ও সবুজ পাতা ফড়িং হাতজাল দিয়ে সংগ্রহ করে ধ্বংস করা যায়।

খ. পাতার আগা কাটা

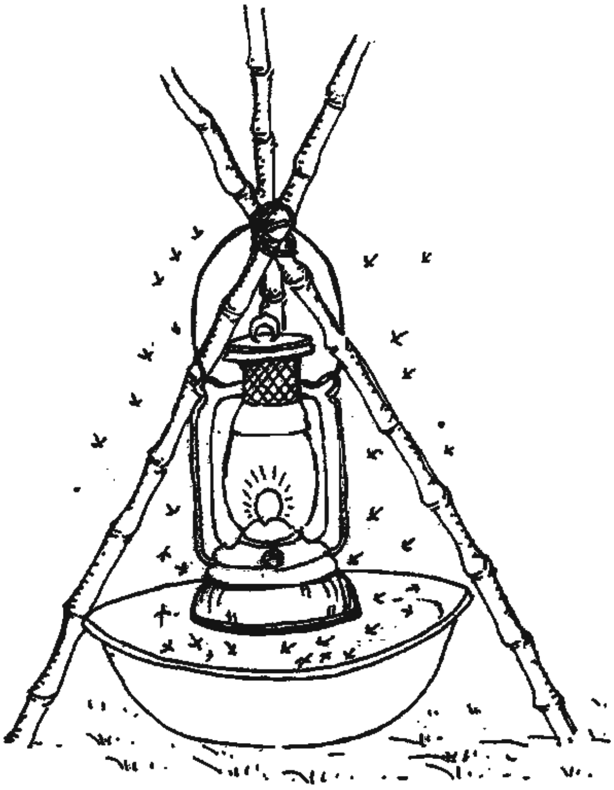
পামরি পোকা ও পাতা মোড়ানো পোকা সাধারণত ধান গাছের পাতার আগায় প্রথম আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় গাছের পাতার আগা কেটে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

গ. আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলা

গাছে রোগ বা পোকার আক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলেই আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলা উচিত। এতে সমস্ত শস্যখেতে রোগ ও পোকার আক্রমণ ছড়ায় না।

ঘ. আলোর ফাঁদ

আলোর ফাঁদ পেতে কীটপতঙ্গ আলোর দিকে আকৃষ্ট করে পোকা মারা যায়। রাতে জমিতে একটি পাত্রে কেরোসিন বা কীটনাশক মিশ্রিত পানি রাখতে হবে। ঐ পাত্রের উপর একটি হারিকেন ঝুলিয়ে রাখলে অনেক পোকা হারিকেনের আলোর প্রতি আকৃষ্ট হবে। এতে পোকাগুলো কীটনাশক বা কেরোসিনের পাত্রে পড়ে মারা যাবে। পূর্ণাঙ্গ মাজরা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং ও গান্ধী পোকা আলোর ফাঁদ পেতে দমন করা যায়।


আলোর ফাঁদ পেতে পোকা দমন

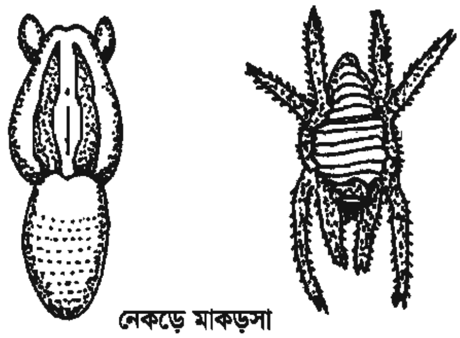
জৈবিক দমন

পরজীবী পোকা ও পাখি ব্যবহার করে পোকামাকড় দমনকে জৈবিক দমন বলা হয়। অনেক পোকা আছে যেগুলো অন্য পোকা খেয়ে বেঁচে থাকে। এসব পোকাকে পরজীবী বা পরভোজী পোকা বলে। যেমন- নেকড়ে মাকড়সা, লেডিবার্ড বিটল, মিরিড বাগ ও পরজীবী পোকা। নিচে কয়েকটি পরজীবী পোকার বিবরণ দেওয়া হল।

নেকড়ে মাকড়সা

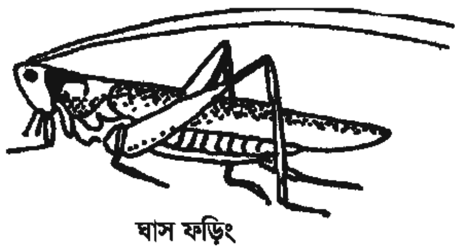
আবাসস্থল : ধানখেত নেকড়ে মাকড়সার আবাসস্থল। এরা বেশিরভাগ সময় ধান গাছের গোড়ায় থাকে।

খাদ্য : নেকড়ে মাকড়সা জাল বানায় না। পোকার উপর সরাসরি আক্রমণ করে খায়। পূর্ণবয়স্ক মাকড়সা নানা প্রকার পোকা ধরে খায়। এগুলোর মধ্যে ধানের মাজরা পোকার মথ অন্যতম।


নেকড়ে মাকড়সা

ঘাস ফড়িং

আবাসস্থল : ঘাস ফড়িং-এর মধ্যে শুঁড় লম্বা ঘাস ফড়িং পরজীবী। এই ঘাস ফড়িং গাছের পাতা ও শীষে অবস্থান করে। বাড়ন্ত বয়সের ধান গাছে এদের অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।


ঘাস ফড়িং

খাদ্য : এ ঘাস ফড়িং শোষক পোকা, মাজরা পোকা ও গান্ধী পোকার বাচ্চা খেয়ে থাকে। রাতের বেলা এরা শিকার ধরে থাকে।

ড্যামসেল মাছি

আবাসস্থল : পূর্ণবয়স্ক ড্যামসেল মাছি ধান গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উড়ে বেড়ায়। আর বাচ্চাগুলো পানিতে থাকে। কিন্তু পাতা ফড়িং ও গাছ ফড়িং-এর বাচ্চা ধরে খাওয়ার জন্য এরা গাছের পাতা বেয়ে উপরে উঠে যায়।



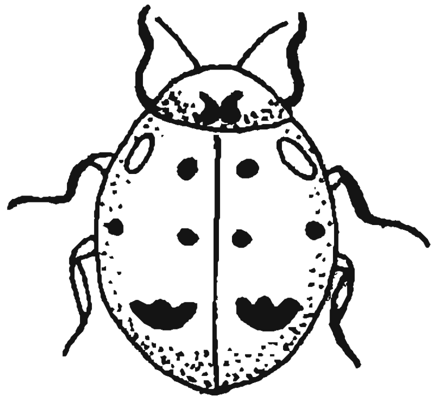
ড্যামসেল মাছি

খাদ্য : এই মাছি বিভিন্ন ধরনের ফড়িং ও পাতা মোড়ানো পোকা ধরে খায়।

লেডিবার্ড বিটল

আবাসস্থল : লেডিবার্ড বিটল কুমড়া জাতীয় গাছ এবং ধানখেতসহ প্রায় সব ফসলেই দেখা যায়।

খাদ্য : যে সমস্ত পোকা আস্তে আস্তে চলাফেরা করে তাদেরকেই এরা শিকার করে। এই পোকা শোষক পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা ও মাজরা পোকা খেয়ে থাকে। বাচ্চা লেডিবার্ড বিটল পূর্ণ বয়স্কদের চেয়ে বেশি পোকা খেতে পারে।

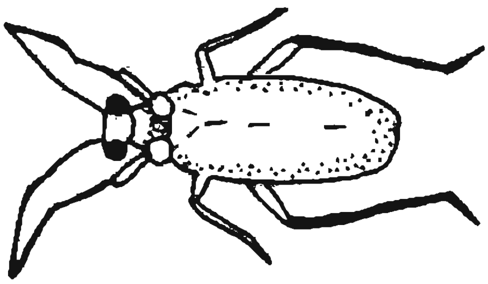


লেডিবার্ড বিটল

মিরিডবাগ

আবাসস্থল : মিরিডবাগেরও আবাসস্থল ধানখেত। পাতা ফড়িং ও গাছ ফড়িং দ্বারা আক্রান্ত ধানখেতে এই পোকা প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়।

খাদ্য : মিরিডবাগ ধান গাছের পাতার খোলে বা গাছের কাণ্ডে পাতা ফড়িং-এর ডিম খুঁজে বেড়ায়। ডিমের ভেতরে শুঁড় ঢুকিয়ে ডিমগুলো শুষে খায়।



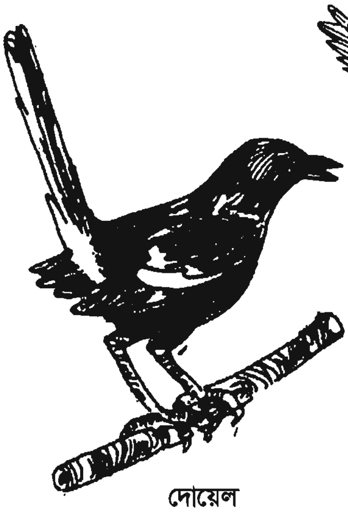
মিরিডবাগ

পোকা খাদক পাখি ও ব্যাঙ

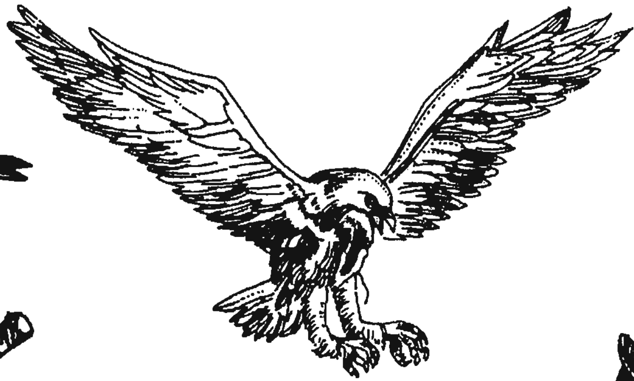
প্রায় সকল ধরনের পাখি ফসলের খেতের পোকা মাকড় খেয়ে আমাদের অনেক উপকার করে। এরূপ পাখিদের মধ্যে ফিঙে, শালিক, দোয়েল, ময়না প্রধান। এছাড়াও কাক, বাজপাখি, পেঁচা ইঁদুর খেয়ে ইঁদুর দমনে সাহায্য করে। খেতের আইলের পাশে লাউ ও শিমের মাচা দিলে অথবা খেতে গাছের ডাল বা জাংলাসহ বাঁশ পুঁতে দিলে পাখি বসার সুযোগ পায়। এরা খেতের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পোকা খেয়ে পোকা দমনে সহায়তা করে।

ব্যাঙ

ব্যাঙ পানিতে ও মাটিতে উভয় স্থানেই বাস করে। পোকামাকড়ই ব্যাঙের প্রধান খাদ্য। ফসলের খেতের পোকা দমনের জন্য ব্যাঙকে ব্যবহার করা যায়।



দোয়েল



ঈগল



ব্যাঙ



পেঁচা

রাসায়নিক পদ্ধতি

রাসায়নিক পদ্ধতি সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার একটি উপায়। এই পদ্ধতি তখনই ব্যবহার করা হয় যখন পোকার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে যান্ত্রিক বা জৈবিক উপায়ে দমন সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ধানের খেতে প্রতি বর্গমিটারে ৩টি স্ত্রী মথ অথবা ৩টি ডিমের গাদা বা রোপণের ৪০ দিন পর্যন্ত শতকরা ১০ ভাগ মরা ডগা দেখা দিলে রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে।

ইঁদুর দমন

ইঁদুর মানুষের ঘরে এবং ফসলের খেতে ক্ষতি করে। এরা মানুষের খাদ্যে ভাগ বসায়। ইঁদুর ফসলের শতকরা প্রায় ১০-২০ ভাগ ক্ষতি করে থাকে। ইঁদুর দিনরাত কাঠ, কাপড়, আসবাবপত্র ও ফসল কাটতে থাকে। এরা শুধু জিনিসপত্রেরই ক্ষতি করে না, নানা ধরনের মারাত্মক রোগও ছড়ায়। ইঁদুর প্লেগ রোগ ছড়িয়ে থাকে। এই রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। কয়েক জাতের ইঁদুর ফসলের মাঠে বা বাড়িঘরে দেখতে পাওয়া যায়।

১. কালো ইঁদুর
২. গেছো ইঁদুর
৩. বাদামি ইঁদুর।

বাংলাদেশে বাদামি ইঁদুরের উপদ্রব বেশি।

একজোড়া ইঁদুর বছরে গড়ে ৮০০-১০০০টি বাচ্চা দিতে পারে।

ইঁদুরের উপস্থিতির লক্ষণ

ইঁদুরের উপস্থিতির লক্ষণ নিম্নরূপ।

১. ইঁদুরের মাটি : ইঁদুর ঘরবাড়িতে ও ফসলের মাঠে গর্ত করে থাকে। ইঁদুরের গর্তের মাটির দানা দেখে এদের উপস্থিতি বোঝা যায়।

২. চলাচলের রাস্তা : নরম মাটিতে ইঁদুর চলাফেরা করলে পায়ের চিহ্ন পড়ে। রাস্তা পরিষ্কার করে এরা চলাফেরা করে।

৩. বিষ্ঠা : ইঁদুরের বিষ্ঠা দেখে এদের উপস্থিতি বোঝা যায়।

৪. গন্ধ : ইঁদুর খারাপ গন্ধ ছড়ায়। এই গন্ধ থেকেও ইঁদুরের অস্তিত্ব বোঝা যায়।



ইঁদুর

৫. ক্ষতির চিহ্ন : ইঁদুর যা কিছু কাটে তেরছা করে কাটে। এই কাটা চিহ্ন দেখে ইঁদুরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

৬. শব্দ : ইঁদুর চলাফেরার সময় খসখস শব্দ হয় এবং কোনো কিছু কাটার সময় কুটকুট আওয়াজ পাওয়া যায়।

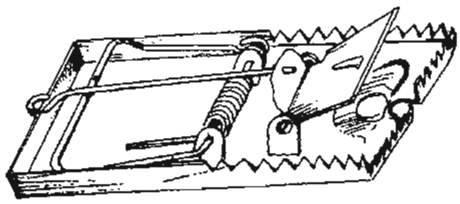
ইঁদুর দমন

বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন করা যায়।

১. ইঁদুর মারার ফাঁদ
২. বিষটোপ
৩. ইঁদুরের গর্তে পানি ঢালা
৪. বিড়াল পালন করা।

১. ইঁদুর মারা ফাঁদ

বাজারে ইঁদুর মারার অনেক রকম ফাঁদ পাওয়া যায়। খাবারের টোপ দিয়ে ইঁদুরকে ফাঁদে ফেলে মারা যায়।



ইঁদুর মারার ফাঁদ

২. বিষটোপ

জিংক ফসফাইড, রেকুমিন, ফসটকসিন প্রভৃতি ইঁদুরনাশক ওষুধ দিয়ে বিষটোপ তৈরি করে ইঁদুরের গর্তে অথবা চলার পথে রাখলে ইঁদুর খেয়ে মারা যায়। ল্যানিরেট নামক আরো এক ধরনের লাল দানার মতো ওষুধ পাওয়া যায়। ১০ গ্রাম বিষাক্ত দ্রব্য ইঁদুরের চলার পথে রাখলে ইঁদুর খেয়ে মারা যায়।

৩. গর্তে পানি ঢালা

ইঁদুরের গর্তে প্রচুর পানি ঢেলে ইঁদুর মারা যায়।

৪. বিড়াল পালন করা

বিড়াল ইঁদুর শিকার করতে পছন্দ করে। বাড়িতে বিড়াল পালন করেও ইঁদুর দমন করা যায়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ ধানের পোকা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ

উপকরণ

পোকা ধরার হাতজাল, পোকা রাখার ১টি জার, কাগজ, পেন্সিল।

কাজের ধাপ

১. একটি হাতজাল ও একটি জার নিয়ে বিদ্যালয়ের পাশের ধানখেতে যাও।
২. জাল টেনে ধানখেত হতে পোকা ধর।
৩. পোকাগুলো জারে রাখ ও জারের মুখ ঢাকনা দ্বারা বন্ধ কর।
৪. জারের রক্ষিত পোকা শ্রেণী কক্ষে আন।
৫. জার হতে একটি একটি করে পোকা বের কর। বইয়ের তাত্ত্বিক অংশে দেওয়া ছবির সাথে মেলাও। আর কাগজে নাম লিখে রাখ।

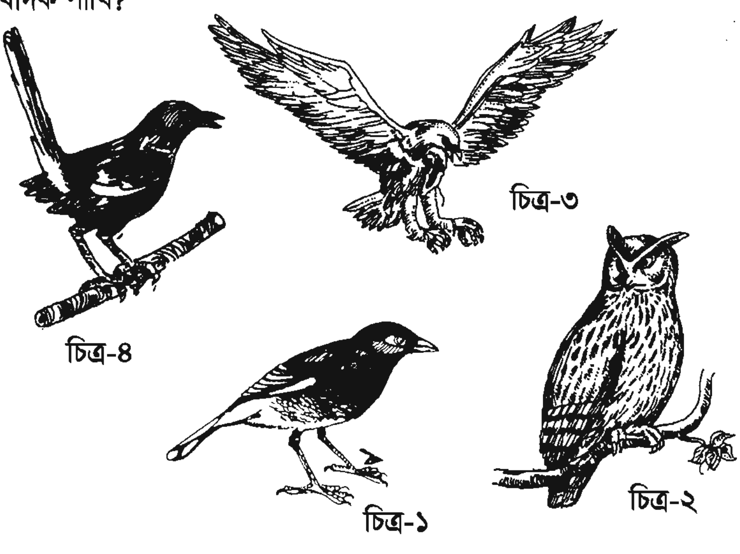
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে পোকা দমনের আওতায় পড়ে?

ক. হাত জাল দিয়ে পোকা ধরা   খ. পাতার আগা কাটা
গ. ধানের পরে পাট চাষ   ঘ. আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলা

২. কোনগুলো পোকা খাদক পাখি?



ক. চিত্র -১ ও চিত্র- ২   খ. চিত্র -২ ও চিত্র- ৩
গ. চিত্র -৩ ও চিত্র- ৪   ঘ. চিত্র -১ ও চিত্র- ৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আনোয়ার একদিন সকালে গভীরভাবে জমি চাষ করছিলেন। তখন কিছু পাখির আনাগোনা শুরু হল। তিনি দেখতে পান জমি থেকে উঠে আসা পোকামাকড় পাখিগুলো খাচ্ছে। এই বিষয়টি আনোয়ারকে পোকা দমনে উদ্বুদ্ধ করে। পাখি বসার জন্য সে জমিতে ডাল পুতে দেয়।

৩. পোকা খাদক পাখিগুলো হল -

i. দোয়েল, পেঁচা

ii. শালিক, ময়না

iii. ফিঙে, ইগল।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪. পাখি বসার জন্য জমিতে ডাল পুতে দেওয়া পোকা দমনের কোন পদ্ধতি?

ক. আধুনিক চাষাবাদে দমন পদ্ধতি খ. যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি

গ. জৈবিক দমন পদ্ধতি ঘ. সমন্বিত দমন পদ্ধতি

৫. ইঁদুর বছরে গড়ে ১৫% ফসলের ক্ষতি করে থাকে। অপরদিকে পোকামাকড় প্রায় ১০% ফসলের ক্ষতি করে। আমাদের খাদ্য উৎপাদন প্রায় ২ কোটি টন। ইঁদুর পোকা মাকড়ের চেয়ে কত লক্ষ টন বেশি খাদ্য শস্য নষ্ট করে।

ক. ১০ লক্ষ টন খ. ১৫ লক্ষ টন

গ. ২০ লক্ষ টন ঘ. ২৫ লক্ষ টন

সৃজনশীল প্রশ্ন

রসুলপুর গ্রামের কৃষকগণ টেলিভিশনে প্রচারিত 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি দেখেছেন। রবি মৌসুমে তারা লক্ষ করলেন তাদের শস্য খেতে বিভিন্ন রকম পোকা মাকড় ও ইঁদুরের উপদ্রব অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। তাঁরা আরো লক্ষ করলেন যে কোনো কোনো পোকা অন্যান্য পোকা খেয়ে ফেলছে। তারা পোকার উপদ্রব পরিমাপ করার জন্য ১ বর্গমিটার ধান খেতে পোকার মথ ও ডিম্বের গাদা গুণে দেখলেন যে এটুকু স্থানে ৪টি মথ ও ৩টি ডিমের গাদা আছে।

ক. সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা কী?

খ. কোনো কোনো পোকা অন্যান্য পোকা খেয়ে ফেলছে? কেন?

গ. কীভাবে রসুলপুর গ্রামে রবি মৌসুমে ধান রক্ষণ করা যাবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইঁদুর দমনে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফসল চাষ

ধান চাষ

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের খাদ্য ভাত। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ধানের অনেক উন্নত জাত এবং চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এখন দেশের অনেক এলাকায় উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের ধান চাষ করা হচ্ছে। উফশী জাতের ধানের উৎপাদন স্থানীয় জাতের চেয়ে অনেক বেশি হয়। উফশী জাতের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১. উফশী জাতের ধান গাছের পাতা পুরু, খাটো ও খাড়া থাকে বলে রোদ বেশি পায়, পাতা ঘন সবুজ থাকে।
২. গাছ খাটো ও শক্ত হওয়ার কারণে হেলে পড়ে না।
৩. গাছ অধিক পরিমাণে পুষ্টি শোষণ করতে পারে। তাই ফলন বেশি হয়।
৪. ধান পাকার সময়ও পাতা সবুজ থাকে বলে ধান গাছে পুষ্টির অভাব হয় না।
৫. তুলনামূলকভাবে খড়ের চেয়ে ধানের উৎপাদন বেশি হয়।
৬. উফশী ধানে পোকা ও রোগের আক্রমণ কম হয়।
৭. এই ধান জাত বিশেষে বছরের যে কোনো সময় জন্মানো যায়।
৮. কুশির সংখ্যা বেশি হয়।

জমি নির্বাচন

ধান পলি, দোঁআশ ও এঁটেল মাটিতে ভালো জন্মে।

জাত

নিচে বাংলাদেশে মৌসুম ভিত্তিক উফশী জাতের নাম উল্লেখ করা হল।
বোনা আউশ : নিজামী ও নিয়ামত।
রোপা আউশ : মালা, চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী, ব্রিবালাম, বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, শাহীবালাম ও মোহিনী।
রোপা আমন : ব্রিশাইল, প্রগতি, মুক্তা, বিপ্লব, কিরণ, দিশারী, দুলাভোগ।
বোরো : চান্দিনা, গাজী, বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহীবালাম, হাসি, শাহাজালাল ও মঙ্গাল।

বীজের পরিমাণ

কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ বীজ গজায় এরূপ পরিষ্কার ও পুষ্ট বীজ বীজতলায় বুনতে হবে। এক শতক জায়গায় (৪০ বর্গমিটার) বীজতলার জন্য ২-৩ কেজি পরিমাণ বীজ দরকার।

বীজ শোধন

ধানের বীজের সাথে নানা প্রকার রোগ জীবাণু থাকতে পারে যা পরবর্তীকালে ধানের জমিতে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। এজন্য ধানকে রোগজীবাণুমুক্ত করে বীজতলায় বপন করা উচিত। কোনো রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে ধানের বীজকে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতিকে বীজশোধন বলে।
নিচে বীজ শোধনের কয়েকটি সহজ পদ্ধতি দেওয়া হল

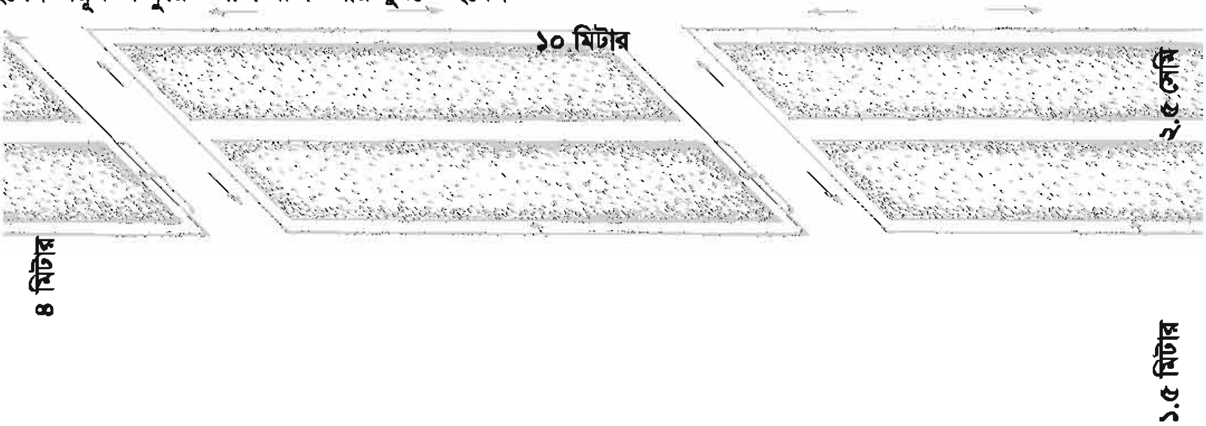
১. ধানের চারা তৈরি করার জন্য সুস্থ ও সবল বীজ ব্যবহার করতে হবে।
২. ৩০ গ্রাম এগ্রোসান জিএন বা ২০ গ্রাম এগ্রোসান এম ওষুধ দিয়ে প্রতি কেজি বীজ শোধন করা যায়। শুকনো অবস্থায় বীজের গায়ে ভালোভাবে মিশিয়ে ২৪ ঘণ্টা রাখতে হবে।

বীজতলা তৈরি

বাংলাদেশে দুই ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়

১. শুকনো বীজতলা ২. ভেজা বীজতলা।

এক শতক জমিতে দুই খণ্ডের বীজতলা তৈরি করা যায়। প্রতিটি বীজতলার আকার ১০ মিটার × ৪ মিটার জায়গার মধ্যে নালা বাদ দিয়ে ৯.৫ মিটার × ১.৫ মিটার হবে। বীজতলার চারদিকে ২৫ সেমি জায়গা বাদ দিতে হবে এবং দুই খণ্ডের মাঝখানে ৫০ সে.মি. জায়গা নালার জন্য রাখতে হবে। বীজতলায় বীজ বোনার আগে বীজ জাগ দিতে হবে। বিভিন্ন জাতের ধানের অঙ্কুর বের হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়কাল দরকার। আউশের জন্য ২৪ ঘণ্টা, আমনের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এক শতক বীজতলার জন্য ৩ কেজি পরিমাণ বীজ উল্লিখিত নিয়মে জাগ দিয়ে অঙ্কুরিত করতে হবে। এরূপ অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় বুনতে হবে।



২.৫ সেমি

এক শতক জমিতে ধানের বীজতলার নকশা

বীজতলার যত্ন

বীজতলার নালাতে সবসময় পানি রেখে সেচের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আগাছা দেখা দিলে সাথে সাথে তুলে ফেলতে হবে। পোকামাকড় ও রোগ বালাইর প্রাদুর্ভাব হলে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। চারা যদি হলদে হয়ে যায় তবে ২ সপ্তাহ পর ৪১০ গ্রাম ইউরিয়া বীজতলায় ছিটাতে হবে।

চারা উঠানো

চারার বয়স এক মাস হলে রোপণের উপযুক্ত হয়। চারা উঠানোর পূর্বে বীজতলায় প্রচুর পানি দিতে হবে। এরপর যত্ন সহকারে চারা উঠাতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। চারাগুলো তুলে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে রাখতে হবে ও সংরক্ষণ করতে হবে।

জমি তৈরি

ধানের জমি উত্তমরূপে কাদা করে তৈরি করতে হয়। জমিতে পানি রেখে ৪-৫ বার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিলে জমি কাদা হয়ে যায়।

সার প্রয়োগ

উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতে অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি হেক্টরে ও প্রতি শতকে নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

জাত ভেদে বিভিন্ন সারের পরিমাণ গ্রাম/শতক ৪০ বর্গমিটার

ধানের জাত	**বিভিন্ন সারের**	**পরিমাণ গ্রাম/শতক (৪০ বর্গমিটার)**			
	ইউরিয়া	**টিএসপি**	**এমপি**	**জিপসাম**	
রোপা আউশ নিজামী ও নিয়ামত	৫০০	৩০০	১৬০	২৪০	৪০
রোপা আউশ	৫৪০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০
বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহীবালাম	৬০০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০
রোপা আমন ব্রিশাইল, প্রগতি, মুক্তা, বিপ্লব	৬০০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০
কিরণ, দিশারী, (নাবী)	৩৬০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০
বোরো	৭২০	৪০০	২০০	২৪০	৪০
বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহীবালাম	৮৪০	৫০০	২৮০	২৮০	৪০
হাসি, শাহজালাল, মঙ্গল (হাওর এলাকার জন্য)	৫৪০	৩৬০	১৬০	২৪০	৪০

সারের উল্লিখিত মাত্রাসমূহকে গড় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। চার্টে গোবর বা জৈব সারের উল্লেখ নেই। শতক প্রতি ২০ কেজি পচা গোবর সার বা কমপোস্ট দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। শেষ চাষের সময় ইউরিয়া ব্যতীত উল্লিখিত সকল সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ হিসেবে ৩ কিস্তিতে দেওয়া ভালো। প্রথম কিস্তিতে চারা লাগানোর দুই সপ্তাহ পর অর্ধেক ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট সারকে দুই ভাগ করে ৪৫ দিন পর এক ভাগ এবং থোড় আসার সময় আর এক ভাগ প্রয়োগ করতে হবে। এতে সারের অপচয় হবে না। গাছও প্রয়োজনমতো নাইট্রোজেন পেতে পারে।

সার প্রয়োগের সাধারণ নীতি

১. লাল বেলে মাটি ও পাহাড়ের পাদভূমির মাটিতে (পিগমেন্ট) এমপি সারের মাত্রা দেড়গুণ দিতে হবে।
২. গঙ্গাবাহিত পললভূমি ও সেচ প্রকল্প এলাকায় দস্তা সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।
৩. হাওর এলাকার জমি উর্বর হলে সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।
৪. দেশি জাতের বেলায় উপরি-উক্ত সার অর্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
৫. হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন শুকনো পচা জৈব সার বা কমপোস্ট ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া যায়। জৈব সার প্রথম চাষের সময়ই জমিতে দিতে হবে।
৬. বেলে বুনটের মাটিতে এমপি সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।
৭. আগের ফসলে টিএসপি, এমপি, জিপসাম অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে পরবর্তী ফসলের জন্য উল্লিখিত সারগুলো অনুমোদিত মাত্রার অর্ধেক হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
৮. জিংক সালফেট যে কোনো একটি ফসলে প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে পরবর্তী দুটি ফসলে প্রয়োগ না করলেও চলবে।
৯. ফসলচক্রের প্রথমে খরিপ মৌসুমে যে জমিতে সবুজ সারের চাষ করা হয়েছে সে জমিতে পরের ফসলে ইউরিয়ার পরিমাণ অর্ধেক দিলে চলবে।

চারা রোপণ

জমিতে এক মাস বয়সের চারা রোপণ করা উচিত। বীজতলা হতে চারা তুলে দেরি না করে রোপণ করা উচিত। জমিতে ছিপছিপে পানি রেখে দড়ির সাহায্যে লাইন করে চারা রোপণ করতে হবে। এক লাইন হতে অন্য লাইনের দূরত্ব ২৫ সেমি এবং এক গোছা থেকে অন্য গোছার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি হওয়া দরকার। প্রতি গোছায় ৩টি চারা রোপণ করতে হবে।

সেচ ও পরিচর্যা

উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতে সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জমিতে ৫-৭ সেমির নিচে পানি থাকলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। চারার বয়স ৫০-৬০ দিন হলে ৭-১০ সেমি পানি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের পূর্বে জমির পানি সরিয়ে ফেলতে হবে। সার প্রয়োগের ২-৩ দিন পর আবার জমিতে সেচ দিতে হবে।

আগাছা দমন

চারা রোপণের ৩০-৫০ দিন পর্যন্ত খেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এই সময় ধান গাছের বাড়ন্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে আগাছা দমন করা উচিত।

পোকা দমন

ধানখেতে অনেক পোকার উপদ্রব হয়। এদের আক্রমণে ধানের ফলন অনেক কমে যায়। সময়মতো পোকা দমন করতে হবে। নিচে কয়েকটি পোকার পরিচিতি ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।

মাজরা পোকা

আক্রমণের লক্ষণ : মাজরা পোকা ধান গাছের মাঝ ডগা ও শীষের ক্ষতি করে। কুশি অবস্থায় আক্রমণ করলে মাঝ ডগা সাদা হয়ে যায়। আর ফুল আসার পর আক্রমণ করলে ধানের শীষে সাদা চিটা হয়। এই পোকার আক্রমণ সব ঋতুতেই কমবেশি দেখা যায়।


মাজরা পোকার মথ

দমন : নিম্নলিখিতভাবে মাজরা পোকা দমন করা যায়।

যান্ত্রিক দমন

১. মাজরা পোকা দমনের জন্য পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের ধান চাষ করতে হবে। চান্দিনা এবং ব্রিশাইলে এই পোকার আক্রমণ কম।
২. আলোর ফাঁদ পেতে পূর্ণ বয়স্ক মথ দমন করা যায়।
৩. ডিমের গাদা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা যায়।

জৈবিক দমন

ধানখেতে গাছের ডাল পুঁতে পোকাখাদক পাখি বসার সুযোগ করে দিলে পোকা দমন হয়।

রাসায়নিক দমন

পোকার আক্রমণ হলে কৃষি কর্মীদের পরামর্শ নিয়ে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

গল মাছি

আক্রমণের লক্ষণ : গল মাছির কীড়া গাছের মাঝ পাতায় পেঁয়াজের পাতার মতো গোলাকার গল তৈরি করে।
দমন : মাজরা পোকার অনুরূপ।

পামরি পোকা

আক্রমণের লক্ষণ : পূর্ণ বয়স্ক পামরি পোকা ধান গাছের পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতায় সাদা দাগ তৈরি করে। এর কীটগুলো পাতার ভেতরে জন্ম নিয়েই সবুজ অংশ খাওয়া শুরু করে।

দমন : নিম্নলিখিতভাবে পামরিপোকা দমন করা যায়।

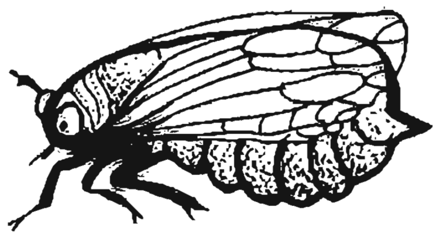
যান্ত্রিক দমন

১. ধান গাছের পাতার আগা কেটে ফেলা।
২. হাতজাল বা মশারির কাপড় দিয়ে পোকা ধরে মারা।
৩. আলোর ফাঁদ পেতে পোকা ধ্বংস করা।

রাসায়নিক দমন : মাজরা পোকার অনুরূপ।

বাদামি গাছ ফড়িং

আক্রমণের লক্ষণ : এই পোকা ধানগাছের কান্ডের রস চুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে ধানখেতে বাজপড়া লক্ষণ দেখা যায়।



বাদামি গাছ ফড়িং

দমন : নিম্নলিখিতভাবে বাদামি গাছ ফড়িং দমন করা যায়

ক. যান্ত্রিক দমন
খ. আলোর ফাঁদ পেতে দমন
গ. জৈবিক দমন
ঘ. রাসায়নিক দমন

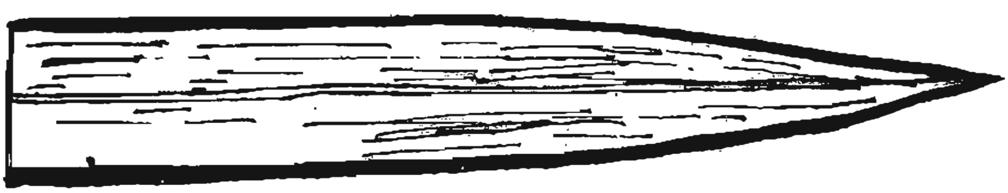
এছাড়া পরভোজী পোকা, ব্যাঙ ইত্যাদি ব্যবহার করে ও পাখি বসার ব্যবস্থা করে পোকা দমন করা যায়।

ধানের রোগ : ধান গাছের অনেক রোগ হয়। ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণু রোগের কারণ। নিচে কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের বিবরণ দেওয়া হল।

ব্লাস্ট রোগ : এটি ছত্রাকজনিত রোগ। ধান গাছের জীবনচক্রে যে কোনো সময় এই রোগ দেখা দিতে পারে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পাতায় ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। দাগের চারদিকে গাঢ় বাদামি এবং মাঝের অংশ সাদা ছাই বর্ণের হয়।



ধানের ব্লাস্ট রোগ



ধানের লালচে রেখা রোগ

দমন পদ্ধতি

১. নীরোগ বীজ ব্যবহার করা।
২. উপরি প্রয়োগ হিসেবে পটাশ জাতীয় সার ব্যবহার করা।
৩. বীজ শোধন করে বীজ বোনা।

টুংরো রোগ

এটি ভাইরাসজনিত রোগ। চারা রোপণের এক মাসের মধ্যে টুংরো রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণের প্রথমে পাতার রং হালকা সবুজ হয়। পরে সমস্ত পাতা হলুদ হয়ে যায়। গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে।

দমন পদ্ধতি

১. পাতা ফড়িং এ রোগ ছড়ায়। তাই পাতা ফড়িং দমন করতে হবে।

২. রোগ প্রতিরোধমূলক বীজ যেমন-চান্দিনা, দুলাভোগ, ব্রিশাইল ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

পাতার লালচে রেখা রোগ

এটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এই রোগ ধান বাড়ার সময় আক্রমণ করতে পারে। আক্রমণের প্রথমে পাতার গোড়ার দিকে হলুদ ও সরু দাগ হয়। ঐ দাগগুলো পরে লালচে রং ধারণ করে। লালচে রেখা রোগ ধানের ফলন অনেক কমিয়ে দেয়।

দমন পদ্ধতি

১. প্রথম অবস্থায় হেক্টর প্রতি ২.৫-৩.০ কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড ওষুধ ১৫০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ধানের খেতে স্প্রে করতে হবে।

২. ধানগাছ বড় হলে এই রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

ফসল কর্তন ও সংরক্ষণ

ধানগাছের পাতা শুকাতে শুরু করলে ধানের শীষ সোনালি রং ধারণ করে। শীষ সোনালি রং হলেই ধান কাটতে হবে। আমাদের দেশে কাঁচি দিয়ে ধান কাটা হয়। ধান কেটে ছোট ছোট আঁটি বাঁধা হয়। সমস্ত ধান কাটা হলে বাড়িতে মাড়াই করার স্থানে জমা করা হয়। ধান মাড়াই করার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা নিতে হবে। ধান লাঠির সাহায্যে, গরু দিয়ে বা আছড়িয়ে মাড়াই করা যায়।

মাড়াই করার পর পরিষ্কার করে ঝাড়তে হবে। এরপর ৩/৪ বার রোদে শুকিয়ে ছায়ায় ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলন

আউশের চেয়ে আমনের, আবার আমনের চেয়ে বোরোর ফলন বেশি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় জাতের তুলনায় উফশী জাতের ফলন বেশি হয়ে থাকে। উফশী জাতের ধানের হেক্টর প্রতি ফলন ৫-৬ টন। এবং শতক (৪০ বর্গমিটার) প্রতি ২০-২৪ কেজি।

পাটের চাষ

পাট একটি আঁশ জাতীয় ফসল। বিদেশে পাট রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। তাই পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়। বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদনদীর পলিবাহিত উর্বর সমতল, ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, ফরমোজা, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, বার্মা, মিশর, প্যারাগুয়ে এবং ব্রাজিলেও পাট জন্মে।

পাটের ওপর ভিত্তি করে এদেশের পাট শিল্প গড়ে উঠেছে। পাট শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টেকাতে হলে উন্নত প্রথায় পাট চাষ করে অধিক ফলন পেতে হবে।

জমি নির্বাচন

পালাক্রমে রোদ এবং বৃষ্টি তৎসঙ্গে আর্দ্র আবহাওয়া পাট চাষের উপযোগী। নদীবাহিত গভীর পলিমাটিতে পাট ভালো জন্মে। তবে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতেও পাট জন্মে।

পাটের জাত : বাংলাদেশে দুই ধরনের পাট উৎপন্ন হয়–

১. দেশি বা সাদা পাট
২. তোষা পাট।

দেশি পাট : দেশি পাটের পাতা স্বাদে তিতা এবং উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম। সিভিই-৩, সিভিএল-১, সিসি-৪৫ ইত্যাদি দেশি পাটের জাত।

তোষা পাট : তোষা পাট উচ্চতায় খুব লম্বা হয়ে থাকে। এই জাতের পাট পানি সহ্য করতে পারে না। চিনসুরা, গ্রিন এবং ও-৪ তোষা পাটের উন্নত জাত।

বপন সময়

সঠিক সময়ে পাটের বীজ না বুনলে গাছে অসময়ে ফুল আসে এবং ফলন কম হয়। পাটের গুণগত মানও কমে যায়। পাট জাত ভেদে ১৫ই ফেব্রুয়ারি হতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা হয়।

জমি তৈরি

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দুই এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পাটের জমি চাষ করতে হয়। পর পর ৪/৫টি আড়াআড়ি চাষ এবং ২/৩ বার মই দিয়ে পাটের জমি তৈরি করতে হয়।

সার প্রয়োগ

নিয়মিতভাবে প্রতি বছর পলি পড়ে এমন জমিতে সার প্রয়োগের তেমন দরকার হয় না। অন্যান্য জমিতে নিম্নে বর্ণিত পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ গ্রাম/শতক (৪০ বর্গমিটার)
ইউরিয়া	৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৪০ গ্রাম
এমপি	৮০ গ্রাম

সবটুকু টিএসপি এবং এমপি সার শেষ চাষে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারের অর্ধেক শেষ চাষে এবং বাকি অর্ধেক বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পরে জমিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বীজের পরিমাণ

পাটের জাত	বীজের পরিমাণ/শতক (৪০ বর্গমিটার)	
	সারিতে	ছিটিয়ে
দেশি বা সাদা পাট	২.৬ গ্রাম	৩.৬ গ্রাম
তোষা পাট	১.৬ গ্রাম	২.৮ গ্রাম

বপন পদ্ধতি

ভালো গুণসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে। মাঘ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

পাট সারিতে ও ছিটিয়ে এই দুই উপায়ে বোনা যায়। সারিতে বীজ বুনলে বীজের পরিমাণ কম লাগে, আগাছা পরিষ্কার সহজতর হয় এবং প্রত্যেকটি গাছ সমানভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং সারিতে এক গাছ হতে আরেক গাছের দূরত্ব ৫-৭ সেমি হতে হবে। বীজ যেন মাটির খুব গভীরে বোনা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জমিতে জো আসলে বীজ বুনতে হবে।

ফসলের পরিচর্যা

পাটের জমিতে নিম্নলিখিত পরিচর্যার প্রয়োজন।

সেচ

খরায় পাটের ক্ষতি হয়। সেচের সুবিধা থাকলে এবং প্রয়োজন হলে অবশ্যই পাটের জমিতে সেচ দিতে হবে। জমিতে যাতে পানি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। সেচের পর মাটি শক্ত হওয়ার আগেই মাটি আলগা করে দিতে হবে।

আগাছা দমন

আগাছা পাটের মারাত্মক ক্ষতি করে। চারার বয়স ২০-৩০ দিন হলে একবার এবং ৪০-৪৫ দিন হলে আর একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। চারার বয়স ১০-১৫ দিন হলে আঁচড়া দিয়ে আগাছা দমন করা যায়। প্রয়োজন বোধে নিড়ানি দুবারের অধিক দিতে হয়।

চারা পাতলাকরণ

পাটের চারা খুব ঘন হলে ফলন কম হয়। তাই নিড়ানির সময় চারা কিছুটা পাতলা করতে হবে। আবার চারা বেশি পাতলা হলে পাট গাছে শাখা প্রশাখা হয় এবং ছাল শক্ত হয়। এতে পাটের গুণগত মান কমে যায়।

পোকা দমন

পাট খেতে নানা রকম পোকার উপদ্রব হয়। নিচে কয়েকটি পোকার নাম, ক্ষতির লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হল :

বিছাপোকা

কচি ও বয়স্ক পাটের সকল পাতাই খেয়ে ফেলে।

দমন পদ্ধতি : বিছাপোকার মথ পাটের পাতার নিচের দিকে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে যে কীট বের হয় তাই হচ্ছে বিছাপোকা। কীটগুলো পাতায় দলবদ্ধ হয়ে থাকে। কীটসহ পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা যায়।



পাটের বিছা পোকা

উরচুঙ্গা

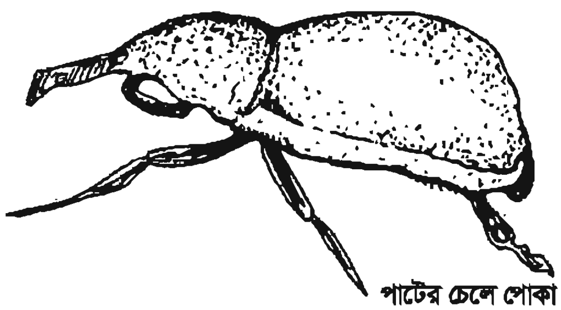
উরচুঙ্গা জমিতে গর্ত করে থাকে ও চারার গোড়া কেটে দেয়।

দমন পদ্ধতি

১. প্লাবন সেচ দেওয়া।
২. বেশি বীজ বপন করা।

চেলে পোকা

চেলে পোকা পাটের কাণ্ড ছিদ্র করে।



পাটের চেলে পোকা

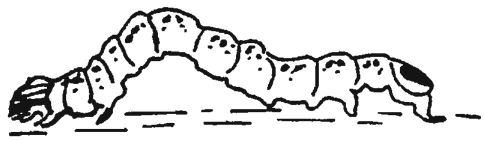
দমন পদ্ধতি

আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। শুরুতেই আক্রান্ত গাছগুলো তুলে ফেলতে হবে।

ঘোড়া পোকা

গাছের ডগার কচি পাতা খেয়ে ফেলে।

দমন ব্যবস্থা : কেরোসিন ভেজানো দড়ি দিয়ে গাছের উপরে টেনে দিলে আক্রমণ কিছুটা কম হয়। তাছাড়া পাখি বসার ব্যবস্থা করেও পোকা দমন করা যায়।



পাটের ঘোড়া পোকা

সাদা ও লাল মাকড়

এদের আক্রমণে গাছের আগার পাতা কুঁচকে যায়।

দমন পদ্ধতি : প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে প্রকৃতিগতভাবেই এদের আক্রমণ কমে যায়।

পাটের রোগ

পাটে কাণ্ড পচা, কালোপট্টি, পাতায় হলদে দাগ এসব রোগ দেখা যায়। এসব রোগ হলে আঁশের গুণগত মান কমে যায় এবং ফলনও কম হয়।

পাট কাটা

সঠিক সময়ে পাট না কাটলে পাটের গুণ ও ফলন উভয়ই কমে যায়। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দেশি পাট এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে তোষা পাট কাটতে হয়। গাছে ফুল আসলে বুঝতে হবে পাট কাটার সময় হয়েছে। শতকরা পঞ্চাশভাগ গাছে ফুল আসলে পাট কাটার উত্তম সময় বলে বিবেচিত।

পাট জাগ দেওয়া

পাট কেটে আঁটি বাঁধা হয়। পাট কাটার পর মাঠে ৩/৪ দিন রেখে দিলে পাতা ঝরে যায় এবং তা জলাশয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে ১০-১৫টি আঁটি একদিকে গোড়া রেখে সাজাতে হবে। তারপর উল্টো দিকে গোড়া রেখে আরো আঁটি সাজাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাগের উপর ৩০ সেমি ও নিচে ৬০ সেমি পানি থাকে। প্রতি ১০০ আঁটির উপরে ১ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিলে পাট তাড়াতাড়ি পচে ও পাটের আঁশের রং ভালো হয়।

আঁশ ছাড়ানো

পাট হতে সহজে আঁশ ছাড়ানো গেলে এবং অল্প আয়াসে ময়লা পরিষ্কার করা গেলে পাট ছাড়ানোর সময় হয়েছে বুঝতে হবে। গরম আবহাওয়ায় ১২-১৪ দিন এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় ২০/২৫ দিনের মধ্যেই পাট পচে।

আঁশ ধোয়া ও শুকানো

আঁশ ছাড়ানোর পর পরিষ্কার পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে ফেললে আঁশের গুণগত মান ভালো হয়। পরিষ্কার করার পর বাঁশের আড়ায় কয়েকদিন রোদে ভালোভাবে শুকাতে হয়। ভেজা পাট সংরক্ষণ করলে আঁশ নরম ও অনুজ্জ্বল হয়।

ফলন

উন্নত পদ্ধতিতে পাটের চাষ করলে প্রতি শতকে ৮০-৯০ কেজি আঁশ পাওয়া যায়।

আলুর চাষ

আলু বাংলাদেশের প্রধান সবজি। বিকল্প খাদ্য হিসেবে এর চাহিদা দিনদিন বাড়ছে। আলুতে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ ও পুষ্টি রয়েছে। অর্থকরী ফসল হিসেবেও আলু বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় আলুর চাষ হয়।

জমি নির্বাচন

আলু চাষের জন্য বায়ু চলাচল সম্পন্ন, পানিসেচ নিকাশের সুবিধাসহ দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটির জমি নির্বাচন করতে হবে। এঁটেল মাটিতে আলু ভালো হয় না।

আলুর জাত

আলুর অনেক জাত আছে। যথা-

দেশি জাত : লাল পাকড়ি, শিল বিলাতি, চল্লিশা, নৈনিতাল ইত্যাদি।

*** উন্নত আলুর জাত :**

বারি আলু - ১ (হীরা)

বারি আলু - ৪ (আইলসা)

বারি আলু - ৭ (ডায়মন্ড)

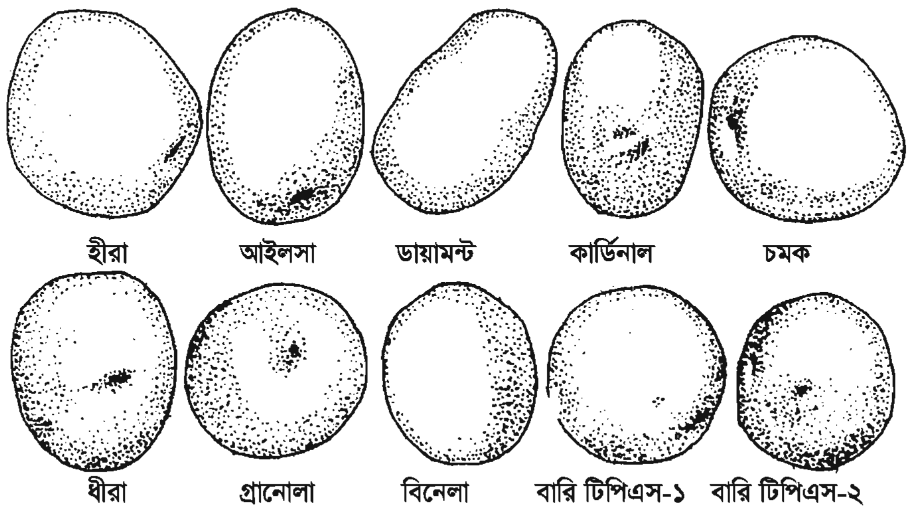
বারি আলু - ৮ (কার্ডিনাল)

বারি আলু - ১১ (চমক)

বারি আলু - ১২ (ধীরা)

বারি আলু - ১৩ (গ্রানোলা)

বারি আলু - ১৫ (বিনেলা)



প্রকৃত আলুর বীজ

বারি টি পিএস - ১

বারি টি পিএস - ২

এছাড়া বারি টি পিএস - ১ ও বারি টি পিএস - ২ এর নাম প্রকৃত আলুর বীজ। পূর্বে আলুর বীজ থেকে আলু উৎপাদন করা হত কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত বীজ থেকে আলুর উৎপাদন করার ফলে, আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

বোপনের সময়

আলু শীতকালীন ফসল। মধ্য আশ্বিন হতে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বাংলাদেশে আলুর বীজ লাগানোর উপযুক্ত সময়। আগাম ফসল পাওয়ার জন্য ভাদ্র মাসেও আলুর বীজ লাগানো হয়।তবে এক্ষেত্রে বেশি বৃষ্টিপাতে আগাম ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

জমি তৈরি

আলুর জন্য নরম ও ঝুরঝুরে মাটি আবশ্যক। আলুর জমিতে ঢেলা থাকা উচিত নয়। মই ও মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে ফেলা উচিত। জমি ৪-৫ বার গভীরভাবে চাষ করতে হবে। যতটুকু সম্ভব জমি সমতল হওয়া উচিত। জমি ৪-৫ বার গভীরভাবে চাষ করতে হবে। যতটুকু সম্ভব জমি সমতল হওয়া উচিত।

* উৎস : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জয়দেবপুর, গাজীপুর।

সার প্রয়োগ

আলু চাষে (প্রতি হেক্টরে) নিচে উল্লিখিত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২২০-২৫০ কেজি
টিএসপি	১২০-১৫০ কেজি
এমপি	২২০-২৫০ কেজি
জিপসাম	১০০-১২০ কেজি
জিংক সালফেট	৮-১০ কেজি
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (অম্লীয় বেলে মাটির জন্য)	৮০-১০০ কেজি
বোরন (বেলে মাটির জন্য)	৮-১০ কেজি
গোবর	৮-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

গোবর, অর্ধেক ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট (প্রয়োজনবোধে) রোপণের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয় বার মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে। অম্লীয় বেলে মাটির জন্য ৮০-১০০ কেজি/হেক্টর ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং বেলে মাটির জন্য রোবন ৮ – ১০ কেজি/হেক্টর প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বীজ নির্বাচন ও বীজের পরিমাণ

আস্ত আলু বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা আলুর চোখ কেটেও বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে আস্ত আলু বীজই অধিক নির্ভরযোগ্য। কর্তিত আলুবীজ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আস্ত বীজ কর্তিত বীজ অপেক্ষা অধিক ফলন দেয়।

বীজের আকার ও রোপণের দূরত্ব অনুসারে আলু বীজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। প্রতি হেক্টরে এক টন হতে দেড় টন বীজ লাগে।

রোপণ পদ্ধতি

আলুর বীজ সাধারণত সারিতে লাগানো হয়। সারি হতে সারির দূরত্ব কত হবে তা নির্ভর করে জমির উর্বরতার ওপর, সেচের সুবিধার ওপর এবং জাতের ওপর। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং সারিতে ২৫ সেমি. দূরে দূরে বীজ বুনতে হয়।

উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করার পর সারির প্রয়োজনীয় দূরত্বে লাঙল টেনে খেতের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত নালা কাটতে হয়। প্রত্যেকটি নালা ১০-১২ সেমি. গভীর হওয়া দরকার। প্রতি নালায় ২০ সেমি. দূরে বীজ বুনে মাটি চাপা দিয়ে নালা ভরে দিতে হবে। বীজ বোনার সময় মাটিতে রস কম থাকলে একটু বেশি গভীরে বুনতে হয়। কাটা আলুর রোপণ দূরত্ব হবে ৪৫ × ১৫ সেমি।

বীজ শোধন

বীজ রোপণের আগে অবশ্যই বীজ শোধন করা উচিত। উন্নতমানের প্রত্যায়িত বীজ শোধন করার প্রয়োজন পড়ে না। গৃহস্থের বীজ হলে রোপণের পূর্বে মারকিউরিক ক্লোরাইডের মিশ্রণে ১-২ ঘণ্টা ডুবিয়ে নিলে বীজ ত্বকের জীবাণু ধ্বংস হয়। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ওষুধ মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করতে হয়।

পরিচর্যা

পানি সেচ

বীজ আলু বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (স্টোলন বের হওয়ার সময়) প্রথম সেট দিতে হবে, দ্বিতীয় সেচ বীজ আলু ৪০-৪৫দিনের মধ্যে (শুটি বের হওয়া পর্যন্ত) এবং তৃতীয় সেচ আলুর বীজ বপনের ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে (শুটির বৃদ্ধি পায়) দিতে হবে। দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি ফলন পেতে হলে ৮-১০ দিন পর সেচ দিতে হবে।

নিড়ানি

গাছ প্রায় ১৫ সেমি বড় হলে দুই সারির মাঝখানে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বা নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হয়। তারপর সারির মধ্য হতে মাটি টেনে নিয়ে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। প্রতিবার সেচ দেওয়ার পর মাটি একটু শুকালে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

আলুর মড়ক বা নাবী ধ্বসা (লেইট ব্লাইট) রোগ দমন

ফাইটপথোরা ইনফেস্টেনস নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। প্রথমে পাতা, ডগা ও কাণ্ডে ছোট ভিজা দাগ পড়ে। ক্রমে দাগ বড় হয় ও সমগ্র পাতা, ডগা ও কাণ্ডের কিছু অংশ ঘিরে ফেলে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যেই জমির অধিকাংশ ফসল আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ভোরের দিকে আক্রান্ত পাতার নিচে সাদা পাউডারের মতো ছত্রাক চোখে পড়ে। আক্রান্ত খেতে পোড়া পোড়া গন্ধ পাওয়া যায় এবং মনে হয় যেন জমির ফসল পুড়ে গেছে।

প্রতিকার

১. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।
২. আক্রান্ত জমিতে সেচ যথাসম্ভব বন্ধ করে দিতে হবে।
৩. রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রিডোমিল (০.২%), ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) ইত্যাদি ছত্রাকনাশক অনুমোদিত হারে ১০-১২ দিনপর পর স্প্রে করতে হবে।

আলুর আগাম ধ্বসা বা আর্লিং ব্লাইট রোগ দমন

অলটারনারিয়া সোলানাই নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। নিচের পাতা ছোট ছোট বাদামি রঙের অল্প বসে যাওয়া কৌণিক দাগ পড়ে। আক্রান্ত অংশে সামান্য বাদামি এলাকার সাথে পর্যায়ক্রমে কালচে রঙের চক্রাকার দাগ পড়ে। পাতার বোঁটা ও কাণ্ডের দাগ অপেক্ষাকৃত লম্বা ধরনের হয়। গাছ হলদে হওয়া, পাতা ঝরে পড়া এবং অকালে গাছ মরে যাওয়া এ রোগের লক্ষণীয় উপসর্গ। আক্রান্ত টিউবারের গায়ে গাঢ় বাদামি থেকে কালচে বসে যাওয়া দাগ পড়ে।

প্রতিকার

১. সুষম সার প্রয়োগ এবং সময়মতো সেচ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
২. রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হবে। ডাইথেন এম ৪৫-০.২% হারে প্রয়োগ করা যায়।
৩. আগাম জাতের আলু চাষ করতে হবে।

কাণ্ড ও আলু পচা রোগ

স্কেলেরোসিয়াম রলফসি নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণের ফলে বাদামি দাগ কাণ্ডের গোড়া ছেয়ে ফেলে। গাছ ঢলে পড়ে এবং পাতা বিশেষ করে নিচের পাতা হলদে হয়ে যায়। আক্রান্ত অংশে বা আশপাশের মাটিতে ছত্রাকের সাদা সাদা জালিকা দেখা যায়। কিছু দিন পর সরিষার দানার মতো রোগ জীবাণুর গুটি বা স্কেলেরোসিয়া সৃষ্টি হয়। আলুর গা থেকে পানি বের হয় এবং পচন ধরে। ক্রমে আলু পচে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার

১. আক্রান্ত গাছ কিছুটা মাটিসহ সরিয়ে ফেলতে হবে।
২. জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।
৩. জমিতে সব সময় পচা জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

আলুর কাটুই পোকা

কাটুই পোকার কীড়া বেশ শক্তিশালী, ৪০-৫০ মি মি লম্বা। পোকার ওপর পিঠ কালচে বাদামি বর্ণের, পার্শ্বদেশ কালো রেখাযুক্ত এবং বর্ণ ধূসর সবুজ। শরীর নরম ও তৈলাক্ত। কাটুই পোকার কীড়া চারা গাছ কেটে দেয় এবং আলুতে ছিদ্র করে আলু ফসলের ক্ষতি করে থাকে।

পোকার কীড়া দিনের বেলা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে। আলুর কাটা গাছ অনেক সময় কাটা গোড়ার পাশেই পড়ে থাকতে দেখা যায়।

প্রতিকার

১. কাটুই পোকার উপদ্রব খুব বেশি না হলে কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা উচিত।
২. কাটুই পোকার উপদ্রব খুব বেশি হলে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরোপাইরফস (ডারসবান) ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটি স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে। আলু লাগানোর ৩০-৪০ দিন পর স্প্রে করতে হবে।

আলুর সুতলি পোকা

আলুর সুতলি পোকার মথ আকারে ছোট, ঝালরযুক্ত, সরু ডানা বিশিষ্ট ধূসর বাদামি হয়। পূর্ণাঙ্গ কীড়া সাদাটে বা হাল্কা গোলাপি বর্ণের এবং ১৫-২০ মি মি লম্বা হয়ে থাকে। কীড়া আলুর মধ্যে লম্বা সুড়ঙ্গ করে আলুর ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশে বসতবাড়িতে সংরক্ষিত আলু এ পোকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রতিকার

১. বাড়িতে সংরক্ষিত আলু শুকনো বালি, ছাই, তুষ অথবা কাঠের গুঁড়ার একটি পাতলা স্তর (আলুর উপরে ০.৫ সেমি) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
২. আলু সংরক্ষণ করার আগে সুতলি পোকা আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হবে।

ফসল তোলা

বীজ বপনের ৩-৪ মাসেন মধ্যেই আলু তোলার উপযুক্ত হয়। গাছের রং হলুদ হলে বুঝতে হবে আলু তোলার সময় হয়েছে। সম্পূর্ণ গাছ শুকালে আলু তোলা উচিত। আলু এমনভাবে তুলতে হবে যেন আলুর গায়ে আঘাত না লাগে। কাটা আলু তাড়াতাড়ি পচে যায়।

আলু সংরক্ষণ

আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান, তবুও আলু সংগ্রহের মৌসুমে প্রচুর পরিমাণ আলু স্থানীয়ভাবে বাড়িতে সংরক্ষণ করতে হয়। সে কারণে সংরক্ষণকালীন সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এতে আলু ৫ থেকে ৬ মাস ভালোভাবে ঘরে সংরক্ষণ করা যাবে এবং ৩ থেকে ৪ মাস পর বিক্রি করে লাভবান হওয়া যায়। আলু ঘরে সংরক্ষণ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

- মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে আলু উত্তোলন করা ঠিক হবে না। আলু সকালের দিকে উত্তোলন করতে হবে।
- আলু সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ব হলে তুলতে হবে। আলু উত্তোলনের ৭-১০ দিন আগে আলু গাছের গোড়া কেটে ফেলে 'হাল্ম কিলিং' করতে হবে।

- আলু তোলার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কোদাল বা লাঙলের আঘাতে আলু কেটে না যায়
- আলু তোলা শেষ হলে তা পরিবহণের জন্য চটের বস্তা ব্যবহার করাই ভালো
- সাধারণত বস্তায় আলু ভরার সময় প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা গামলা ব্যবহার করা উত্তম। যদি বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করতে হয় তা হলে ঝুড়ির মাঝখানে চট বা ছালা বিছিয়ে সেলাই করে নিতে হবে।
- আলু সংগ্রহ শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। যদি কোনো কারণে আলু খেতে রাখতে হয় তা হলে ছায়াযুক্ত জায়গায় বিছিয়ে পাতলা কাপড়/খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
- বাড়িতে এনে আলু পরিষ্কার, শুকনো ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। আলু ঢালার সময় সতর্ক থাকতে হবে। বেশি জোরে বেশি উঁচু থেকে আলু ঢালা যাবে না।
- আলু সংগ্রহ করা সম্পূর্ণরূপে শেষ হলে ১-৭ দিন পরিষ্কার ঠান্ডা জায়গায় আলু বিছিয়ে রেখে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে 'কিউরিং' করতে হবে। এতে করে আলুর গায়ের ক্ষত সেরে যাবে ও পোকার আক্রমণ থেকে সংগৃহীত আলু রক্ষা পাবে। এভাবে আলু রেখে দেওয়ার পদ্ধতিকে আলু কিউরিং বলে।
- আলু সংরক্ষণ করার আগে কাটা, সবুজ, রোগাক্রান্ত আলু বাছাই করতে হবে।

ফলন

আমাদের দেশে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি আলুর উৎপাদন ২৫-৩৫ টন হতে পারে।

সরিষার চাষ

সরিষা বাংলাদেশের প্রধান তৈল ফসল। সরিষার তেল গ্রামবাংলায় খুবই জনপ্রিয়। সরিষার বীজে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ তেল থাকে। সরিষার খৈলে শতকরা ৩৫ ভাগ প্রোটিন এবং ৬.৪ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এই খৈল গবুর জন্য যেমন পুষ্টিকর খাদ্য তেমনি মাটির জন্যও চমৎকার জৈব সার।

জমি নির্বাচন

সরিষা চাষের জন্য বেলে দোআঁশ অথবা পলি দোআঁশ মাটি উপযোগী। অতএব, সহজে পানি নিষ্কাশন করা যায় এরূপ বেলে বা পলি দোআঁশ মাটির জমি নির্বাচন করতে হবে।

জাত নির্বাচন

অনেক জাতের সরিষার চাষ হয়। নিচে অনুমোদিত জাতের তালিকা, জীবনকাল ও বপনের সময় উল্লেখ করা হল।

সরিষা জাতের বিবরণী

সরিষার জাত	জীবন কাল (দিন)	বপনের সময়
১। টরি-৭	৭০-৮০	কার্তিক মাস
২। কল্যাণীয়া (টিএস-৭২)	৭৫-৮৫	কার্তিক মাস
৩। সোনালি সরিষা (এসএস-৭৫)	৯০-১০০	কার্তিক মাস
৪। সম্পদ	৯০-১০০	কার্তিক মাস
৫। সম্বল	১০০-১১০	মধ্য কার্তিক-মধ্য অগ্রহায়ণ
৬। রাই সরিষা	৯০-১০০	মধ্য কার্তিক-মধ্য অগ্রহায়ণ
৭। দৌলত	৯০-১০০	মধ্য কার্তিক-মধ্য অগ্রহায়ণ

বপনের সময়

বাংলাদেশে সরিষা শীতকালীন ফসল। কাতির্ক মাসের প্রথম থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত এর চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

সরিষার জমি এমন ঝুরঝুরে করে চাষ করতে হবে যাতে সহজেই বীজ গজাতে পারে। নির্বাচিত জমি ৫/৬ বার চাষ ও মই দিয়ে জমিকে পরিপাটি করতে হবে। সরিষার জমির বড় বড় ঢেলা ভেঙে সমতল করতে হবে যাতে জমির কোথাও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয়। পানি নিষ্কাশনের জন্য নালার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

সার প্রয়োগ

সরিষার জমিতে নিম্নলিখিত সারগুলো প্রয়োগ করতে হবে। সরিষার জাত অনুযায়ী সার প্রয়োগ মাত্রা তালিকায় দেওয়া হয়েছে।

শেষ চাষ দেওয়ার আগে অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সবটুকু জমিতে ছিটিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সার ফুল আসার প্রাক্কালে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমাণ/শতক (৪০ বর্গমিটার)

সারের নাম	সরিষার জাত	
	সোনালি সরিষা, সম্পদ	টরি-৭, কল্যাণীয়া, সম্বল, দৌলত
গোবর	১৩০ কেজি	৮০ কেজি
ইউরিয়া	৮৮০ কেজি	৬০০ গ্রাম
টিএসপি	৫৬০ গ্রাম	৪৮০ গ্রাম
এমপি	৩২০ গ্রাম	২৪০ গ্রাম
জিপসাম	৬০০ গ্রাম	৮০ গ্রাম
জিংক সালফেট	২৪ গ্রাম	১৬ গ্রাম

উপরি প্রয়োগের সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন গাছের পাতা ভেজা অবস্থায় সার প্রয়োগ করা না হয়। এজন্য রোদ ওঠার পর গাছের পাতাগুলো শুকালে ১০-১১ টার দিকে সার প্রয়োগ ভালো। আগের ফসলে দস্তা সার প্রয়োগ হয়ে থাকলে সরিষার চাষে আর দস্তা সার প্রয়োগের দরকার নেই।

দিনাজপুর, রংপুর ও জামালপুর অঞ্চলে বোরন এর অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব এলাকায় শতক প্রতি ১৬-২৪ গ্রাম বরিক এসিড শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করতে হবে।

বীজের হার

বিভিন্ন জাতের সরিষার শতক (৪০ বর্গমিটার) প্রতি বীজের হার নিচে দেওয়া হল।

সরিষার বীজের হার

জাতের নাম	বীজের হার/শতক (৪০ বর্গমিটার)
টরি-৭ ও কল্যাণীয়া	৩২ গ্রাম
সোনালি সরিষা ও সম্পদ	৩৬ গ্রাম
রাই সরিষা, সম্বল ও দৌলত	২৮ গ্রাম

বপন পদ্ধতি

সাধারণত সরিষা ছিটিয়ে বপন করা হয়। শেষ চাষের সময়ে বীজ বপন করে মই দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। সারিতেও সরিষা বপন করা হয়। এক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইন ২৫-৩০ সেমি ও বীজ থেকে বীজ ৪-৫ সেমি দূরত্বে এবং ২-৪ সেমি গভীরতায় বীজ বপন করা হয়। মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যে চারা গজাবে।

পরিচর্যা

নিম্নলিখিতভাবে সরিষার পরিচর্যা করা হয়।

পানি সেচ

সরিষার জমিতে মাটির আর্দ্রতা পর্যাপ্ত হলে সেচের প্রয়োজন হয় না। মাটির আর্দ্রতা বুঝে ২/৩টি সেচ দিলে ফলন বেশ ভালো হয়। প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় সেচ গাছে ফল হওয়ার সময় দিলে ভালো হয়। বপনের পূর্বে যদি মাটি শুষ্ক থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। সরিষা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই সেচের পানি ৫৬ ঘণ্টার বেশি জমিতে জমে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

গাছ পাতলাকরণ

চারা খুব ঘন হলে পাতলা করে দিতে হবে। জমির কোথাও একদম চারা না গজালে প্রয়োজনে সেখানে বীজ আবার বপন করতে হবে। পাতলাকরণের কাজটি চারা গজাবার ১০-১৫ দিনের মধ্যে করতে হবে।

আগাছা দমন

সরিষার জমিতে আগাছা দেখামাত্র নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। চারা পাতলা করার সময়ই আগাছা দমন করা যায়।

রোগ দমন

সরিষা প্রায়ই অল্টারনারিয়া নামক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হলে পাতায় কালো দাগ পড়ে। এই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রতি কিলোগ্রাম বীজ ২.৫ গ্রাম ক্যাপ্টান নামক ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করতে হবে। অথবা জমিতে ডায়াথন এম-৪৫ ছত্রাকনাশক ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ছিটাতে হবে।

পোকা দমন

জাব পোকা সরিষার প্রধান ক্ষতিকর পোকা। গাছের সকল অংশই এই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। সাধারণত গাছে ফুল আসার সময় এই পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটে।

জাব পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি, প্রতি লিটার পানিতে ২ সিসি হারে মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে সরিষার খেতে ছিটাতে হবে। উপকারী পোকা মৌমাছিকে বাঁচানোর জন্য বিকাল বেলা ওষুধ ছিটানো ভালো।

পরগাছা দমন

অরোবাংকি নামক একটি পরগাছা সরিষা গাছের শিকড়ে জন্মে। সরিষা খেতে অরোবাংকি দেখা গেলে সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

খেতের শতকরা ৮০ ভাগ সরিষার ফল যখন খড়ের রং ধারণ করে এবং গাছের পাতা হলদে হয় তখনই ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। সকালে ঠান্ডা আবহাওয়ায় শিশিরভেজা অবস্থায় ফসল সংগ্রহ করা উত্তম।

মূলসহ গাছ টেনে তুলে অথবা কাঁচির দ্বারা কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। তবে টেনে তোলাই ভালো।

ফসল মাড়াই

ফসল সংগ্রহের পর ৩/৪ দিন রোদে শুকিয়ে মাড়াই করতে হবে। মাড়াই করার পর বীজগুলোকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে ৩/৪ দিন রোদে শুকাতে হবে। কিছু কিছু অপুষ্ট বীজ থাকতে পারে। অপুষ্ট বীজগুলোকে আলাদা করতে হবে।

ফলন

প্রতি শতকে (৪০ বর্গমিটার টরি ৭-৭ কেজি, কল্যাণীয়া-৭ কেজি, রাই-৪ কেজি, সোনালি সরিষা-৯ কেজি, দৌলত-৬ কেজি উৎপন্ন হয়।

সংরক্ষণ

পরিষ্কার শুকনো পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করলে ১-২ বছর রাখা যায়।

মসুর ডালের চাষ

মসুর ডাল উদ্ভিজ আমিষ লাভের প্রধান উৎস। ডালভাত কথার মধ্যেই খাদ্য হিসেবে মসুর ডালের গুরুত্ব বোঝা যায়। এই ডালকে গরিবের মাংসও বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে মসুর ডালের চাষ হয়ে আসছে। রাজশাহী, যশোর, পাবনা, ফরিদপুরে এই ডালের চাষ বেশি হয়।

জমি নির্বাচন

মসুর ডাল কিছুটা খরা সহিষ্ণু ফসল। বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় এর ফলন ভালো হয়।

পানি দাঁড়ায় না এমন দোআঁশ মাটি মসুর চাষের জন্য উপযোগী।

জাত

উৎফলা (এল-৫), মুকদিয়া-১৫, জামালপুর-২, মসুর ডালের প্রধান প্রধান অনুমোদিত জাত।

চাষের সময়

কার্তিক মাস মসুর চাষ করার উপযুক্ত সময়।

জমি তৈরি

মসুর চাষের জন্য সাধারণত ২/৩ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করা হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য জমিতে নালা কেটে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

নিচে (৪০ বর্গমিটার) শতক প্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল। সবগুলো সার শেষ চাষের আগে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে।

মসুর ডালের সার প্রয়োগ

সারের নাম	প্রতি শতক (৪০ বর্গমিটার) জমি
গোবর	৮ কেজি
ইউরিয়া	১৮০ গ্রাম
টিএসপি	৪৬০ গ্রাম
এমপি	১৪০ গ্রাম
জিপসাম	৩৪০ গ্রাম
দস্তা সার	৪৫ গ্রাম

বীজের হার

মসুর ডালের বীজের হার শতক (৪০ বর্গমিটার) প্রতি ১২০ – ১৬০ গ্রাম।

বপন পদ্ধতি

জমি ভালোভাবে চাষ করে বীজ সমানভাবে ছিটিয়ে মই দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সহজে আগাছা দমনের জন্য সারিতে বীজ বপন করা উচিত। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি হওয়া উচিত। বীজ ২.৫-৩ সেমি গভীরতায় বপন করা উচিত।

পরিচর্যা

বিভিন্নভাবে মসুর ডালের জমির পরিচর্যা করতে হয়। নিচে এগুলোর আলোচনা করা হল।

আগাছা দমন

মসুরের খেতে আগাছা জন্মাতে দেওয়া উচিত নয়। বীজ বপনের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

পানি সেচ

সাধারণত আমাদের দেশে মসুর ডাল চাষে সেচ দেওয়া হয় না। তবে মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বীজ বপনের পূর্বে হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে।

পোকা দমন

অনেক রকমের পোকা মসুরের খেতে আক্রমণ করতে পারে। এদের মধ্যে জাব পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এই পোকা মসুরের পাতা, কুঁড়ি, ফুল এবং শুঁটি আক্রমণ করে রস শুষে খায়। জাব পোকা দ্রুত বংশবিস্তার করে। তাই আক্রমণের শুরুতেই ম্যালাথিয়ন ০.০৫% পানিতে মিশিয়ে খেতে ছিটিয়ে দিতে হয়।

রোগ দমন

মসুর ডালে নানা রকম রোগ দেখা দিতে পারে। এই রোগগুলোর মধ্যে ঢলে পড়া রোগ, গোড়া পচা রোগ, শিকড় পচা রোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলো দমনের জন্য সঠিকভাবে শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে। বীজ বপনের আগে কেজি প্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স- ২০০ প্রয়োগ করে শোধন করে নিতে হবে।

ফসল কাটা, মাড়াই ও সংরক্ষণ

মসুর ডালের শুঁটিগুলো যখন হলদে বা বাদামি রং ধারণ করে তখন ফসল কাটতে হবে। ফসল কেটে তিন চারদিন ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে মাড়াই করতে হবে। মাড়াই হয়ে গেলে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে। অবশেষে পরিচ্ছন্ন টিন বা পলিথিনের বস্তায় রাখতে হবে।

ফলন

প্রতি হেক্টরে ১.৫-২ মেট্রিক টন ফলন হয়। প্রতি শতকে অর্থাৎ ৪০ বর্গমিটারে ৩৫-৫০ কেজি মসুর ডাল পাওয়া যায়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ ধানের বীজতলা তৈরিকরণ

উপকরণ

১. জমি ২. খুঁটি ৩. জায়গা মাপের ফিতা ৪. কোদাল ৫. বীজ।

কাজের ধাপ

১. কৃষি শিক্ষকের সাথে পূর্ব নির্ধারিত কৃষকের জমিতে যাও।
২. জমিটি উঁচু, প্রচুর রোদ ও আলোবাতাসযুক্ত কিনা দেখ।
৩. বীজতলার জায়গা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৪০ বর্গমিটার (১০ মিটার × ৪মিটার) জায়গা মেপে নাও।
৪. চার কোনায় চারটি খুঁটি দিয়ে জায়গাটি চিহ্নিত কর।
৫. জায়গাটি কোদাল দিয়ে ২/৩ বার কুপিয়ে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে পানি আটকিয়ে রাখ। এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর।

৬. এক সপ্তাহ পর কোপানো জমিতে ৮০ কেজি গোবর ছিটিয়ে দিয়ে ২/৩ বার চাষ দাও এবং থকথকে কাদাময় কর।
৭. জমির সীমানার চতুর্দিকে ১০ সেমি গভীর করে ২৫ সেমি প্রস্থের নালা তৈরি কর। মাটি বাইরে না ফেলে ভেতরে ফেল।
৮. ২৫ সেমি নালা বাদ দিয়ে প্রস্থের ভেতরের দিকে ১.৫ মিটার মেপে নাও এবং চিহ্নিত কর। একইভাবে বিপরীত দিক হতে ২৫ সেমি বাদ দিয়ে প্রস্থের ভেতরের দিকে ১.৫ মিটার মেপে নাও এবং চিহ্নিত কর।
৯. তারপর ৫০ সেমি স্থান হতে দৈর্ঘ্য বরাবর ১০ সেমি গভীর করে নালা তৈরি কর। নালার মাটি উভয় পাশে রাখ।
১০. এখন দেখ ৯.৫ মি দৈর্ঘ্য এবং ১.৫ মি প্রস্থ বিশিষ্ট ২ খড়ের একটি বীজতলা তৈরী হয়েছে।
১১. এই বীজতলার জন্য ৩ কেজি পরিমাপ অঙ্কুরিত বীজ ছিটিয়ে দাও।
১২. সবশেষে প্রতিটি ধাপে কী কী কাজ করলে তোমার ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

বিষয় ঃ পাটের জাগ দেওয়া

উপকরণ

১. জাগ দেওয়ার জন্য পাট গাছ. ২. খুঁটি ও দড়ি।

কাজের ধাপ

১. অল্প স্রোত আছে এবং পানি পরিষ্কার এরূপ জলাশয় নির্বাচন কর।
২. জলাশয়ে চার কোনার আকার স্থান নিয়ে চার কোনায় চারটি খুঁটি পুঁতে দাও। প্রস্থের দুই দিকে পানির ৬০ সেমি নিচে আড় বেঁধে দাও।
৩. এখন খুঁটির আড়ে পাতা ঝরানো পাটের আঁটি গোড়া মাথা পাশাপাশি রেখে এক স্তর সাজাও এবং স্তরটি খুঁটিতে বাঁধ যাতে স্রোতে চলে না যায়।
৪. এরূপভাবে আরো স্তর সাজাও।
৫. স্তরগুলো এমনভাবে ডুবাবে যেন জাগের স্তরের উপর প্রায় ৩০ সেমি পানি থাকে।
৬. জাগের ওপর খড়কুটা বা কচুরিপানা বিছিয়ে তার উপর ভারী জিনিস রেখে চাপা দাও।
৭. দেখবে ১২-১৫ দিনের মধ্যে পাট পচে যাবে।
৮. কাজের ধাপগুলো তোমার ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

বিষয় ঃ রোপা আমন ধানের চাষ

উপকরণ

১. নিজস্ব জমি ২. কোদাল/লাঙল ৩. বিভিন্ন প্রকার সার ৪. ধানের চারা।

কাজের ধাপ

১. রোপা আমন মৌসুমে এক শতক অর্থাৎ ৪০ বর্গমিটার পরিমাণ একখণ্ড ধানের জমি নাও।
২. জমিটি কোদাল অথবা লাঙল দিয়ে ভালোভাবে চাষ কর।
৩. বৃষ্টির পানি অথবা সেচের পানি দিয়ে কাদা কর।
৪. শেষবারে ৩৬০ গ্রাম টিএসপি, ১৬০ গ্রাম এমপি, ২৪০ গ্রাম গন্ধক ও ৪০ গ্রাম দস্তা সার জমিতে ভালোভাবে মিশিয়ে চাষ কর।
৫. বীজতলা থেকে ২ বর্গমিটার পরিমিত স্থানের ব্রিশাইল ধানের চারা সংগ্রহ কর।
৬. জমিতে ছিপছিপে পানি দিয়ে দড়ির সাহায্যে লাইন করে ৩টি করে চারা রোপণ কর।

খেয়াল রাখ যাতে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২৫ সেমি এবং গোছা থেকে গোছার দুরত্ব ১৫-২০ সেমি হয়।

৭. প্রয়োজনমতো সেচের ব্যবস্থা কর।
৮. আগাছা দমন কর।
৯. কৃষি শিক্ষকের পরামর্শ মোতাবেক পোকা দমন কর। কী ধরনের পোকা জমি আক্রমণ করেছে এর রেকর্ড রাখ।
১০. রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে রেকর্ড রাখ। দমনের ব্যবস্থা কর।
১১. চারার বয়স ২ সপ্তাহ হলে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া জমিতে ছিটিয়ে দাও। এর ৪৫ দিন পর ১২৫ গ্রাম এবং থোড় আসার সময় ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দাও।
১২. সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অগ্রহায়ণ মাসে ধান পেকে যাবে।
১৩. ধানের সোনালি রং হলেই কাস্তে দিয়ে কেটে আঁটি বেঁধে বাড়িতে আনবে।
১৪. তারপর মাড়াই করে ঝেড়ে ধান মাপ।
১৫. প্রতিটি ধাপের কার্যাবলি তোমার ব্যবহারিক খাতায় লেখ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনগুলো ধানের ক্ষতিকর পোকা?
   ক. পামরি পোকা, গল মাছি, মাজরা পোকা
   খ. মাজরা পোকা, উরচুঙ্গা, চেলে পোকা
   গ. পামরি পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, জাব পোকা
   ঘ. পামরি পোকা, কাটুই পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং।

২. ধানের টুংরো রোগের জন্য দায়ী-
   i. ভাইরাস
   ii. বাদামি গাছ ফড়িং
   iii. সবুজ পাতা ফড়িং।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর লেখ :

ধানের জন্য বিভিন্ন সারের মাত্রা চার্টে উল্লেখ করা হল।

ধানের জাত	পরিমাণ	শতকরা (৪০ বর্গমিটার)		
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম
রোপা আমন	৬০০ গ্রাম	৩৬০ গ্রাম	১৬০ গ্রাম	৪০ গ্রাম

শেষ চাষের সময় ইউরিয়া ব্যতীত উল্লিখিত সকল সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ হিসেবে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। প্রথম কিস্তিতে চারা লাগানোর দুই সপ্তাহ পর অর্ধেক ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়। অবশিষ্ট সারকে দুই ভাগ করে ১৫ দিন পর একভাগ এবং বেড়ে আসার সময় আর একভাগ প্রয়োগ করতে হয়।

৩. ইউরিয়া তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করার কারণ-
   i. ইউরিয়া একসাথে সহজলভ্য নয়
   ii. এতে সারের অপচয় কম হয়
   iii. ধানের বিভিন্ন ধাপে সারের চাহিদার ভিন্নতা ।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪. শেষ কিস্তিতে প্রতি শতকে কতটুকু ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে-

ক. ১৫০ গ্রাম   খ. ১২৫ গ্রাম
গ. ১০০ গ্রাম   ঘ. ৭৫ গ্রাম।

সৃজনশীল প্রশ্ন

আলু চাষে হেক্টর প্রতি সারের ব্যবহার নিম্নরূপ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ
ইউরিয়া	২২০-২৫০ কেজি
টি এস পি	১২০-১৫০ কেজি
এম পি	২২০-২৫০ কেজি
গোবর	৮- ১০ টন

ক. আলুর রোপণের উপযুক্ত সময় উল্লেখ কর?

খ. আলু চাষে এম পি সারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. উল্লিখিত সারের মাত্রা অনুযায়ী ১৫ শতক আলুর জমিতে সারের মাত্রার একটি চার্ট তৈরি কর।

ঘ. বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে খাদ্যঘাটতি মোকাবেলায় উচ্চ ফলনশীল আলুর চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে-বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন পরিচিতি ও বনবিধি

সাধারণভাবে গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত বিস্তৃত এলাকাকে বন বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার গাছপালা দ্বারা আবৃত হলেও বনে সাধারণত বড় গাছ বেশি থাকে। গাছপালা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি বনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এগুলোর সমন্বয়ে বনজ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বনাঞ্চল প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম হতে পারে। যে বনাঞ্চল মানুষের সহায়তা ছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে উঠেছে তাকে প্রাকৃতিক বন বলা হয়; যেমন- সুন্দরবন, ভাওয়াল ও মধুপুরের শাল বন। বিভিন্ন এলাকায় গাছ লাগিয়ে যে বন সৃষ্টি করা হয় তাকে কৃত্রিম বন বা মানুষের তৈরী বন বলা হয়; যেমন- বন বিভাগ কর্তৃক তৈরী চট্টগ্রামের সেগুন বন, উপকূলীয় এলাকার কেওড়া ও বাইন বন।

বনের গুরুত্ব

মানব সভ্যতার বিকাশে বন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বনই আদি মানুষের আশ্রয় ও খাদ্য যোগাত। আজও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বন তথা গাছের অবদান অনেক। তবে এসব অবদানের কতকগুলো সরাসরি পরিমাপ করা যায়; যেমন- নির্মাণ কাঠ, মন্ড উপযোগী কাঠ, ফলমূল, ভেষজ ইত্যাদি। এসব দ্রব্যদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা যায়। আবার কোনটা সরাসরি পরিমাপ করা যায় না; যেমন- বন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, মাটির ক্ষয়রোধ করে, মাটির উর্বরতা বাড়ায়, ভূগর্ভস্থ পানির মজুদ বৃদ্ধি করে এবং নদনদীর পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। অবদানের প্রেক্ষিতে বনের গুরুত্বকে চারভাগে ভাগ করা যায়; যথা

১. অর্থনৈতিক গুরুত্ব
২. পরিবেশগত গুরুত্ব
৩. জীব বৈচিত্র্য
৪. চিত্তবিনোদন।

১. অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। বন থেকে প্রধানত নির্মাণ কাঠ, জ্বালানি কাঠ, মন্ড উপযোগী বাঁশ, শিল্পের কাঁচামাল, ভেষজ দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়। এসকল সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হল।

নির্মাণ কাঠ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাঠের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ঘরবাড়ি নির্মাণ এবং আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। নৌকা, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামসহ অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে কাঠ ব্যবহৃত হয়। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক এসব কাঠের কাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাই কাঠ দেশের বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিরাট অবদান রাখছে।

জ্বালানি কাঠ

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক রান্নার কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করে। দেশে জ্বালানি কাঠের চাহিদা প্রায় ৩০ কোটি ঘন মিটার। বাজার দরে এর মূল্য ১৫ হাজার কোটি টাকা। জ্বালানি কাঠ আহরণ ও ব্যবসার সাথে দেশে ১০ লক্ষ

লোক সম্পৃক্ত থেকে জীবিকা অর্জন করেছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে জ্বালানি কাঠ দেশের অর্থনীতিতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি কাঠের চাহিদা বেড়েছে। সে সাথে জ্বালানি কাঠের সংকটও বেড়েছে। এতে করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ অধিকহারে গোবর ও কৃষিদ্রব্য পোড়াচ্ছে। অথচ এগুলো সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করে জমির উর্বরতা ও ফসলের ফলন বাড়ানো যেত। অপরদিকে জমির জৈব পদার্থের ভারসাম্য রক্ষা হত। তাই জ্বালানি কাঠের উৎপাদন এবং সরবরাহ বাড়িয়ে দেশের অর্থনীতিতে আরো বেশি অবদান রাখা সম্ভব।

বাঁশ

দেশের বনাঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতের বাঁশ আহরিত হয়। এছাড়া প্রচুর পরিমাণ বাঁশ গ্রামাঞ্চলের বাঁশঝাড় থেকে কাটা হয়। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কাঁচা পাকা সকল ধরনের গৃহ নির্মাণের কাজে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। আর এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা অর্জন করছে।

শিল্পের কাঁচামাল

কাগজ, রেয়ন, দিয়াশলাই, চায়ের বাক্স, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল বন থেকেই আসে। দেশের সর্ববৃহৎ দুইটি কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল বনের কাঠ ও বাঁশ। কর্ণফুলী কাগজ কল বছরে প্রায় ৪২ হাজার টন বাঁশ এবং ৫০ হাজার ঘন মিটার কাঠ ব্যবহার করছে। আর খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল বছরে ১.৪ লক্ষ ঘন মিটার সুন্দরবনের গেওয়া কাঠ ব্যবহার করে। তাছাড়া খুলনার হার্ডবোর্ড মিল, চন্দ্রঘোনার রেয়ন মিল, সিলেটের পাল্পস এন্ড পেপার মিল এবং দেশের ম্যাচ ফ্যাক্টরিসমূহের উৎপাদন মূলত কাঠের ওপর নির্ভর করে। দেশের অনেক ছোট ছোট শিল্পকারখানা এবং কুটির শিল্পের কাঁচামালের যোগান আসছে গাছ থেকে। এসব কলকারখানা এবং কুটির শিল্পে লক্ষ লক্ষ পেশাজীবী এবং শ্রমজীবী লোক কর্মরত রয়েছে।

কুটির শিল্প

কুটির শিল্পের মধ্যে আসবাবপত্র তৈরির কারখানা, বাঁশ, বেত ও হস্তশিল্পের যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে এ সকল হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। এতে দেশের লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে।

ভেষজ

আদিকাল থেকেই আমাদের দেশে ভেষজ উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ভেষজ উদ্ভিদের সিংহভাগই আসছে বনাঞ্চল থেকে। আমলকি, হরিতকি, বহেরা এবং আরো অনেক প্রচলিত ভেষজের উৎস বন। দেশের আয়ুর্বেদীয় ওষুধ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল ভেষজ গাছ। ভেষজ শিল্প হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করছে। ভেষজ ওষুধ সেবন করে দেশের অগণিত মানুষ উপকার পাচ্ছে।

বিবিধ দ্রব্য

সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু, মোম ও ঘরের ছাউনির জন্য গোলপাতা আহরিত হচ্ছে। বনাঞ্চলের আশেপাশে বসবাসকারী অনেক লোক বন থেকে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল আহরণ করে তাদের খাদ্যের চাহিদা মেটায়। এ বিবেচনায় বন মানুষের পুষ্টি সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২. পরিবেশগত গুরুত্ব

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা অপরিসীম। আমরা জানি পরিবেশের ভারসম্য রক্ষায় দেশের ২৫% ভূমিতে বন থাকা প্রয়োজন। বন কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখে এখানে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১. বনের গাছপালা বাতাসের অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এতে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ভারসাম্য রক্ষা হয়।
২. গাছ প্রস্বেদনের মাধ্যমে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই জলীয় বাষ্প বৃষ্টিপাত ঘটাতে সহায়তা করে।
৩. আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতা হ্রাস করে।
৪. বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে।
৫. ভূমিক্ষয় ও ভূমিধস রোধ করে। ভূগর্ভস্থ পানির মজুদ বৃদ্ধি করে। নদনদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
৬. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
৭. বন্য জীবজন্তু, পাখি ও কীটপতঙ্গকে আশ্রয় দেয় এবং খাদ্য যোগায়।
৮. ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জনপদ রক্ষা করে।

৩. জীববৈচিত্র্য

উদ্ভিদ, প্রাণী ও বিভিন্ন প্রকার অণুজীবের উপস্থিতি ও বিস্তৃতিকে সাধারণত জীববৈচিত্র্য বা বায়ো ডাইভারসিটি বলা হয়। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা অনেক ফসল, বনাঞ্চলে জন্মানো বন্যজাত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ঐসব ফসলকে কৃষি জমিতে চাষের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে আরো অনেক উদ্ভিদের প্রয়োজন হবে, যা হয়ত বনেই আছে। কাজেই জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আমাদের প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণ করা অতি প্রয়োজন।

৪. চিত্তবিনোদন

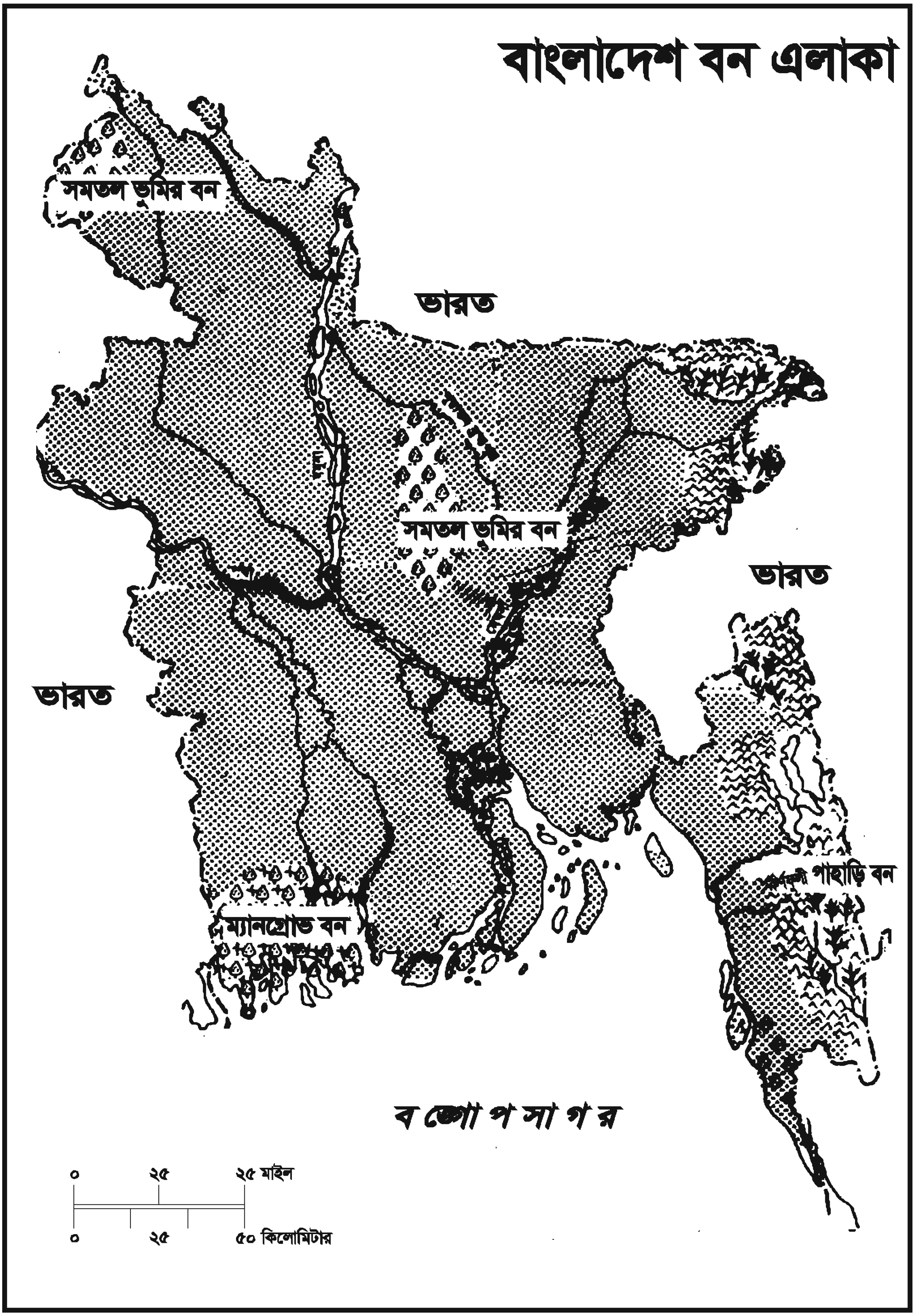
বর্তমান কর্মচঞ্চল সমাজ জীবনে বন চিত্তবিনোদনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে। বনের খোলা পরিবেশ, নির্মল বাতাস, সবুজ গাছগাছালি, বিচিত্র বন্যপ্রাণী, প্রবাহমান নদী ও ঝর্ণা ইত্যাদি চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় উপাদান মানুষের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। এজন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে বনে চিত্তবিনোদন একটু আলাদা, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সুপরিকল্পিতভাবে বনানী ঘেরা চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা এখনও পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে ওঠেনি। ঢাকার কাছাকাছি ভাওয়ালে ও মধুপুরে জাতীয় উদ্যান অবস্থিত। শীতের সময় ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের বিনোদন কার্যক্রমে মানুষের খুব ভিড় হয়। মধুপুরের জাতীয় উদ্যান এবং ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেন চিত্তবিনোদন কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বেশ কিছু বনাঞ্চল কেন্দ্রিক চিত্তবিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে; যেমন- কক্সবাজারে হিমছড়ি, টেকনাফ, সিলেটের জয়ন্তিয়া, দিনাজপুরের রামসাগর ও সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট। বনাঞ্চলভিত্তিক এসব চিত্তবিনোদন কেন্দ্রগুলোর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে আধুনিক চিত্তবিনোদন কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা যেতে পারে।

বনাঞ্চলের বিস্তৃতি

বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২.৪৬ মিলিয়ন হেক্টর (২৪.৬ লক্ষ হেক্টর)। ইহা বাংলাদেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ। প্রাকৃতিক বন, মানুষের তৈরী বন, বসতবাড়ির বন বাগান নিয়ে এই পরিমাণ বনভূমি বাংলাদেশে বিদ্যমান। কিন্তু এই বন সারাদেশে সমভাবে বিস্তৃত নয়। অধিকাংশ বনভূমি দেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। দেশের বিস্তীর্ণ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম। মানচিত্রে বনভূমির অবস্থান দেখানো হল।


বাংলাদেশ বন এলাকা
সমতল ভূমির বন
ভারত
সমতল ভূমির বন
ভারত
ভারত
পাহাড়ি বন
ম্যানগ্রোভ বন
বঙ্গোপসাগর
০ ২৫ ২৫ মাইল
০ ২৫ ৫০ কিলোমিটার

অবস্থান ও বিস্তৃতি ভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে তিনভাগে ভাগ করা য়ায।

১. পাহাড়ি বন
২. সমতল ভূমির বন
৩. ম্যানগ্রোভ বা উপকূলীয় লোনা পানির বন।

নিচের ছকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ দেখানো হল।

অবস্থান ও বিস্তৃতি ভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চলে (লক্ষ হেক্টর)

বনের ধরন	প্রাকৃতিক বন	সৃজিত বন	মোট
পাহাড়ি বন	১১.০৬	২.১০	১৩.১৬
উপকূলীয় লোনা পানির বন	৬.১৬	১.৩৪	৭.৫০
সমতল ভূমির বন	০.৮৭	০.৩৬	১.২৩
গ্রামীণ বন/গ্রামীণ গাছপালা	-------	২.৭০	২.৭০

১. পাহাড়ি বন

বাংলাদেশের বন এলাকার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে পাহাড়ি বন। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট এলাকা জুড়ে এ বন রয়েছে। পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর। পাহাড়ি বনের প্রধান প্রধান গাছ হচ্ছে সেগুন, গর্জন, চাপালিশ, কড়ই, তেলসুর, গামার, জারুল ও চম্পা। তাছাড়া এই বনে প্রচুর বাঁশ জন্মে। এ বনাঞ্চলে হাতি, হরিণ, বাঘ, বানর, ভল্লুক, বনমুরগি ইত্যাদি বন্যপ্রাণী দেখা যায়।

২. সমতল ভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, ময়মানসিংহ , টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা অঞ্চলের শালবনকে সমতল ভূমির বন বলে। এ বনের মোট পরিমাণ ১.২৩ লক্ষ হেক্টর। প্রধান প্রধান বৃক্ষ হল শাল ও গজারী। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে জারুল, কড়ই, জিগা উল্লেখযোগ্য। লোকবসতির কাছাকাছি হওয়ায় এ বনের ওপর গাছ কাটার চাপ খুব বেশি। অনেক বন অবৈধভাবে কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণসহ জমি চাষাবাদ করা হয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল প্রায় বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে এসব বন এলাকার খালি জায়গায় স্থানীয় জনগণের সহায়তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনবাগান করা হচ্ছে। এসব বাগানে রোপণ করা গাছের মধ্যে রয়েছে আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস ও অর্জুন।

৩. ম্যানগ্রোভ বা লোনা পানির বন

খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট এলাকায় প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা লোনা পানির বন দেখতে পাওয়া যায়। এ বন সুন্দরবন নামে পরিচিত। ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী। সাগরের খুব কাছাকাছি হওয়ায় প্রতিদিন জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। এই বনের গাছের আকৃতি ও প্রকৃতি দেশের অন্যান্য বনের গাছ থেকে আলাদা। এ বনের বৃক্ষের মধ্যে সুন্দরীই প্রধান। গাছের নামানুসারেই এ বনের নামকরণ হয়েছে সুন্দরবন। অন্যান্য গাছের মধ্যে গেওয়া, গরান, পশুর, কেওড়া, বাইন ও কাকড়া উল্লেখযোগ্য। গোলপাতা সুন্দরবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গাছ। এই গাছের পাতা ঘরের ছাউনি এবং বেড়া তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে পর্যাপ্ত মধু পাওয়া যায়। এই বনেই বাস করে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গাল টাইগার। হরিণ, বন শূকর, বানর, অজগর, কুমির এবং নানা রকমের পাখিও পাওয়া যায়।

সুন্দরবন ছাড়াও বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চরে বনায়ন করা হচ্ছে। মানুষের তৈরী উপকূলীয় এ বনের প্রধান গাছ কেওড়া। কিছু কিছু এলাকায় বাইন ও ঝাউ গাছ লাগানো হচ্ছে।

বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ

বাংলাদেশে বিভিন্ন বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য জরিপ ও সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বনে যে কাঠের পরিমাণ মজুদ থাকে তাকে গ্রোয়িং স্টক (Growing Stock) বলা হয়ে থাকে। বনে কী পরিমাণ গ্রোয়িং স্টক রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন বনভূমিতে সমীক্ষায় প্রাপ্ত কাঠের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল।

বিভিন্ন বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ ৮৮.৯১ মিলিয়ন ঘন মিটার।

মজুদ কাঠের পরিমাণ

বনের ধরন	মজুদ কাঠের পরিমাণ মিলিয়ন ঘন মিটার
পাহাড়ি বন	২০.৭১
উপকূলীয় লোনা পানি বন	১২.৩২
সমতল ভূমির বন	১.২০
গ্রামীণ বন	৫৪.৬৮
মোট	৮৮.৯১

বনবিধি ও বন্যপ্রাণী বিধি

বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার জন্য দেশে ২টি সুনির্দিষ্ট আইন প্রচলিত আছে। বনভূমি ও বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ বন আইন ১৯২৭ (সংশোধিত ১৯৯০) এবং বন্যপ্রাণী সংশোধিত আইন ১৯৭৪ চালু হয়েছে।

বনবিধি

সরকারি বনভূমিতেই অনধিকার প্রবেশ, বনভূমির জবরদখল অথবা সেখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ অথবা ঐ স্থানে চাষাবাদ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তেমনি বনভূমি থেকে বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহণ করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই প্রকার অপরাধ সংঘটনকারীর কমপক্ষে এক বছর জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং উর্ধ্বে দুই বছর জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। তাছাড়া বিনা অনুমতিতে বনের কাঠ পরিবহণ করার দায়ে জেল ও জরিমানা শাস্তির বিধান রয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই প্রকার অপরাধের বিচার হয়ে থাকে।

বন্যপ্রাণী বিধি

বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশের যে কোনো বন্যপ্রাণী ধরা বা শিকার করা অথবা বিষ প্রয়োগে হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিনা অনুমতিতে কোনো বন্যপ্রাণী পোষাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই প্রকার অপরাধীর কমপক্ষে ছয় মাসের জেলসহ দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং উর্ধ্বে দুই বছরের জেলসহ জরিমানা হতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই প্রকার মোকদ্দমার বিচার হয়ে থাকে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ বন পরিচিতি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুলের পার্শ্ববর্তী বন এলাকা বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেখানে গাছপালা প্রাকৃতিকভাবে আছে অথবা লাগানো হয়েছে সে এলাকা পরিদর্শনে যাবেন।

উপকরণ

মাঠ পর্যবেক্ষণ নোট বুক, পেন্সিল, কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. এলাকার পারিপার্শ্বিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ কর।

২. বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ তথা বৃক্ষ, গুল্ম, বীরুৎ ও আরোহী উদ্ভিদের উপস্থিতি, আনুমানিক সংখ্যা ও অবস্থানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ কর।

৩. উল্লেখযোগ্য বৃক্ষসমূহের তালিকা প্রণয়ন ও সেগুলোর প্রচলিত ব্যবহার লিপিবদ্ধ কর।
৪. পরিদর্শিত এলাকায় কী কী পাখি ও বন্যপ্রাণী দেখেছ তা লিপিবদ্ধ কর।
৫. ব্যবহারিক খাতায় এসব বিবরণ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের তৈরি উপকূলীয় বনের প্রধান বৃক্ষ কী?

ক. নারিকেল খ. গেওয়া
গ. কেওড়া ঘ. সুন্দরী

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার কৃত্রিম বনগুলো হচ্ছে-

i. উপকূলীয় এলাকার কেওড়া বন
ii. কুমিল্লার শালবন
iii. চট্টগ্রামের সেগুন বন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বন কর্মকর্তা ওয়াদুদ সাহেব একদিন সুন্দর বন পরিদর্শনে গেলে লক্ষ করলেন কিছু লোক একটি হরিণ শিকার করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাদেরকে ডেকে এনে বন্য পশু শিকারের নানা রকম কুফল ও আইনগত শাস্তি যোগ্য অপরাধ গুলো কী তা বুঝিয়ে দিলেন। লোকগুলো তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের অপরাধ না করার অঙ্গীকার করে।

৩. বন্য প্রাণী শিকার/হত্যার বিচার কোন আদালতে হয়?

ক. ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে খ. ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে
গ. জেলা জজ আদালতে ঘ. বন বিভাগের স্পেশাল আদালতে।

৪. বন্য প্রাণী শিকার/হত্যার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ কোনটি?

ক. সভা সমাবেশের আয়োজন করা। খ. ব্যালট পোস্টারিং করা।
গ. কর্মশালার আয়োজন করা। ঘ. রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারণা চালানো।

সৃজনশীল প্রশ্ন

কৃষি শিক্ষক আছাদুজ্জামান দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কুমিল্লার ময়নামতির বৌদ্ধ বিহার ও শালবনে শিক্ষা সফরে নিয়ে যান। শিক্ষার্থীরা বনের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে বনজ সম্পদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা দেন। শিক্ষার্থীরা বনে কিছু পাখি দেখতে পেলেও কোনো পশুর দেখা পেল না। না পেয়ে শিক্ষকের নিকট জানতে চাইল কেন বন্য পশু দেখতে পেলাম না। শিক্ষক তাদেরকে এর কারণ ব্যাখ্যা করেন।

ক. শিক্ষার্থীদের দেখা এ বন কোন ধরণের বন?
খ. প্রাকৃতিক বন ও কৃত্রিম বনের মধ্যে ১টি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্ণনা কর।
গ. তোমাদের শিক্ষা সফরের জন্য উত্তম বিনোদনধর্মী বনাঞ্চল কিরূপ হবে, তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "জীব বৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে বনাঞ্চল নির্ভর চিত্র বিনোদন কেন্দ্র সীমিত হওয়া উচিত" এ উক্তির স্বপক্ষে তোমার বক্তব্য উপস্থাপন কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন নার্সারি

যে স্থানে বনজ চারা উৎপাদন করে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে বনজ নার্সারি বলে।

নিম্নেবর্ণিত উদ্দেশ্যে নার্সারিত চারা উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

১. সহজে চারার পরিচর্যা করা যায়।
২. প্রয়োজনমতো চারা উৎপাদন করা যায়।
৩. কাঙ্ক্ষিত জাতের ও মানের সুস্থ সবল চারা উৎপাদন করা ।
৪. চাহিদামতো বিভিন্ন জাতের ও বয়সের সবল চারার সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৫. উৎপাদন খরচ কমানো এবং বিতরণ ও বিপণন সহজতর করা।
৬. প্রতিকূল অবস্থায়ও চারা উৎপন্ন করা যায়।

অনেক বীজ আছে যেগুলো গাছ থেকে পড়ার ২/১ দিনের মধ্যেই রোপণ করতে হয়। এসব বীজ গুদামজাত করা যায় না। কাজেই নার্সারিতে এসব গাছের চারা উৎপাদন করে পরবর্তীতে ইচ্ছামতো নির্বাচিত স্থানে লাগানো যায়। তাছাড়া, নার্সারিতে কলম ও শিকড় থেকে চারা উৎপাদন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের চারা উৎপাদন করা যায়।

নার্সারি স্থাপন পরিকল্পনা

চারা উৎপাদনের জন্য নার্সারি একান্ত প্রয়োজন। আর নার্সারি স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। নার্সারি স্থাপন পরিকল্পনাকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

১. স্থান নির্বাচন।
২. জায়গার পরিমাণ নির্ধারণ।
৩. ভূমি উন্নয়ন ও বেড়া নির্মাণ।
৪. সজ্জিতকরণ।

১. স্থান নির্বাচন

নার্সারি প্রতিষ্ঠাকালে স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান সঠিকভাবে নির্বাচন করতে না পারলে নার্সারি লাভজনক হবে না। তাই নার্সারির স্থান নির্বাচনকালে কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

১. যেখানে বৃষ্টির পানি জমে না ও বর্ষাকালে পানি ওঠে না।
২. পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো।
৩. প্রচুর আলোবাতাস আছে।
৪. মালামাল ও চারা পরিবহণের জন্য ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে।
৫. সেচের পানির ব্যবস্থা আছে বা সহজে পানি সেচের ব্যবস্থা করা যায়।
৬. মাটি উর্বর ও দোআঁশ।

২. জায়গার পরিমাণ নির্ধারণ

বছরে কী ধরনের কত চারা উৎপাদন করা হবে তার ওপর নার্সারির জায়গার পরিমাণ নির্ভর করে। নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ হতে কোনো নার্সারির জায়গার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

চারার সংখ্যা

পলি ব্যাগের আকার	প্রতি বর্গমিটারে চারার সংখ্যা
১৫ সেমি × ৯ সেমি	২২৫
২৫ সেমি × ১৫ সেমি	১০০
৩০ সেমি × ২৫ সেমি	৩৬

স্ট্যাম্পের সংখ্যা

চারা থেকে চারার দূরত্ব	প্রতি বর্গমিটারে স্ট্যাম্পের সংখ্যা
৪ সেমি × ৪ সেমি	৬২৫
৫ সেমি × ৫ সেমি	৪০০
১০ সেমি × ১০ সেমি	২০০
১০ সেমি × ১০ সেমি	১০০

নার্সারিতে রাস্তা ও নর্দমার জন্য চারা উত্তোলনের সমপরিমাণ জায়গা দরকার। ঘর দরজা ইত্যাদির জন্য মোট জায়গার শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্ত জায়াগার সংস্থাপন রাখতে হবে।

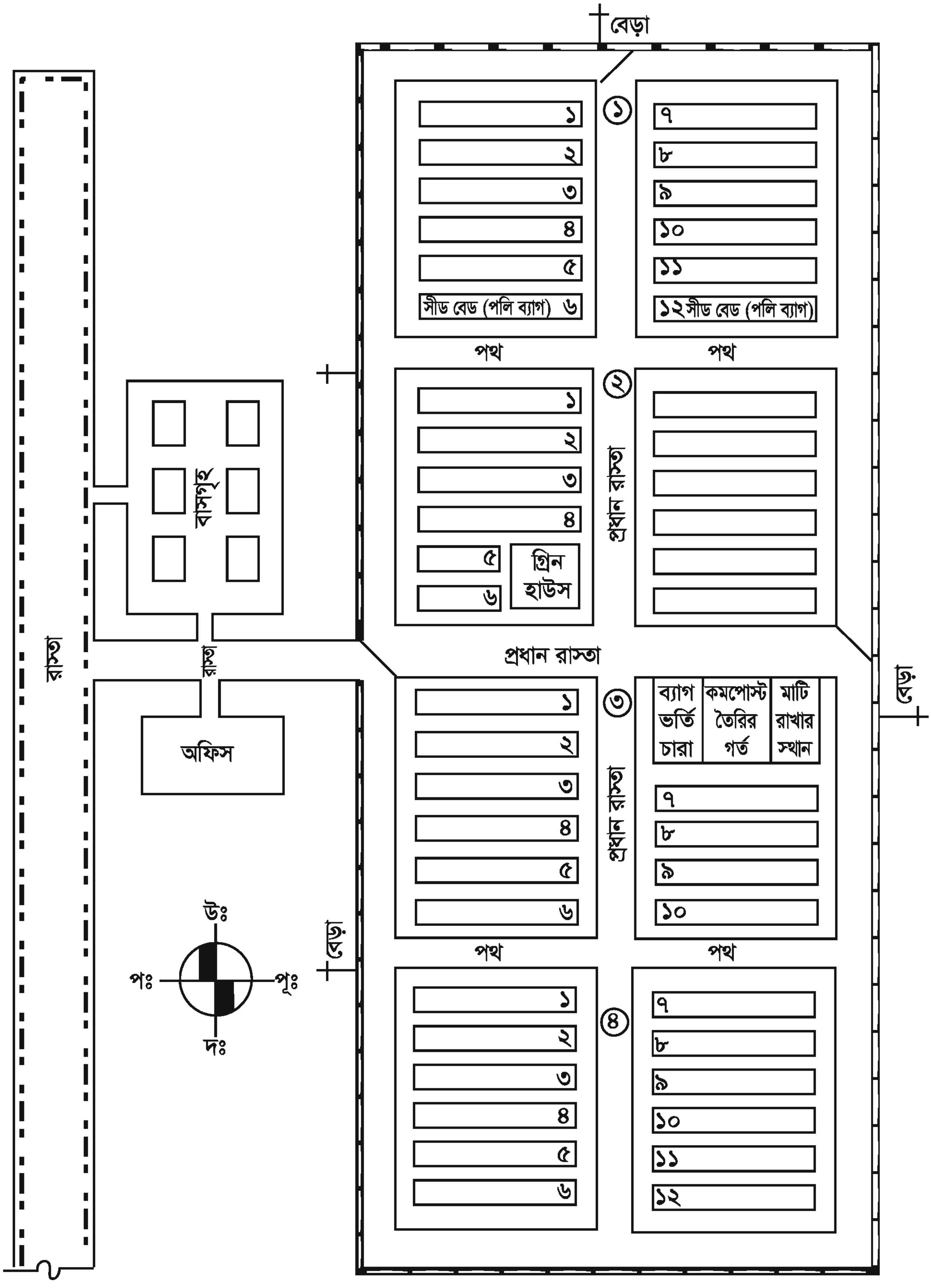
৩. ভূমি উন্নয়ন ও বেড়া নির্মাণ

নার্সারির জন্য মনোনীত জায়গার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গাছের মোথা বা বড় পাথর ইত্যাদি থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। জায়গার উঁচুনিচু মাটি সমান করতে হবে। প্রয়োজনে মাটি ভরাট করে জায়গা সমান করতে হবে। তবে পাহাড়ি এলাকায় ধাপ তৈরি করে নার্সারি বেড স্থাপন করতে হবে।

নার্সারির চারদিকে বেড়া দেওয়া প্রয়োজন। বাঁশের বেড়া, ইটের দেয়াল, কাঁটাতারের বেড়া বা লোহার জাল দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়। কাঁটা মেহেদি জাতীয় গাছের কাটিং ঘন করে লাগিয়েও নার্সারির চারদিকে জীবন্ত বেড়া তৈরি করা যেতে পারে।

৪. সজ্জিতকরণ

নার্সারি স্থাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সজ্জা পরিকল্পনা প্রণয়ন। এতে নার্সারি বেডের বিন্যাস, রাস্তা, নর্দমা, গৃহাদি, ভৌত কাঠামোগত সুবিধাদির অবস্থান ও বিন্যাস করতে হবে, কোথায় কী চারা উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি যাবতীয় কিছু এই পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকবে। নার্সারির জায়গা চারার ধরন অনুযায়ী কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে নিতে হবে। নার্সারির অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জায়গারও সংস্থান রাখতে হবে। নার্সারি বেড সাধারণত ১২ মিটার × ১.২ মিটার মাপের হয়। তবে প্রয়োজনে এবং জায়গার অনুপাতে দৈর্ঘ্য কিছুটা কমবেশি করা যেতে পারে। দুই বেডের মাঝে ৪৫-৫০ সেমি জায়গা রাখতে হবে। প্রধান পরির্দশন পথ সাধারণত ৩-৪ মিটার এবং পাশের পরিদর্শন পথ সাধারণত ৩-৪ মিটার এবং পাশের পরিদর্শন পথ ১-২ মিটার প্রস্থ হবে। নার্সারির পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি প্রধান নর্দমা থাকবে। পাশের নর্দমাগুলো প্রধান নর্দমার সাথে সংযুক্ত থাকবে। পাশের নর্দমাগুলো পরিদর্শন পথের উভয় পার্শ্বে হবে। নার্সারিতে পানি সরবরাহের জন্য পুকুর খনন, নলকূপ স্থাপন বা কুয়া খনন এবং সেচ নালা তৈরি করতে হবে। নার্সারি সজ্জিতকরণের নকশা দেওয়া হল।


বেড়া
১
২
৩
৪
৫
সীড বেড (পলি ব্যাগ) ৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২ সীড বেড (পলি ব্যাগ)
পথ
পথ
১
২
৩
৪
৫
৬
গ্রিন হাউস
প্রধান রাস্তা
বাসগৃহ
রাস্তা
প্রধান রাস্তা
ব্যাগ ভর্তি চারা
কমপোস্ট তৈরির গর্ত
মাটি রাখার স্থান
অফিস
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
প্রধান রাস্তা
উঃ
পঃ
পূঃ
দঃ
বেড়া
পথ
পথ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

চারা উৎপাদন পদ্ধতি

নার্সারিতে সাধারণত ২ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা হয়।

১. সরাসরি মাটিতে বা বেডে চারা উৎপাদন
২. পলিব্যাগে বা পাত্রে চারা উৎপাদন।

চারা উৎপাদনের জন্য বেড তৈরি

বেডে বা সরাসরি মাটিতে চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে ১৫-২০ সেমি গভীর করে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে নিতে হবে। এরপর ঘাস, শিকড়, পাথর ইত্যাদি বেছে ফেলে দিতে হবে। মাটি এঁটেল ধরনের হলে অন্যস্থান হতে দোআঁশ মাটি এনে মেশাতে হবে।

তারপর প্রতি বেডের জন্য ২০০ কেজি পচা গোবর বা কমপোস্ট সার এবং ৬ : ২ : ৪ অনুপাতে ১৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি সার মাটির সাথে ভালোভাবে মেশাতে হবে। এরপর মাটির উপরিভাগ সমান করতে হবে। জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট আকারের বেড তৈরি করতে হবে। প্রথমে দুই বেডের মাঝের ফাঁকা জায়গা থেকে মাটি তুলে বেডে ফেলে বেড ১০-১৫ সেমি উঁচু করতে হবে। এভাবে দুই বেডের মাঝে পানি নিষ্কাশনের নালা সৃষ্টি হবে। মাটি কম পড়লে বাইরে থেকে দোআঁশ মাটি এনে বেডে দিতে হবে।

বীজতলার পাশের নালা, মধ্য নালার সাথে যুক্ত থাকবে। বীজতলার ধার বা কিনারা বাঁধতে হবে। প্রথমে বীজতলার চারপাশে ৩৫-৪০ সেমি লম্বা বাঁশের সরু খুঁটি পুঁততে হবে। তারপর খুঁটির সাথে ১০-১৫ সেমি উঁচু করে বাঁশের চটি আড়াআড়িভাবে বেঁধে দিতে হবে। বেডের ধার তক্তা বা ইট বসিয়েও বাঁধা যায়।

পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের জন্য বেড তৈরি

পলিব্যাগে চারা উৎপাদ করলে বেডের মাটি কর্ষণ করতে হয় না। শুধু দুই বেডের মধ্যবর্তী স্থানের মাটি তুলে বেড ১০-১৫ সেমি উঁচু করে উপরিভাগ সমান করতে হয়। তারপর বাঁশ বা ইট দিয়ে বীজতলার ধার বাঁধতে হয়।

নার্সারিতে চারা উৎপাদনের উপকরণ

নার্সারিতে চারা উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে রয়েছে পলিব্যাগ, বীজ, মাটি, সার এবং বেড তৈরি ও চারা পরিচর্যার উপকরণ। বেড তৈরি ও চারা পরিচর্যার উপকরণের মধ্যে রয়েছে কোদাল, কাঁচি, দা, নিড়ানি, ঝাঁঝরি, ইট, বাঁশ, তক্তা, টুকরি, কীটনাশক ছিটানোর যন্ত্রপাতি ও দড়ি।

বীজ ও বীজবৃক্ষ

নার্সারিতে উন্নতমানের চারা তৈরি করতে হলে ভালো বীজ প্রয়োজন। আর ভালো বীজের জন্য দরকার ভালো বীজবৃক্ষ। তাই ভালো বীজ সংগ্রহ করতে হলে ভালো বীজ বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা দরকার। ভালো বীজ বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যগুলো হল।

১. গাছটি সতেজ ও সবল হবে।
২. গাছটি মাঝ বয়সী হবে।
৩. গাছটি শাখাপ্রশাখা নিয়ে বিস্তৃত হবে।
৪. গাছটি নিরোগ, নিখুঁত ও প্রচুর পল্লবধারী হবে।

এরূপ বৈশিষ্ট্যময় গাছকে আদর্শ বীজবৃক্ষ বলা হয়। তাই নার্সারিতে চারা উৎপাদনের জন্য আদর্শ বীজ হতে পরিপক্ব নিরোগ বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যে বীজ বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোপণ করতে হবে। নিম্নে কতগুলো বীজের সংগ্রহ সময়, সংরক্ষণ ও অঙ্কুরোদগমকাল পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

আম, জাম, কাঁঠাল, আমড়া, পেঁপে ইত্যাদি রসালো ফলের বীজ ভালো পাকা ফল থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তারপর বীজের অঙ্কুরোদগম কাল অনুযায়ী বীজ রোপণ অথবা সংরক্ষণ করতে হয়। যেসব বীজের অঙ্কুরোদগম কাল কম সে সব বীজ সংগ্রহের পর তাড়াতাড়ি রোপণ করতে হয়; যেমন- শাল, গর্জন, তেলসুর, বাঁশ, চাপালিশ ও কাঁঠাল।

সংগৃহীত বীজ রোপণের আগ পর্যন্ত গুদামজাত করাকে বীজ সংরক্ষণ বলে। সঠিকভাবে বীজ সংরক্ষণ না করলে পোকা বা রোগাক্রান্ত হয়ে বীজ নষ্ট হয় এবং বীজ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

বনজ গাছের বীজ সংগ্রহ, বপন ও অঙ্কুরোদগম কাল

প্রজাতির নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	বপনের সময়	অঙ্কুরোদগম কাল
মেহগনি	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	মার্চ-এপ্রিল	২০-৩০ দিন
গর্জন	মে-জুন	মে-জুন	১০-২০ দিন
সেগুন	নভেম্বর-ডিসেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	১০-২০ দিন
নিম	জুন-জুলাই	জুন-জুলাই	৭-১০ দিন
কড়ই	জানুয়ারি-মার্চ	মার্চ-মে	৫-১৫ দিন
শাল	জুন-জুলাই	জুন-জুলাই	৪-১০ দিন
শিশু	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	১৫-২০ দিন
গামার	মে-জুন	মে-জুন	১০-২০ দিন

ভালোভাবে শুকিয়ে বেছে নিয়ে শিশু, মেহগনি, বাবলা, খেজুর ইত্যাদি বীজ বস্তাবন্দী করে সংরক্ষণ করা যায়। তবে পেয়ারা, কড়ই, কৃষ্ণচূড়া ও অন্যান্য ছোট আকারের বীজ বায়ু নিরোধক পাত্রে অথবা বস্তার মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করতে হয়। দীর্ঘ সময় বীজ সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ওষুধ মিশিয়ে বীজ সংরক্ষণ করা উত্তম। বীজ সংরক্ষণের নাম ও তারিখ লিখে প্রতিটি প্যাকেটে এঁটে দিতে হবে।

পলিব্যাগ

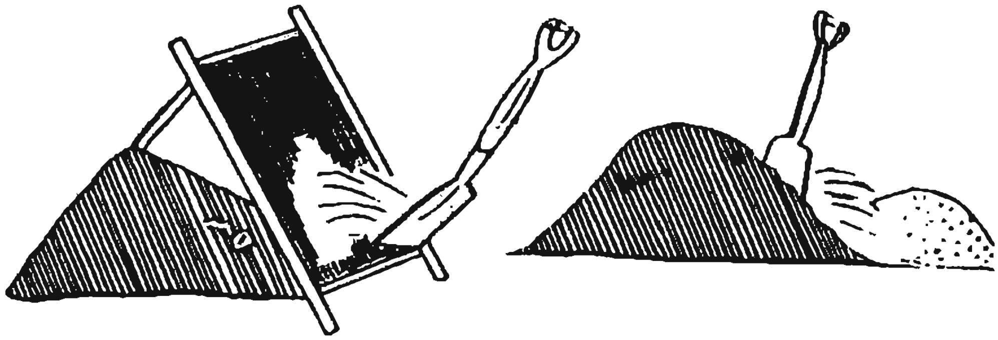
বীজতলায় সাধারণত ১৫ সেমি × ১০ সেমি (৬´´ × ৪´´), ২৫ সেমি × ১৫ সেমি (১০´´ × ৬´´) সাইজের পলিব্যাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতিটি পলিব্যাগের এক প্রান্ত খোলা এবং অপর প্রান্ত বন্ধ থাকবে। ছোট বড় সকল পলিথিন ব্যাগের নিচে ও পাশে ৮-১২ টি ছিদ্র রাখতে হবে যাতে করে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যায়।

মাটি

দোআঁশ মাটি ও পলিমাটি নার্সারির জন্য ভালো। পলিব্যাগে ভরার জন্য দোআঁশ মাটিই সবচেয়ে উপযোগী। সাধারণত বনাঞ্চলের উপরের মাটি পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের জন্য উত্তম। লতা-পাতা পচে বনাঞ্চলের উপরিভাগের মাটি উর্বর হয়। বনাঞ্চলের মাটি পাওয়া না গেলে যেখানে ঝোপঝাড় আছে সেখান থেকে মাটি সংগ্রহ করতে হবে।

মাটি শোধন

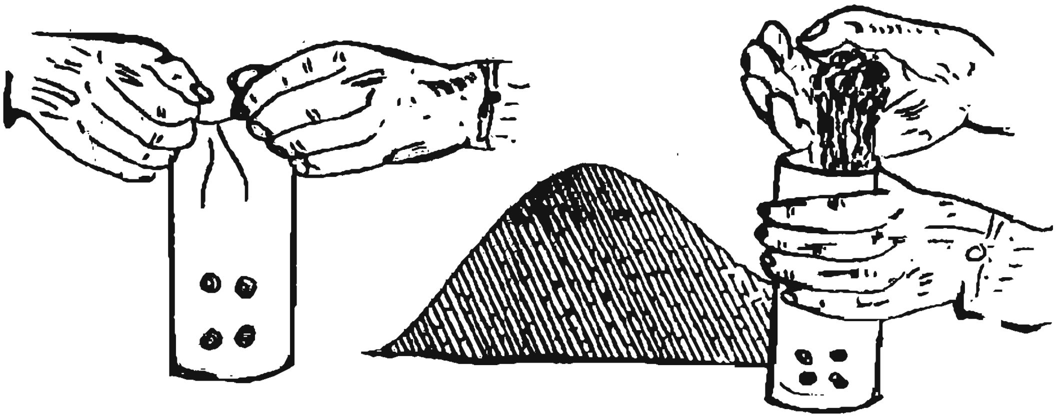
কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে অঙ্কুরোদগম ট্রেতে ব্যবহারের মাটি শোধন করে নিতে হবে। এতে সদ্য অঙ্কুরিত চারা রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাপ দিয়ে অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়; যেমন- ফরমালিন দিয়ে মাটি শোধন করা যায়।



পলিব্যাগের জন্য মাটি তৈরি

মাটি তৈরি

পলিব্যাগে ভরার জন্য সংগৃহীত তিন ভাগ মাটির সাথে এক ভাগ গোবর বা কমপোস্ট সার ভালোভাবে মেশাতে হবে। মাটির গুণাগুণ অনুসারে প্রয়োজন মতো টিএসপি ও এমপি সার মেশানো যেতে পারে। এরপর মিশ্রিত মাটি কমপক্ষে ১৫ দিন ছায়াযুক্ত স্থানে বা চালা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এরপর মাটি কেটে ঝুরঝুরে করে চালনি দিয়ে চেলে পলিব্যাগে ভরার উপযোগী করতে হবে।



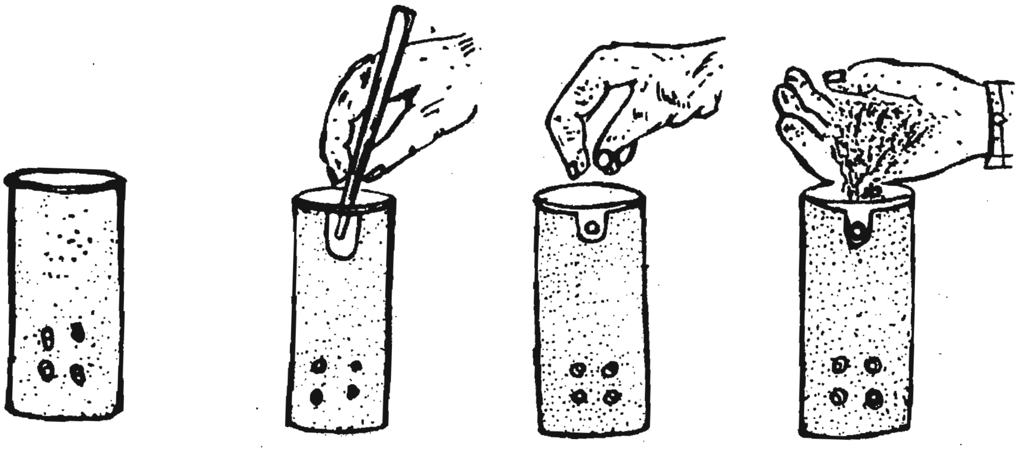
পলিব্যাগের মাটি ভর্তিকরণ

পলিব্যাগে মাটি ভর্তিকরণ

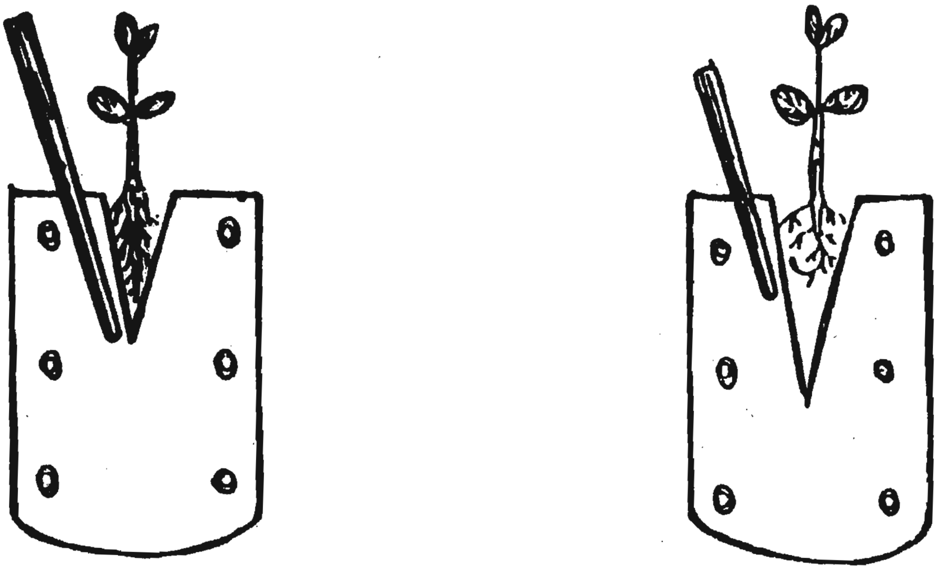
ছিদ্রযুক্ত পলিব্যাগে মাটি ভর্তি করতে হবে। পলিব্যাগ ছেঁড়া-ফাড়া হলে চলবে না। বাম হাতে পলিব্যাগ ধরে ডান হাতে আস্তে আস্তে মাটির মিশ্রণ পলিব্যাগে ঢালতে হবে। ব্যাগ ভর্তি হলে হাত বা বাঁশের নল দিয়ে চাপ দিতে হবে। তারপর পলিব্যাগের উপরিভাগ দুই হাত দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে ২/৩ বার ঝাঁকুনি দিতে হবে। তারপর পলিব্যাগে পুনঃ মাটি ভরে ব্যাগটি কানায় কানায় ভর্তি করতে হবে। পলিব্যাগে যথাযথভাবে মাটি না ভরলে চারা দুর্বল ও আঁকাবাঁকা হয়।

পলিব্যাগ বেডে সাজানো

মাটি ভর্তি করার পর পলিব্যাগ বেডে বসাতে হয়। পলিব্যাগ বেডে রাখার আগে বেডের মাটি ভালোভাবে দুরমুজ করে সমান করতে হবে। তারপর পলিব্যাগ বেডের উপরে সোজাভাবে রাখতে হবে। যে কোনো একপাশ হতে বেডে ব্যাগ সাজানো শুরু করতে হবে। একটি পলিব্যাগের সাথে আরেকটি আঁটসাট করে রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই যাতে পলিব্যাগ বাঁকা বা হেলানোভাবে সাজানো না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। বাঁকা পলিব্যাগে চারা বাঁকা ও দুর্বল হয়।



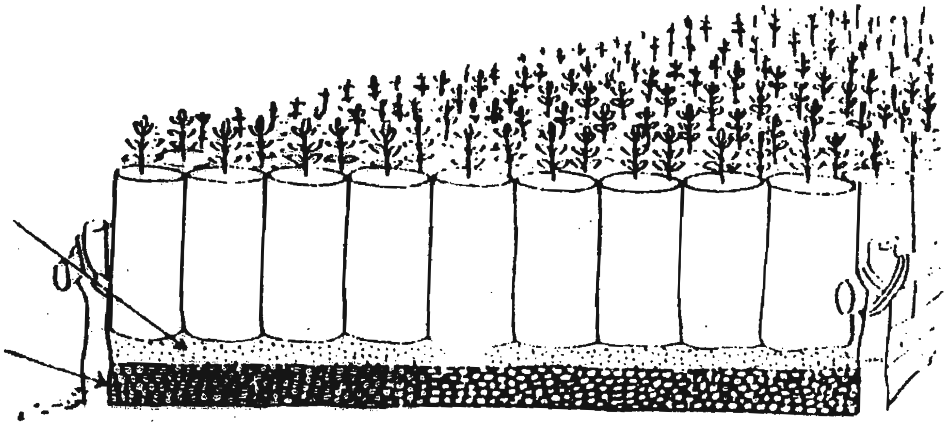
পলিব্যাগে বীজ রোপণ



সঠিক পদ্ধতি

ভুল পদ্ধতি

পলিব্যাগে চারা রোপণ



নার্সারি বেডে পলিব্যাগ সাজানো

পলিব্যাগে বীজ বপন বা চারা রোপণ

অপেক্ষাকৃত বড় বীজ হাতে ধরা যায়। সেগুলো সাধারণত প্রতি পলিব্যাগে ২টি করে বীজ সরাসরি বপন করা হয়; যেমন- কড়ই, রেইন্ট্রি, মেহগনি, শাল, গর্জন ও দেবদারু ইত্যাদি বপনের পর কোনো পলিব্যাগে বীজ অঙ্কুরিত না হলে অন্য ব্যাগে একাধিক চারা থাকলে তা থেকে চারা স্থানান্তর করে পলিব্যাগে চারা রোপণের জন্য অঙ্কুরোদগম বেড বা ট্রেতে বীজ বপন করতে হয়। অঙ্কুরোদগম ট্রেতে বা বেডে বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়।

অঙ্কুরোদগম বেড বা ট্রেতে বীজ বপন

বীজ খুব ক্ষুদ্র হলে ট্রেতে বীজের অঙ্কুরোদগম করানো হয়। প্রথমে তলায় ছিদ্রযুক্ত ট্রেতে ২/৩ ভাঁজে খবরের কাগজ বা ছিদ্রযুক্ত পলিথিন শিট বা পরিষ্কার কাপড় বিছাতে হবে। এরপর কিছু ইটের গুঁড়া বা পাথর চূর্ণ দিতে হবে। তারপর বিশুদ্ধ বা শোধিত মাটির মিশ্রণ দিয়ে ট্রে ভর্তি করতে হবে। মাটি ভর্তি করার পর বিশুদ্ধ পানি ভর্তি পাত্রে ট্রেটি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে করে ট্রের তলায় ছিদ্র দিয়ে শোষণ প্রক্রিয়ায় পানি মাটি ভিজিয়ে দেয়। এরপর দ্বিগুণ পরিমাণ ছাই মিশ্রিত বীজ আস্তে আস্তে সমভাবে পাতলা করে ছিটিয়ে বপন করতে হয়। প্রয়োজন অনুসারে সতর্কতার সাথে পানি সিঞ্চন করতে হবে। পরে অঙ্কুরিত চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর করা হয়। ট্রেতে অঙ্কুরিত চারায় দুই জোড়া পাতা গজানোর পর তা সাবধানে স্থানান্তর করে পলিব্যাগে রোপণ করতে হবে। এই সময় ট্রের মাটি এবং পলিব্যাগের মাটি প্রয়োজনমতো ভিজিয়ে নিতে হবে।

সরাসরি মাটিতে বা বেডে চারা উৎপাদন

অনেক জাতের গাছের চারা সরাসরি বেডে রোপণ করা হয়। এ জন্য প্রথমে বেডের মাটি কুপিয়ে এবং সার মিশিয়ে বেড তৈরি করতে হয়। বীজ ছিটিয়ে বপন করা যায়। আবার সারি পদ্ধতিতেও বীজ বপন করা যায়। সারি পদ্ধতিতে বীজ বপন করাই ভালো। স্বল্পমেয়াদি প্রজাতির জন্য সারিতে বীজ হতে অপর বীজের দূরত্ব হবে ৫ সেমি এবং দীর্ঘমেয়াদির জন্য হবে ১০ সেমি। দ্বৈত সারিতে বীজ বপন উত্তম। একটি দ্বৈত সারি হতে অপরটি ২০ সেমি দূরত্বে হবে। এভাবে প্রতি বেডে ৪টি করে দ্বৈত সারি হবে।

কলম চারা উৎপাদন পদ্ধতি

অনেক গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন শাখা, কন্দ, পাতা, মূলের অংশ হতে চারা তৈরি করা যায়। একে অঙ্গজ বংশবিস্তার বলে। জোড় কলম, শাখা কলম, দাবা কলম ও চোখ কলম, গুটি কলম অঙ্গজ বংশবিস্তারের উদাহরণ।

আম, লিচু, সফেদা, ডালিম, কুল, লেবু ইত্যাদি ফলজ জাতীয় গাছে কলম চারা পদ্ধতি অবলম্বন কর হয়। সজিনা, মান্দার, শিমুল ও জিগা গাছের শাখা, কলম হিসেবে বসত বাড়িতে রোপণ করা হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামাঞ্চলে বাঁশ, বেত ও পাটি পাতা, কন্দ বা মোথা থেকে চাষ করা হচ্ছে। তবে এই পদ্ধতিতে খরচ বেশি এবং অনেক সময় প্রচুর সংখ্যক চারা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কলম তৈরি করে সাফল্যজনকভাবে স্বল্প ব্যয়ে বাঁশ চাষ করা শুরু হয়েছে। মোথার মাধ্যমে পাটি পাতা চাষ করা হচ্ছে।

চারার পরিচর্যা ও রোগবালাই দমন

বেডে বা পলিব্যাগে বীজ বপন বা চারা রোপণ করার পর যথাযথভাবে পরিচর্যা করা প্রয়োজন। সঠিকভাবে পরিচর্যা না করলে সুস্থ সবল ও নির্ধারিত সংখ্যক চারা পাওয়া যাবে না। নার্সারিতে চারায় যেসব পরিচর্যা করতে হয় তা হল-

১. শেড বা ছায়া প্রদান	৬. সার প্রয়োগ
২. মালচিং	৭. শিকড় ছাঁটাইকরণ
৩. পানি সেচ	৮. শ্রেণীবিন্যাস
৪. আগাছা পরিষ্কার	৯. রোগ বালাই দমন
৫. পাতলাকরণ	১০. চারা শক্তকরণ।

শেড বা ছায়া প্রদান

অনেক প্রজাতির চারা গজানোর পর সেগুলো রোদ সহ্য করতে পারে না। ছায়া বা আচ্ছাদন সদ্য অঙ্কুরিত চারাকে অতিরিক্ত রোদ ও তাপ হতে রক্ষা করে। মাটির রস সংরক্ষণে সহায়তা করে। সেগুন ও গামার চারায় কোনো আচ্ছাদন দরকার হয় না। সাধারণত খড়, ছন, বাঁশের তরজা, চাটাই দিয়ে চালা তৈরি করা হয়। চালা বেড হতে প্রায় ১ মিটার উচ্চতায় বাঁশ, কাঠ বা লোহার ফ্রেমের উপর স্থাপন করা হয়। বেড পূর্ব-পশ্চিম দিকে লম্বা হলে চালা দক্ষিণ দিকে একটু হেলিয়ে স্থাপন করতে হবে।

মালচিং

আবর্জনা, আধপচা কমপোস্ট, খড়, ছন, পাতা ইত্যাদি দিয়ে বেড ঢেকে দেওয়াকে মালচিং বলে। মালচিং মাটির রস সংরক্ষণে সহায়তা করে। মাটির তাপ রক্ষা করে। নারিকেল, সুপারি, আমড়া, মেহগনি ইত্যাদি চারা উৎপাদনে মালচিং ব্যবহার করা হয়। মালচিং দিলে পানি সেচ কম লাগে, চারা গজানোর হার বেশি হয়।

পানিসেচ

পলিব্যাগে বীজ বা চারা রোপণের পর নিয়মিত পানিসেচ দেওয়া আবশ্যক। প্রথম অবস্থায় ঝাঁঝরির সাহায্যে হালকা পানিসেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। পানিসেচ দিলে অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। তবে অতিরিক্ত পানিসেচ দিয়ে মাটি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেলে বীজ পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বর্ষা মৌসুমে নিয়মিত বৃষ্টি হলে পনিসেচের প্রয়োজন হয় না। পানিসেচ সকালে ও বিকেলে দিতে হবে।

আগাছা পরিষ্কার

নার্সারি বেডে ও পলিব্যাগে চারার গোড়ায় যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। চারার সাথে আগাছা, পানি ও খাদ্যের প্রতিযোগিতা করে চারা বড়, সতেজ ও সবল হতে দেয় না। তাছাড়া চারার রোগ বালাইয়ের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। তাই নিয়মিত নার্সারির আগাছা পরিষ্কার করা দরকার। আগাছা ছোট থাকতেই তা পরিষ্কার করা উত্তম। মাটি শক্ত থাকলে আগাছা পরিষ্কার করার আগে বেডে পানিসেচ দিতে হবে।

চারা পাতলাকরণ ও স্থানান্তর

একটি পলিব্যাগে একের অধিক চারা থাকা ঠিক নয়। এতে চারার বৃদ্ধি কম হয়। তাই একের অধিক চারা থাকলে একটি সুস্থ সতেজ চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। চারা তোলার পূর্বে পলিব্যাগের মাটি ভিজিয়ে নেওয়া উচিত। বেডে চারা ঘন থাকলে সেক্ষেত্রে সুস্থ, সবল, বলিষ্ঠ চারা রেখে দুর্বল চারা তুলে ফেলতে হবে। কোনো অংশে চারা পাতলা থাকলে সে স্থানে পূরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চারা তোলার আগে বেডের মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। চারা তোলা ও স্থানান্তরের কাজ বিকেলে কিংবা মেঘলা দিনে করা উত্তম।

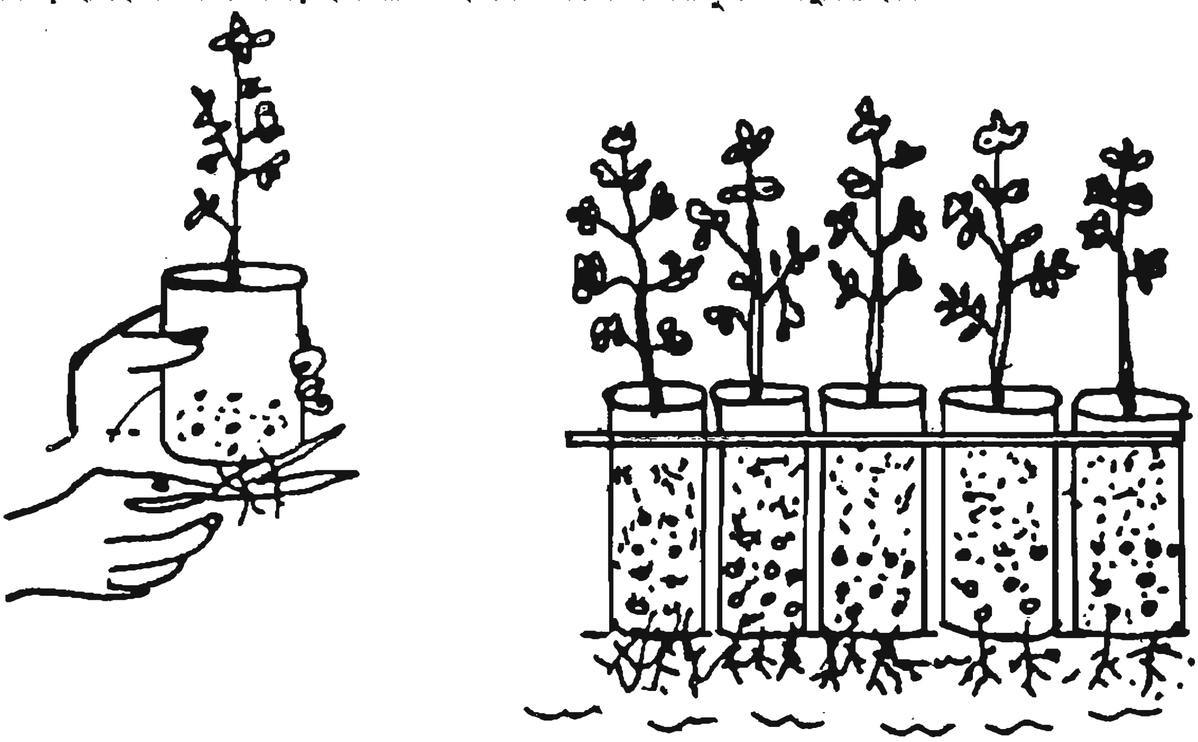
সার প্রয়োগ

নার্সারিতে চারার বৃদ্ধির জন্য পানিসেচ ও আগাছা পরিষ্কার করার সাথে সাথে পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করা দরকার। এতে চারা সবল থাকে, বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং রোগবালাই কম হয়। সার ১ঃ২ অনুপাতে পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করা ভালো। প্রতি ১২ মিটার × ১ মিটার বীজতলায় ১৫-২০ কেজি শুকনো গোবর বা কমপোস্ট গুঁড়া, ইউরিয়া ২২০ গ্রাম, টিএসপি ১২০ গ্রাম এবং এমপি ১৬০ গ্রাম ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ঝাঁঝরি দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সার প্রয়োগের পর হালকা পানিসেচ দিতে হবে।

শিকড় ছাঁটাই ও চারা শ্রেণীকরণ

চারার শিকড় পলিব্যাগ ভেদ করে বেরিয়ে গেলে সময়মতো তা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিতে হবে। শিকড় ছাঁটাই করার পর চারার উচ্চতা অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস করে চারা পুনরায় সাজাতে হয়।

শিকড় ছাঁটাই না করলে তা বড় হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে। ফলে চারা তুলতে অসুবিধা হয়।



শিকড় ছাঁটাইকরণ

চারা শক্তকরণ

বীজ তলায় চারা বেশ যত্ন ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। তাই চারা রোপণের পর নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খেতে না পারলে চারা মরে যেতে পারে ও চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। তাই রোপণের মাস খানেক আগে থেকেই নার্সারিতে চারা যাতে কিছুটা শক্ত এবং কষ্টসহিষ্ণু হতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হয়। একে শক্তকরণ বলে।

নিম্নলিখিত উপায়ে চারা শক্ত করা হয়।

১. পলিব্যাগ স্থানান্তর করে ছায়ায় ৪/৫ দিন রেখে দিতে হবে।

২. পরে নার্সারির চারার উপর থেকে ক্রমান্বয়ে আচ্ছাদন সরিয়ে প্রথম দিনে কম রোদ ও পরে পূর্ণ দিনের রোদে রাখতে হবে।

৩. চারার উচ্চতা অনুযায়ী চারাকে বিন্যাস করে সাজাতে হবে।

৪. পলিব্যাগের বাইরের শিকড় ছাঁটাই করতে হবে।

রোগবালাই দমন

নার্সারিতে ছত্রাকজনিত রোগবালাই দুভাবে দমন করা যেতে পারে। এগুলো হল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। ছত্রাকজনিত রোগের মধ্যে চারার গোড়া পচে যাওয়া একটি সাধারণ রোগ। চারা গজানোর এক থেকে দুই মাসের মধ্যে অনেক চারার গোড়া পচে গিয়ে চারা মরে যায়। ইউক্যালিপটাস, মেহগনি, কড়ই, গর্জন, সেগুন ইত্যাদি প্রজাতির চারায় কমবেশি এ রোগ হয়ে থাকে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বীজ ও মাটি শোধন করা। চারা রোগাক্রান্ত হলে বিভিন্ন ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। ছত্রাকনাশকের মধ্যে কুপ্রাভিট, ডাইথেন এম-৪৫, বোর্দোমিক্সচার অন্যতম।

নার্সারিতে কীটপতঙ্গ দ্বারা অনেক সময় চারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। কীটপতঙ্গ দ্বারা প্রাথমিক পর্যায়ে চারার ডগা ও কচি পাতা আক্রান্ত হয়। আক্রমণ কম হলে আক্রান্ত চারার পাতা কিংবা চারা তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। নার্সারিতে সাধারণত ডায়াজিনন ৫০ ইসি, নগস ১০০ ইসি, ডায়েলড্রিন ৪০ ইসি, সুমিথিয়ন ৫০ ইসি, হেপ্টাক্লোর ৪০ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চারা পরিবহণ

চারা সঠিক ও সতর্কতার সাথে মাঠে পরিবহণ করা প্রয়োজন। চারার কাণ্ড, শিকড় কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে ও শুকিয়ে গেলে জমিতে রোপণের পর বাঁচানো যায় না। তাই নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করে মাঠ পর্যায়ে সতর্কতার সাথে দ্রুত পরিবহণ করা প্রয়োজন। পলিব্যাগে চারা পরিবহণে অসুবিধা কম হয়। তবে কোনো কোনো সময় চারার গোড়ায় অল্প মাটিসহ বা উন্মুক্ত অবস্থায় পরিবহণ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে কেবল স্বল্প দূরত্বের স্থানে চারা স্থানান্তর করা হয়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ বৃক্ষের বীজ পরিচিতি

উপকরণ

কড়ই, মেহগনি, নিম, কাঁঠাল, অর্জুন, জারুল, শাল, শিশু, আকাশমনি, নাগেশ্বর, দেবদারু, ইপিল-ইপিল, চম্পা, পিতরাজ ইউক্যালিপটাস, কদম, শিমুল ইত্যাদির বীজ।

কাজের ধাপ

১. বীজের নমুনা পর্যবেক্ষণ কর ও নাম লেখ।
২. আকার আকৃতি, রং পর্যবেক্ষণ নোটবুকে লিপিবদ্ধ ও চিত্রাঙ্কন কর।
৩. কোন গাছের বীজ কোন সময় পাকে তা লেখ।
৪. কোন বীজ কোন সময় রোপণ করতে হয় তা লেখ।

বিষয় ঃ বীজ বপন

উপকরণ

বীজ, দোআঁশ মাটি, গোবর/কমপোস্ট, ১৫ সেমি × ১০ সেমি আকারের পলিব্যাগ, পানি দেওয়ার ঝাঁঝরি।

কাজের ধাপ

১. মাটিকে ভেঙে ঝুরঝুরে করে নাও।
২. তিন ভাগ মাটির সাথে এক ভাগ পরিমাণ গোবর বা কমপোস্ট সার ভালোভাবে মিশ্রিত কর।
৩. পলিব্যাগে তলাসহ দু'সারিতে ৮টি ছিদ্র কর।
৪. পলিব্যাগে মাটি ভর্তি কর। পলিব্যাগ ঝাঁকুনি দিয়ে এমনভাবে মাটি পূর্ণ কর যেন মাটি ভর্তি পলিব্যাগে কোনো ভাঁজ না পড়ে।
৫. সমতল ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে পলিব্যাগগুলোকে খাড়াভাবে সারিবদ্ধ করে সাজাও।
৬. মাটি ভর্তি পলিব্যাগের উপরে আঙুল দ্বারা দুটি ছোট গর্ত কর।
৭. প্রতিটি গর্তে একটি করে বীজ দাও।
৮. ভালোভাবে গুঁড়া মাটি দ্বারা বীজ ঢেকে দাও।
৯. ঝাঁঝরি দিয়ে হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে দাও।
১০. বীজ বপনের তারিখ খাতায় লিখে রাখ।
১১. প্রতিদিন সকাল বিকাল ঝাঁঝরি দিয়ে পরিমিত পরিমাণ পানি পলিব্যাগে দাও।
১২. অঙ্কুরোদগম শুরুর তারিখ খাতায় লিখে রাখ।
১৩. চারা ১৫ সেমি হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ কর।
১৪. পরীক্ষার যাবতীয় তথ্য খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নার্সারির মাটি শোধন করতে কোন রাসায়নিক দ্রব্যটি প্রয়োগ করা হয়?

ক. ম্যালাথিয়ন খ. ডায়াজিনন

গ. ফরমালিন ঘ. সুমিথিয়ন

২. নিম্নলিখিত উপায়ে চারা শক্তকরণ করা হয়-

i. চারার উপর থেকে আচ্ছাদন সরিয়ে কম রোদে রাখা

ii. চারার গোড়ায় একটি শক্ত কাঠি পুঁতে চারাকে বেঁধে রাখা

iii. পলিব্যাগের বাইরের শিকড় ছাঁটাই করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বর্গা চাষি সালামের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে। তাই তিনি তার বসতভিটায় গাছ লাগিয়ে ও পতিত পুকুরটিতে মাছ চাষ করে সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার চেষ্টা করেন। কয়েক বছরেই তিনি আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হন এবং সংসারে সুখ ফিরে আসে।

৩. সালামের বসতভিটায় ও পুকুর পাড়ে বৃক্ষ রোপণের জন্য কোন গুরুত্বটি অধিক?

ক. অর্থনৈতিক গুরুত্ব খ. পরিবেশগত গুরুত্ব

গ. জীব বৈচিত্র্যগত গুরুত্ব ঘ. চিত্ত বিনোদনগত গুরুত্ব

৪. সালামের বসত ভিটা ও পুকুর পাড়ের বৃক্ষ রোপণ হচ্ছে এক ধরনের-

i. প্রচলিত বনায়ন

ii. সামাজিক বনায়ন

iii. কৃত্রিম বনায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সামাজিক বনায়নে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাহমিদ তার বাসার দোতলাভবনের উত্তর পার্শ্বে বনজ নার্সারি তৈরির উদ্যোগ নেয়। সে পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের জন্য বেড তৈরী করে এবং নিম, মেহগনি ও শিশু গাছের চারা তৈরির কাজ শুরু করে। এক পর্যায়ে সে চারা উৎপাদনে আশানুরূপ সফলতা না পেয়ে তার বিদ্যালয়ের কৃষি বিষয়ের শিক্ষকের পরামর্শ নেয়। শিক্ষক নার্সারিটি পরিদর্শন করেন এবং তাহমিদকে কিছু পরামর্শ দেন। শিক্ষকের পরামর্শ মোতাবেক সে নতুন ভাবে পরিকল্পিত নার্সারি স্থাপনে মনোনিবেশ করে।

ক. বনজ নার্সারি কাকে বলে?

খ. পলিব্যাগ পদ্ধতিতে নার্সারি স্থাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

গ. তাহমিদের অভিজ্ঞতার আলোকে তুমি নার্সারি স্থাপনে কী ধরণের সতর্কতা গ্রহণ করবে, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "সামাজিক বনায়নের পূর্বশর্ত হল নার্সারি স্থাপন" বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বনায়ন

বন সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে সাধারণভাবে বনায়ন বলা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে সাথে দেশে বনজ সম্পদের চাহিদা বেড়েছে। বর্ধিত চাহিদা মেটাতে অধিক হারে কাঠ আহরণের ফলে প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই বনজ সম্পদের অভাব দূর করার জন্য এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনায়নের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।

১. বনায়ন পদ্ধতি

বনায়ন পদ্ধতিকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রচলিত বনায়ন
২. সামাজিক বনায়ন।

১. প্রচলিত বনায়ন

বৃক্ষ সম্পদ আহরণের সাথে সাথে বনায়ন কর্মসূচি চলে আসছে। অতীতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বন এলাকায় বনায়ন করা হয়। বাংলাদেশে ১৮৭৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের সেগুন বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বপ্রথম বনায়ন কর্মসূচি শুরু হয়। এসব বনায়নের মূল লক্ষ্য ছিল মূল্যবান বৃক্ষ উৎপাদন ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ। এর ফলে গ্রামীণ জনগণ এ বনায়নের সুফল হতে বঞ্চিত হত। ফলে তাদের চাহিদা মেটাতে তারা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বনজ সম্পদ আহরণ করে বনাঞ্চল নষ্ট করেছে। কৃষি জমির স্বল্পতা হেতু এসব বনাঞ্চলের বহু জমিকে কৃষি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। তাই বন সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃক্ষশূন্য ও আহরণকৃত ভূমিতে এবং উপকূলীয় নতুন চরাঞ্চলে বনায়ন করা হচ্ছে। এই বনায়ন কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার বনাঞ্চলে সেগুন, গর্জন, মেহগনি, গামার, ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি ইত্যাদি গাছের বাগান তৈরী করা হয়।

২. সামাজিক বনায়ন

বাংলাদেশে বন সুষমভাবে বিস্তৃত নয়। অধিকাংশ বনভূমিই দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। তাই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বনজ সম্পদ ভোগের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কাজেই গ্রামীণ এলাকার লোকজন তাদের বসতভিটার গাছ কেটে কাঠের চাহিদা মেটায়। এতে গ্রামীণ বন সম্পদ কমছে। বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও পরিবেশ রক্ষায় গ্রামীণ লোকজনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বসতভিটার আশপাশে, রাস্তার ধারে হাটবাজার কিংবা বাঁধের পাড়ে যে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয় তাকে সামাজিক বনায়ন বলা হয়।

সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্য

সামাজিক বনায়নের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

১. কাঠ, জ্বালানি কাঠ ও শিল্পের কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
২. কুটির শিল্পে কাঁচামালের যোগান ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করা।
৩. গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা।
৪. দারিদ্র্য দূর করা।
৫. পরিবেশের উন্নয়ন করা।
৬. ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার ও উৎপাদন নিশ্চিত করা।

বৃক্ষসম্পদ বাড়ানোর উপায়

নিম্নলিখিত উপায়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষসম্পদ বাড়ানো যায়।

১. বসতবাড়ির আশপাশে পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ করে।
২. পুকুর ও জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষরোপণ করে।
৩. সড়ক, রেলপথ, বাঁধ ও খালের ধারে বনায়ন করে।
৪. কৃষি বন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে।
৫. বনভূমিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন করে।

বাংলাদেশের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি

সত্তর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আশির দশকের গোড়ার দিকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে "কমিউনিটি ফরেস্ট্রি" প্রকল্পের অধীনে সামাজিক বনায়নের ব্যাপক কর্মসূচি শুরু হয়। বর্তমানে এ কর্মসূচি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলসহ সারাদেশে বিস্তৃত হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় দেশে গাছ লাগানো হচ্ছে। রাস্তা, রেলপথ ও বাঁধের ধারে বাগান করা হচ্ছে। এছাড়া বসতবাড়িতে, স্কুল, কলেজ, শিল্প কারখানা ও অফিস এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে অনেক গাছ লাগানো হচ্ছে।

৩. সামাজিক বনায়ন পরিকল্পনা

যে কোনো কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুচিন্তিত সুষ্ঠু ও কার্যকর পরিকল্পনা প্রয়োজন। বনায়নও এর ব্যতিক্রম নয়। সামাজিক বনায়ন পরিকল্পনাকে প্রধানত নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. স্থান নির্বাচন ও উপকারভোগী শনাক্তকরণ
২. প্রজাতি নির্বাচন
৩. জমি প্রস্তুতকরণ
৪. চারা রোপণ
৫. চারা পরিচর্যা
৬. আহরণ।

স্থান ও উপকারভোগী শনাক্তকরণ

বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে দেখতে হবে কোথায়, কী পরিমাণ বনায়নযোগ্য এলাকা রয়েছে। বনায়নযোগ্য এলাকা চিহ্নিত করার পর ঠিক করতে হবে কোন বছর, কোথায়, কী পরিমাণ জায়গা বনায়ন করা হবে, কারা উপকারভোগী হবে ইত্যাদি।

প্রজাতি নির্বাচন

সঠিক প্রজাতি নির্বাচনের ওপর বনায়নের সার্থকতা নির্ভর করে। প্রজাতি নির্বাচনের সময় প্রধানত দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

১. যেখানে বর্ষার পানি ওঠে এবং মরে যায় এরূপ গাছ; যেমন- কাঁঠাল, শাল, সেগুন, গামার গাছ লাগানো যাবে না।
২. উৎপাদিত বৃক্ষের ব্যবহার অর্থাৎ কী উদ্দেশ্যে উৎপাদিত বন সম্পদ ব্যবহার করা হবে। যেমন- বৈদ্যুতিক বা গৃহ নির্মাণের খুঁটি, জ্বালানি ও আসবাবপত্রের কাঠ অথবা কুটির শিল্পের কাঁচামাল।

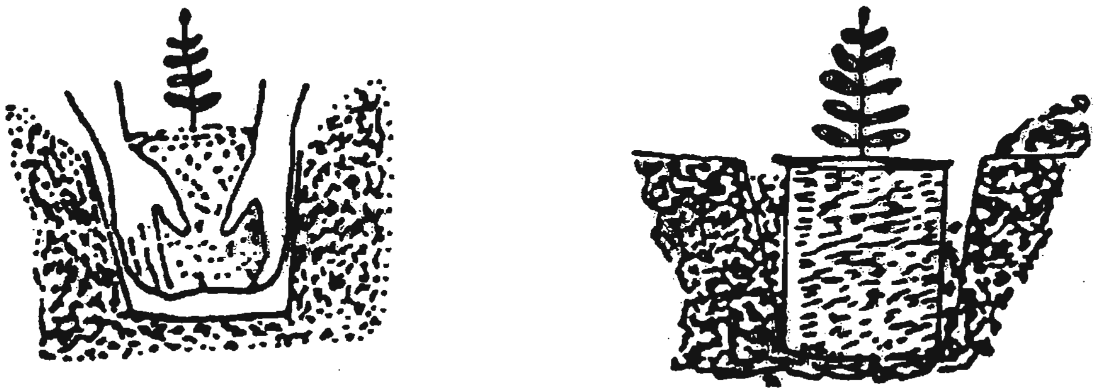
জমি প্রস্তুতকরণ

সাধারণত বর্ষার প্রারম্ভেই গাছের চারা লাগানো হয়। কিন্তু চারা লাগানোর পূর্বে জমি প্রস্তুত করা দরকার বলতে বোঝায়, যে স্থানে চারা লাগানো হবে সে স্থান পরিষ্কার করে চিহ্নিত করতে হবে।

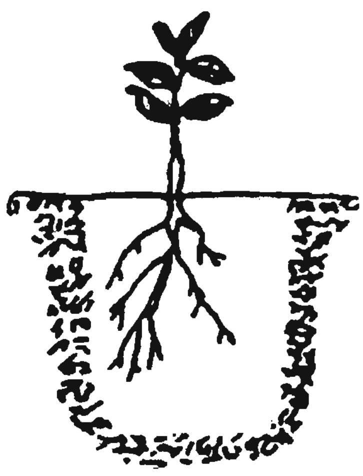
সড়ক, রেল লাইন এবং বাঁধের ধারে বনায়নের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেগুলো অনুসরণ করতে হবে।

চারা রোপণ

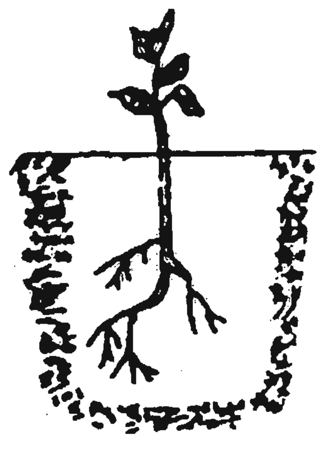
প্রজাতি ভেদে চারা থেকে চারার দূরত্ব কম বেশি হতে পারে। তবে বাগান এলাকায় ২ মিটার দূরত্বে চারা লাগানো হয়। গর্তের আকার, বৃক্ষের প্রজাতি ও চারার আকারের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত এক বছরের ও তার নিচের বয়সের চারার জন্য (৫০ × ৫০ × ৫০) ঘন সেমি গর্ত করা হয়। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পূর্বেই নির্বাচিত স্থানে গর্ত করে গর্তের উপরের মাটি এক পাশে ও নিচের মাটি আরেক পাশে রাখতে হবে। চারা রোপণের কমপক্ষে ১৫ দিন আগে গর্তের উপরের মাটির সাথে ৫ কেজি গোবর সার বা কমপোস্ট সার, ২০ গ্রাম টিএসপি ও এমপি সার প্রথমে গর্তে ফেলতে হবে। পরে গর্তের নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভরতে হবে। চারা লাগানোর পূর্বে গর্তের মাটি ভালোভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করতে হবে। পলিব্যাগের আকার অনুযায়ী গর্তের মাঝখানে মাটি সরিয়ে জায়গা করে নিতে হবে। চারা রোপণের আগে ব্লেড বা চাকু দিয়ে পলিব্যাগ কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে। চারা পাত্রে থাকলে পাত্র ভেঙে ফেলে চারা লাগাতে হবে। এরপর চারা সোজা করে গর্তে এমনভাবে বসাতে হবে যেন চারার গোড়া গর্তের উপরিভাগের মাটির সমতলে থাকে। এরপর চারার চার পাশের খালি জায়গা মাটি দিয়ে ভর্তি করে দিতে হবে। গর্তের মাটি চেপে শক্ত করে দিতে হবে। চারার গোড়ায় খুঁটি পুঁতে এর সাথে চারাকে হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে। চারা রোপণের পর পরই ঝাঁঝরির সাহায্যে চারায় পানি সেচ দেওয়া আবশ্যক।



রোপণ করা গর্তে চারা বসানো হচ্ছে



সঠিক পদ্ধতি



ভুল পদ্ধতি

চারা রোপণ পদ্ধতি

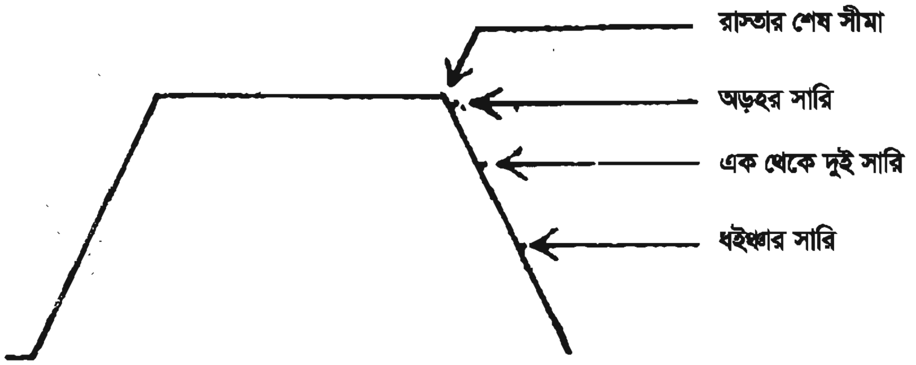
সড়ক, রেলপথ ও বাঁধের ধারে বনায়ন

সড়ক, রেলপথ ও বাঁধের ধারে বনায়ন বা গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম পালন করতে হয়। সাধারণত রাস্তা/বাঁধের কিনারা থেকে ৩০ সেমি দূরে অড়হড়ের ঘন সারি দিতে হবে। অড়হরের সারির ১৮০ সেমি দূরে গাছের প্রথম সারি এবং একই দূরত্বে দ্বিতীয় সারি চারা লাগিয়ে ৩০ সেমি দূরে ধইঞ্চার বীজ বপন করতে হয়। এভাবে জায়গা থাকলে সারির সংখ্যা বাড়ানো যায়।

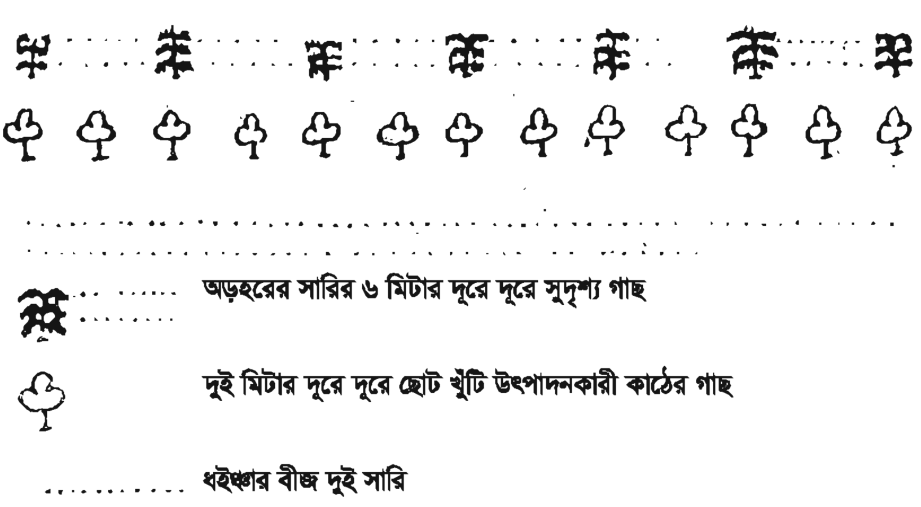
চারা পরিচর্যা

চারা রোপণের পর গাছের নিম্নলিখিত পরিচর্যা করা প্রয়োজন।

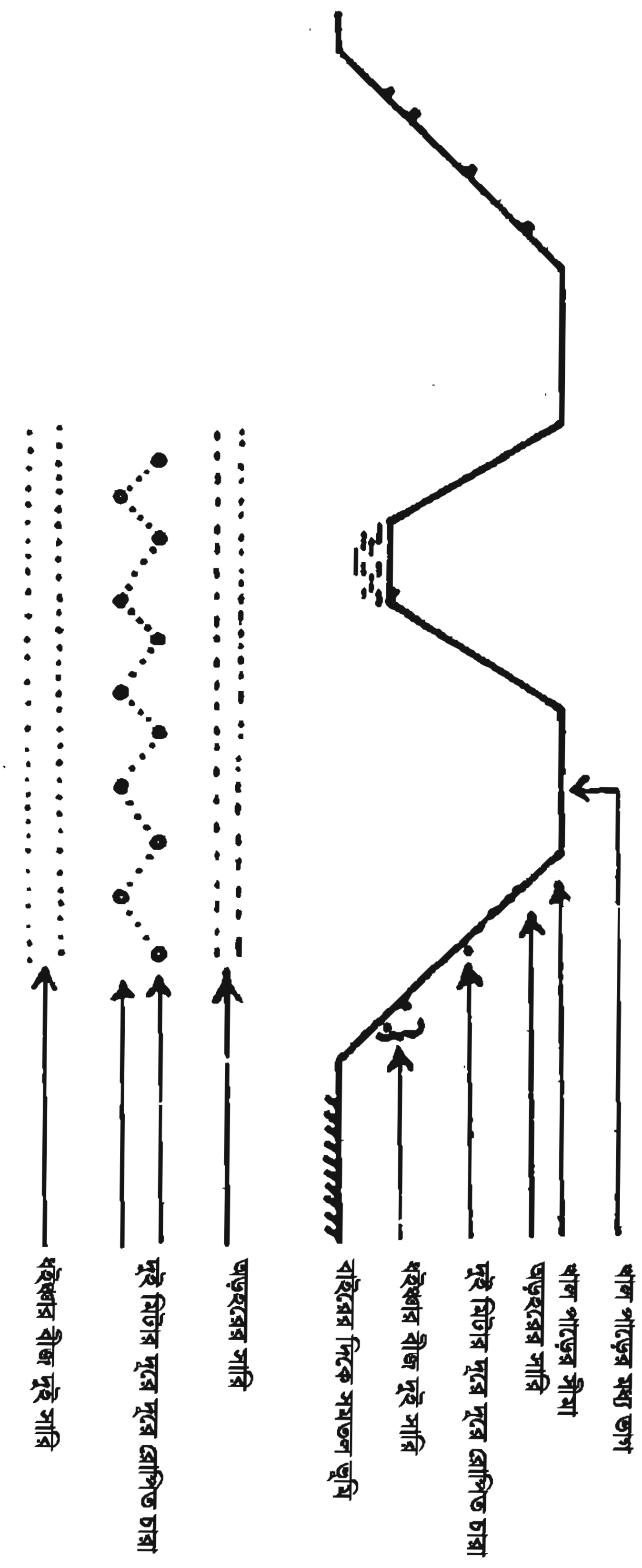
১. চারা লাগানোর পর গর্তটিকে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে একদিন অন্তর অন্তর চারার গোড়ার পানি দিতে হবে।
২. মাঝে মাঝে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।
৩. চারা মারা গেলে শূন্যস্থান পূরণ করে দিতে হবে।
৪. গরু-ছাগলের কবল থেকে চারাকে রক্ষা করার জন্য বেড়া দিতে হবে।
৫. রাস্তা বা বাঁধের ধারে রোপণকৃত চারার সারির ওপরের দিকে অড়হড়ের সারি এবং নিচের দিকে ধইঞ্চার সারি দেওয়া যেতে পারে।



গাছ লাগানোর স্থান নির্বাচন



রাস্তার পাশে অড়হর ও ধইঞ্চার রোপণ



রাস্তার পাশে বনায়নের নকশা

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ সড়ক ও বাঁধ বনায়ন পরিকল্পনা তৈরি।

উপকরণ

ম্যাপ, চার্ট, খাতা, পেন্সিল, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. খাতায় একটি সড়কের ক্রস সেকশন আঁক।
২. সড়কের ঢালের কোথায় অড়হড়ের লাইন হবে দেখাও।
৩. অড়হড়ের লাইন হতে চারার প্রথম সারির অবস্থান নকশায় দেখাও।
৪. চারার দ্বিতীয় সারির অবস্থান নকশায় দেখাও।
৫. নকশায় ধইঞ্চার সারির অবস্থান দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বনায়ন পদ্ধতিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

২. বনায়ন কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি কোনটি?

ক. ভূমি উন্নয়ন খ. উন্নত চারা উৎপাদন
গ. রোপণকৃত চারার পরিচর্যা ঘ. কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ

৩. সামাজিক বনায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটি -

i. ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার ও উৎপাদন নিশ্চিত করে
ii. গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে
iii. জীব বৈচিত্র্য ও চিত্ত বিনোদনে সহায়ক হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

রহিম সাহেব বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার একজন বাসিন্দা। "বেশি করে গাছ লাগান- পরিবেশ বাঁচান" লেখা একটি পোস্টার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বন কর্মকর্তার সাথে দেখা করে জানতে পারেন আমাদের বনাঞ্চলসমূহ বিস্তৃত নয়। বিভিন্নভাবে আমাদের বন ধ্বংস হচ্ছে। বন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বন সৃষ্টির কার্যক্রমের বিকল্প নেই। পরবর্তীতে রহিম সাহেব বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থানীয় জনগণকে নিয়ে সামাজিক বনায়নের আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ক. বন বলতে কী বোঝায়?
খ. সামাজিক বনায়নের একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
গ. রহিম সাহেব উপকূলীয় এলাকায় কীভাবে সামাজিক বন গড়ে তুলতে পারেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. পোস্টারটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃক্ষ কর্তন ও সংরক্ষণ

বনজ ফসল আহরণ তথা বৃক্ষ কর্তন নির্ভর করে বনায়নের উদ্দেশ্যের ওপর। জ্বালানি কাঠ, পাল্প উড ও খুঁটির জন্য বনায়ন করা হলে দ্রুত বর্ধনশীল গাছ লাগানো হয়ে থাকে। এ গাছ ১০-১২ বছর পর কাটা হয়। যদি নির্মাণ কাঠ বা আসবাবপত্রের কাঠের জন্য গাছ লাগানো হয় তবে প্রজাতি ভেদে ৩০-৪০ বছর পর কাটা হয়। তবে বৃক্ষ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। কোনো বনে বা এলাকায় বছরে যতটুকু কাঠ বৃদ্ধি পায় সব সময়ই তার চেয়ে কম কাঠ আহরণ করতে হবে। একেই সংরক্ষণ বলা হয়। বনজ সম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কারণ, ইচ্ছা করলেই রাতারাতি বনজ সম্পদের মজুদ সৃষ্টি করা যায় না।

বাঁশের ক্ষেত্রে ৩ বছর বয়সের বাঁশ আহরণ করা হয়ে থাকে। বাঁশ বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের মাধ্যমে ঝাড়ের আকার ধারণ করে। ঝাড় সাধারণত বাইরের দিকে বাড়ে। তাই পুরাতন বাঁশগুলো ঝাড়ের ভেতরে এবং কচি বাঁশগুলো ঝাড়ের বাইরের দিকে থাকে। বাঁশ আহরণের সময় ঝাড়ের একদিকে দু'একটা বাঁশ কেটে জায়গা করে ভেতরের পরিপক্ব বাঁশ প্রথমে কাটা উচিত।

গাছ ও বাঁশ বিজ্ঞানসম্মতভাবে কর্তন এবং খণ্ডনের মাধ্যমে অনেক অপচয় রোধ করা যায়। আর ব্যবহারের আগে বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিলে এগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। গাছ কাটার নিয়ম এবং কাঠ ও বাঁশ সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

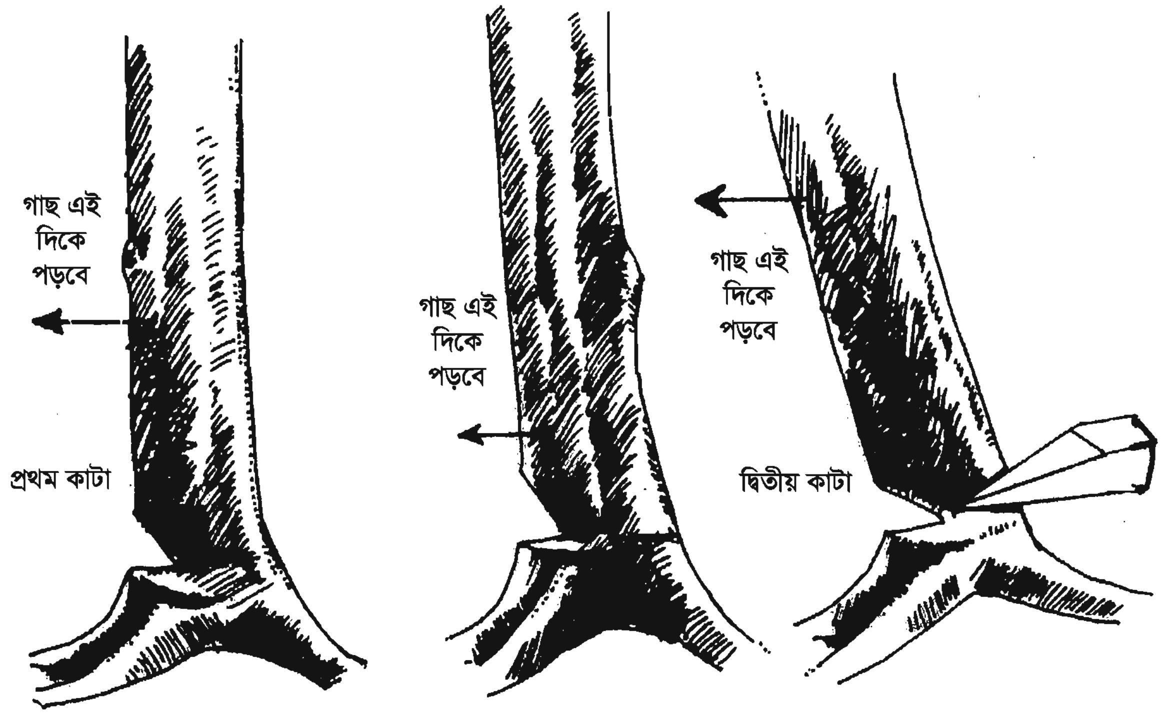
১. গাছ কাটার নিয়ম

অপরিকল্পিত এবং আনাড়িভাবে গাছ কাটলে কাঠের অনেক অপচয় হয়। বিশেষ করে যে সব গাছ কাঠ বা খুঁটির জন্য লাগানো হয় সে গাছ কর্তনের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে। ভালো কাঠের জন্য একটি গাছকে ৩০-৪০ বছর বাঁচিয়ে রাখতে হয়। খুঁটির জন্য একটি গাছকে ১৮-২০ বছর বাঁচিয়ে রাখতে হয়। অপরিকল্পিত ও আনাড়িভাবে কাটার জন্য গাছ ভেঙে যেতে পারে কিংবা গোড়ার অংশে ফাটল দেখা দিতে পারে। শুধু কর্তনের সময়কার ভুলের জন্য এত বছরের উৎপাদিত সম্পদ এক মুহূর্তে বিনষ্ট হতে পারে।

করাত দিয়ে কাটলে কাঠের অপচয় অনেক কমে যায়। তাই মূল্যবান কাঠের অপচয়রোধে গাছ কর্তনের যথাযথ কলাকৌশল জানা এবং সঠিক কর্তন যন্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন।

বসতবাড়ির আঙিনায় যে গাছটি কাটা হবে সেটির আশপাশে ঘর থাকতে পারে কিংবা অন্যান্য গাছ কিংবা বাগান থাকতে পারে। গাছটি কাটার পর তা এসবের উপর পড়লে ঘর, বাগান বা অন্যান্য গাছের ক্ষতি হতে পারে। কোনো খাদের মধ্যে পড়লে গাছটি পরবর্তীতে খাদ থেকে উঠানোর ঝামেলায় পড়তে হয়। অন্যদিকে রাস্তা/বাঁধের ধারের গাছ কাটার পর রাস্তা/বাঁধের উপর পড়লে রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। গাছ কাটার সঠিক কায়দা জানা থাকলে গাছটিকে নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোনো দিকে ফেলা যায়।

গাছটি যতটা সম্ভব মাটির কাছাকাছি কাটতে হবে। কারণ গাছের গোড়ার অংশটা বেশি মোটা এবং কাঠের মানও ভালো থাকে। ফলে একটু উঁচুতে কাটলে ভালো কাঠের অপচয় হয়। গাছ সব সময় করাত দিয়ে কাটতে হবে।



গাছ কাটার নিয়ম

কাটার জন্য নির্বাচিত গাছটির চার ধার প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর গাছটি ফেলার দিক ঠিক করতে হবে। মোটামুটি সমতল ও ফাঁকা জায়গায় গাছটি ফেলতে হবে। ঢালু জায়গায় হলে গাছটি ঢালের আড়াআড়ি উপরের দিকে ফেলতে হবে। এরপর যে দিকে গাছটি ফেলতে হবে সে দিকে করাত ও কুড়ালের সাহায্যে প্রথমে কেটে নিতে হবে।

প্রথমে গাছের ব্যাসের দুই-তৃতীয়াংশ গভীর পর্যন্ত সমান্তরালভাবে কাটতে হবে। তারপর কুড়াল দিয়ে এর ১৫-২০ সেমি উপর থেকে প্রথম কাটা পর্যন্ত তেরসা করে কাটতে হবে।

এরপর প্রথম কর্তনের ঠিক উল্টো দিক থেকে দ্বিতীয় কর্তন দিতে হবে। এ দ্বিতীয় কর্তন প্রথম কর্তন থেকে ১২-১৫ সেমি উপর থেকে দিতে হবে এবং তা কাটতে কাটতে প্রথম কর্তনের প্রায় উপরে নিয়ে আসতে হবে। এরপর দ্বিতীয় কর্তনের দিক থেকে খিলের সাহায্যে চাপ দিয়ে গাছ প্রথম কর্তনের দিকে ফেলতে হয়।

এই প্রথম কর্তন এবং দ্বিতীয় কর্তন কৌশল গ্রহণ করে গাছ কাটা হলে সুবিধামতো দিকে গাছকে ফেলা যায়।

২। গোলকাঠ ও চিরাই কাঠ/তক্তা

গাছ কাটার পর পরিবহণ ও চিরাইয়ের সুবিধার জন্য একে প্রয়োজনমতো খন্ড করা হয়। গোল কাঠের এ ধরনের খন্ডকে গোলকাঠ বা লগ বলা হয়। সাধারণত 'ক্রস কাটা করাত' দিয়ে কাটা গাছ খন্ড খন্ড করা হয়। গোলকাঠ বা লগকে পরে প্রয়োজনমতো ব্যবহার উপযোগী করে চেরাই করা হয়। চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব থাকে। চেরাই কাঠের প্রস্থ ১৫ সেমি-এর বেশি হলে এবং পুরুত্ব ৪ সেমি হলে তাকে সাধারণত তক্তা বলা হয়।

গোলকাঠের পরিমাপ

গোলকাঠের বা লগের সঠিক আয়তন বা ভলিউম নিউটনের সূত্রের সাহায্যে বের করতে হয়।

সূত্রটি এরূপ :

$$ভলিউম = ০.০৮ \times \frac{বেড় ১ + (৪ \times বেড় ২) + বেড় ৩}{৬} \times দৈর্ঘ্য$$

এখানে, বেড় ১ = চিকন প্রান্তের বেড়
বেড় ২ = লগের মাঝখানের বেড়
বেড় ৩ = মোটা প্রান্তের বেড়

উদাহরণ : একটি গর্জন গাছের লগ ৬ মিটার দীর্ঘ। এটির চিকন মাথার বেড় ১.৫০ মিটার, মাঝখানের বেড় ২.০ মিটার এবং মোটা মাথার বেড় ২.৫ মিটার। লগটির সঠিক আয়তন বা ভলিউম কত?

সমাধান : $$ভলিউম = ০.০৮ \times \frac{বেড় ১ + (৪ \times বেড় ২) + বেড় ৩}{৬} \times দৈর্ঘ্য$$

$$= ০.০৮ \times \frac{(১.৫ + ৪ \times ২) + ২.৫}{৬} \times ৬ \text{ ঘনমিটার}$$

$$= ০.০৮ \times \frac{১২}{৬} \times ৬ \text{ ঘনমিটার}$$

$$ভলিউম = ০.৯৬ \text{ ঘনমিটার}$$

ব্যবহার উপযোগী কাঠের পরিমাপ

গোলকাঠ চেরাইকালে কিছুটা অপচয় হয়। সবটুকু কাঠই ব্যবহার উপযোগী করা যায় না। গোলকাঠ থেকে কী পরিমাণ ব্যবহার উপযোগী কাঠ পাওয়া যায় তা হপ্পাস এর সূত্রের সাহায্যে বের করা হয়।

সূত্রটি এরূপ :

$$ভলিউম = \left(\frac{লগের মাঝের বেড়}{৪}\right)^২ \times দৈর্ঘ্য$$

তক্তা বা চেরাই কাঠের ভলিউম মাপা সহজ। চেরাই কাঠ/তক্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পুরুত্ব জানা থাকলে অতি সহজেই এর ভলিউম বের করা যায়। একটি পরিমাপ ফিতার সাহায্যে অতি সহজেই এক খড চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব মাপা যায়। তারপর নিম্নের সূত্রের সাহায্যে ভলিউম নির্ণয় করা যাবে।

ভলিউম = দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পুরুত্ব ফুটে মাপা হলে ভলিউম হবে ঘনফুটে আর মিটারে মাপা হলে ভলিউম হবে ঘনমিটারে।

কাঠ ও বাঁশ সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট

কাঠ বাঁশের প্রদান শত্রু উঁই পোকা, ঘুন পোকা, ছুতার পোকা ও ছত্রাক। কাঠ ও বাঁশ সিজনিং ও ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এর পচন এবং ক্ষয় রোধ করা যায়। এতে কাঠ ও বাঁশের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

কাঠ সিজনিং বা মৌসুমি জাতকরণ

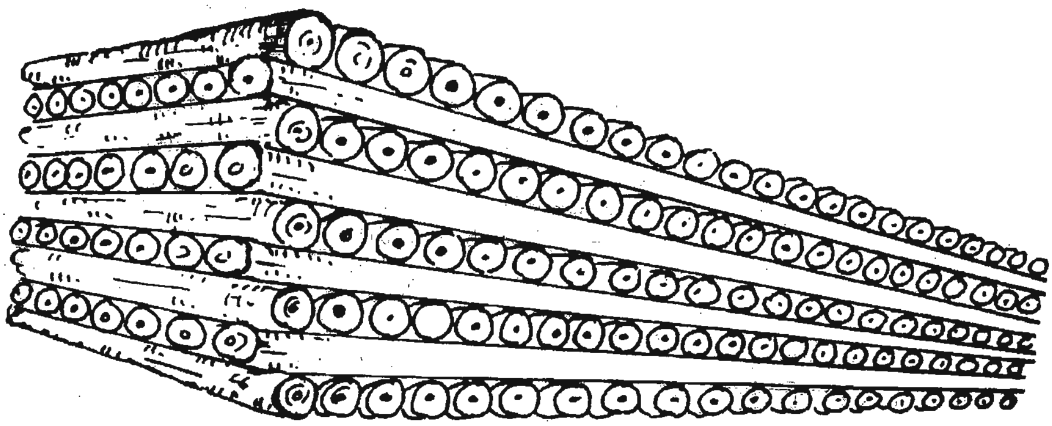
কাঠ সিজনিং-এর প্রকৃত অর্থ কাঠের আর্দ্রতা কমানো বা নির্দিষ্ট মাত্রায় কাঠ শুকানো। কাঠ নির্দিষ্ট মাত্রায় শুকালে এর আর্দ্রতা কমে। ফলে পোকা ও ছত্রাকের আক্রমণ হ্রাস পায় এবং কাঠ দীর্ঘস্থায়ী হয়। কাঠ সিজনিং এর দুটি পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত।

ক. এয়ার ড্রাইং

খ. কিল্ন ড্রাইং।

এয়ার ড্রাইং

খোলা বাতাসে কাঠ শুকানোকে এয়ার ড্রাইং বলা হয়। তবে হালকা পাতলা চেরাই কাঠ প্রখর রোদে শুকালে কাঠ ফেটে যেতে পারে কিংবা বেঁকে যেতে পারে। তাই এগুলো মাটি থেকে ৩০-৪০ সেমি উঁচুতে ছায়ায় স্তরে স্তরে শুকাতে হয়। এমনভাবে সাজাতে হবে যেন প্রতিটি টুকরার চারপাশে সমভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে। কাঠের ফালি এলোমেলো বা বাঁকা করে সাজানো যাবে না। তাহলে কাঠ বেঁকে যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে কাঠ সিজনিং এর বেশ সময় লাগে। কমপক্ষে একটি শুষ্ক মৌসুম লাগে।



এয়ার ড্রায়িং পদ্ধতি

কিল্ন ড্রাইং

কিল্ন হল একটি বিশেষ ধরনের কক্ষ বা চেম্বার। এর মধ্যে তাপমাত্রা, জলীয় বাষ্প এবং কিল্নে সাজানো কাঠের মধ্যে দিয়ে বায়ু প্রবাহকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিল্নের তাপমাত্র ৩০° সে. থেকে ১২৫° সে.এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। জ্বালানি কাঠ বা তেল পুড়িয়ে কিল্নে তাপ সৃষ্টি করা হয়। কিল্নের মুখ দিয়ে বাইরের বাতাস বা জলীয় বাষ্প প্রবেশ করিয়ে ভেতরের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিল্নে কাঠ সিজনিং করতে সাধারণত ৩০-৪৫ দিন আগে।

কিল্ন ড্রাইং-এর সুবিধা

১. কাঠ থেকে ইচ্ছামতো পরিমাণ আর্দ্রতা কমানো যায়।
২. সময় কম লাগে।
৩. সিজনিং ত্রুটি কম থাকে।

কাঠ ট্রিটমেন্ট বা সংরক্ষণ

সিজনিং করা কাঠ আসবাবপত্র তৈরিতে এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যায়। তবে সরাসরি পানি কিংবা মাটির সংস্পর্শে এলে সাধারণ সিজনিং করা কাঠের স্থায়িত্ব কমে যায়। কারণ পানি ও মাটির সংস্পর্শে এসে পানি শোষণ করায় কাঠের আর্দ্রতা বাড়ে। ফলে কাঠ সহজেই ছত্রাক, পোকা বা কীট দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই পানি বা মাটির সংস্পর্শে আসে এরূপ স্থানে ব্যবহার করতে হলে কাঠ ট্রিটমেন্ট করে নেওয়া ভালো। কাঠ ও বাঁশ ট্রিটমেন্টের মূলনীতি হল দ্রবণাকারে রাসায়নিক দ্রব্য বা সংরক্ষণী, কাঠ বা বাঁশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। সি সি এ নামের সংরক্ষণীটি আমাদের দেশে বেশি ব্যবহৃত হয়। সি সি এ সংরক্ষণীটি ৩টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ক্রোমিক অক্সাইড ৪৭.৫%, কপার অক্সাইড ১৮.৫%, আরসেনিক পেন্টা অক্সাইড ৩৪.০%, সি সি এ-এর মিশ্রণ বাজারে পাওয়া যায়। উপাদানগুলো পৃথক পৃথকভাবে কিনে ও আনুপাতিক হারে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা যায়। পানিতে মিশ্রণটির ২.৫% দ্রবণ তৈরি করা হয়। দ্রবণটি বিশেষ চাপ পদ্ধতিতে কাঠের মধ্যে ঢুকানো হয়। সংরক্ষণী দ্রব্য কাঠের গভীরে প্রবেশ করাতে হবে। এতে প্রতি ঘনফুট কাঠে সাধারণভাবে ০.৪ পাউন্ড সংরক্ষণী প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়।

সি সি এ সংরক্ষণী দিয়ে সংরক্ষিত কাঠ পচন প্রতিরোধ করতে পারে। তাছাড়া উঁইপোকার আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম। ট্রিটেড বা সংরক্ষিত কাঠ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৩টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

১. কাঠ সংরক্ষণের ৭ দিন পর ব্যবহারযোগ্য হবে।
২. সংরক্ষিত কাঠ ব্যবহারের আগে শুকিয়ে নিতে হবে।
৩. সংরক্ষণের পর কোনো ছুতার কাজ করা যাবে না।

বাঁশ সংরক্ষণ

পানি ও মাটির সংস্পর্শে বাঁশ সচরাচর দুই বছরের বেশি টিকে না। ছত্রাক ও কিছু কীটপতঙ্গ বাঁশ পচন ও নষ্ট করার জন্য দায়ী। সংরক্ষণী ব্যবহার করে এদের থেকে রক্ষা করে বাঁশ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। এতে ব্যবহারকারীকে বারবার বাঁশ বদলিয়ে খরচের সম্মুখীন হতে হয় না। ফলে বাঁশের অপচয় হ্রাস পায়।

বাঁশ সংরক্ষণ বা ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি

আগের দিনে ব্যবহারের পূর্বে পানিতে ভিজিয়ে রেখে বাঁশ সংরক্ষণ করা হত। এই পদ্ধতিকে পাইন্যাট বলা হয়। এতে ঘুন পোকার আক্রমণ থেকে বাঁশ কিছুটা রক্ষা পায়। তবে ছত্রাক, উঁইপোকা ও নোনা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় না। বর্তমানে এদেশে বাঁশ সংরক্ষণের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থায় বাঁশের মধ্যে ছত্রাক ও পোকা প্রতিরোধক রাসায়নিক দ্রব্য দ্রবণাকারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সিসিবি নামের রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বর্তমানে বহুল প্রচলিত।

উপাদান	অনুপাত
কপার সালফেট	২ ভাগ
সোডিয়াম ডাইক্রোমেট	২ ভাগ
বরিক এসিড	১ ভাগ

সিসিবি এর উপাদানগুলো নিম্নরূপ।

ক. প্রাণরস বিচ্যুতিকরণ পদ্ধতি
খ. চুবানো পদ্ধতি।

প্রাণরস বিচ্যুতিকরণ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে বাঁশের ভেতরের প্রাণরস সিসিবি এর ২০% দ্রবণ দ্বারা বিচ্যুত করা হয়। ২ কেজি সি সি বি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ২০% দ্রবণ তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রবণকে সদ্য কাটা বাঁশের ভেতরে ঢুকিয়ে প্রাণরস সরিয়ে দেওয়া হয় এবং উক্ত জায়গা সি সি বি দ্রবণে পূর্ণ হয়।

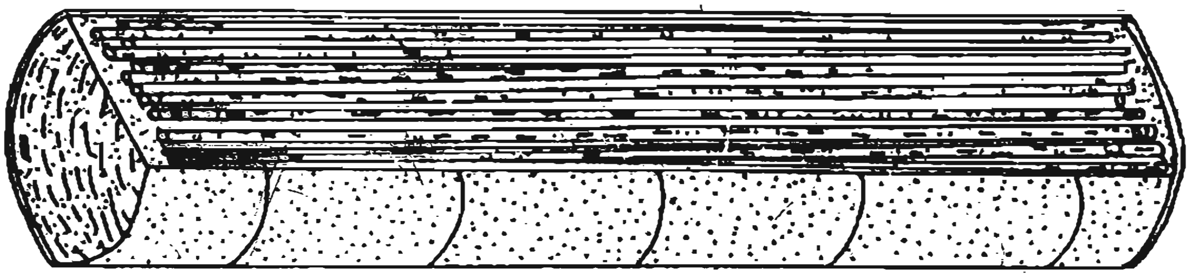


প্রাণরস বিচ্যুতিকরণ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় আকারের চৌবাচ্চায় ১০% সি সি বি দ্রবণ প্রয়োজনমতো ঢেলে তাতে সংরক্ষণীয় বস্তুটি ডুবিয়ে রাখতে হবে। কোন দ্রব্য কত দিন ডুবিয়ে রাখতে হবে নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

দ্রব্য	চুবিয়ে রাখার সময়
খড বাঁশ	২-৩ সপ্তাহ
বাঁশের বেড়া ইত্যাদি	১ দিন
ছন	১২ ঘন্টা
কাঠ	২-৪ দিন

ছন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পাতলা দ্রবণ ৩-৪% ব্যবহার করা যায়।



চুবানো পদ্ধতি

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ গোল কাঠ/তক্তার পরিমাপ

উপকরণ

ফিতা, গাছের গুঁড়ি বা তক্তা, খাতা ও পেন্সিল।

কাজের ধাপ

১. একটি গাছের গুঁড়ির নিকটে যাও।
২. ফিতা দিয়ে গুঁড়িটির দৈর্ঘ্য মাপ ও খাতায় লেখ।
৩. গুঁড়ির মাঝখানের বেড় মাপ ও খাতায় লেখ।
৪. হুম্পাসের সূত্রের সাহায্যে গুঁড়ির আয়তন নির্ণয় কর।

বিষয় ঃ বাঁশ ট্রিটমেন্ট

উপকরণ

বাঁশ, রাসায়নিক দ্রব্য বা সংরক্ষণী, পাম্প বা চাপ যন্ত্র, পাত্র, পানি, দা ও কুড়াল।

কাজের ধাপ

১. দ্রবণ তৈরি করো।
২. একটি বাঁশঝাড়ের কাছে যাও
৩. একটি বাঁশ কাট এবং ঝাড় থেকে বাইরে আন।
৪. বাঁশের গোড়া সমান করে কাট এবং আগা কাট।
৫. চাপ যন্ত্রটি বাঁশের গোড়ার সাথে শক্তভাবে আটকাও।
৬. চাপ যন্ত্রে দ্রবণ ঢাল।
৭. চাপ প্রয়োগ কর।
৮. বাঁশের আগা দিয়ে তরল বের হয় কিনা লক্ষ কর।
৯. দ্রবণ বের হলে চাপ প্রয়োগ বন্ধ কর ও যন্ত্রটি খুলে ফেল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৃক্ষ নিধনে পরিবেশের প্রধানত কোন ধরনের ক্ষতি হয়?

ক. ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায় খ. বায়ুতে অক্সিজেন কমে যায়
গ. বৃষ্টিপাত কমে যায় ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পায়

২. যে ক্ষেত্রে বৃক্ষ কর্তন পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেনা-

i. জ্বালানি কাঠের প্রয়োজনে বৃক্ষ কর্তন
ii. গাছের বয়স বেশি হলে নতুন বনায়নের জন্য বৃক্ষ কর্তন
iii. আসবাব পত্র তৈরির জন্য বৃক্ষ কর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গরিব চাষি বাবর মিয়ার বাড়িতে ২০ বছরের পূর্বে রোপণকৃত কাঠাল গাছগুলো মেয়ের বিয়ের খরচ মেটানোর জন্য কাটার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক্ষেত্রে তিনি উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে সঠিক নিয়মে গাছগুলো কেটে ন্যায্য মূল্য পেলেন।

৩. কৃষি কর্মকর্তা কাঠের অপচয় রোধে পরামর্শ দিয়েছিলেন-

i. সঠিক কর্তন যন্ত্র ব্যবহার করতে
ii. গাছগুলো মাটি থেকে একটু উঁচুতে কাটতে
iii. গাছ কাটার সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৪. গাছগুলো সমতল ও ফাঁকা জায়গায় সুবিধাজনক ভাবে ফেলার জন্য বাবর মিয়া গাছ কাটতে যে ধরনের কর্তন যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন-

i. দা
ii. কুড়াল
iii. করাত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বৃক্ষ সংরক্ষণের সি সি এ পদ্ধতি জানা থাকায় আজিজের ২৫ বছরের পুরানো সেগুন গাছটির কাঠ দিয়ে আজিজ মেয়ের বিয়ের বেশকিছু আসবাবপত্র সহজেই বানাতে সক্ষম হলো। সেগুন কাঠটির লগ ছিল ৫ মিটার দীর্ঘ। চিকন মাথার বেড় ২ মিটার, মাঝখানের বেড় ২.৫ মিটার এবং মোটা মাথার বেড় ৩ মিটার। গাছটির কাঠ দিয়ে মূল্যবান আসবাবপত্র তৈরির উদ্দেশ্যেই তিনি এতবছর গাছটির যত্ন করেছিলেন।

ক. কাঠ সিজনিং কী?
খ. কাঠ সংরক্ষণের মূলনীতিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. আজিজের সেগুন গাছের ভলিউম নির্ণয় কর।
ঘ. বাংলাদেশে সি সি এ পদ্ধতিতে কাঠ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। **অথবা**
ঘ. আজিজের সি সি এ পদ্ধতিতে কাঠ সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

মাছ চাষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশের জনগণের আমিষের অন্যতম উৎস মাছ। প্রাণিজ আমিষের শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ যোগান আসে মাছ থেকে। মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ ভাগের জীবিকার উৎস মৎস্য সম্পদ। বাংলাদেশের মাটি, পানি ও জলবায়ু মাছ চাষের জন্য উপযোগী। মৎস্য সম্পদ তাই একটি সম্ভাবনাময় ও উন্নয়নযোগ্য সম্পদ। সম্প্রতি বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মাছের উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ১২ লক্ষ টন। *২০০৬-২০০৭ সালে মাছের উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৪.৪০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং আশাব্যঞ্জকভাবে রপ্তানি বেড়েছে।

সামুদ্রিক ও বন্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন কমে গেছে। মুক্ত জলাশয় হতে আহরিত মাছের মধ্যে ইলিশের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ১০ বছরে দৈনিক মাথাপিছু মাছের প্রাপ্যতা ৩৩ গ্রাম থেকে কমে ২৭ গ্রামে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছের প্রাপ্যতা বেড়ে প্রায় ৪৬ গ্রামে দাঁড়িয়েছে। তবে মাছ গড়ে প্রয়োজন প্রায় ৫০ গ্রাম।

মৎস্য সম্পদের উৎস

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। জলাশয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী মৎস্য সম্পদের উৎসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

১. অভ্যন্তরীণ জলাশয়
২. সামুদ্রিক জলাশয়।

অভ্যন্তরীণ জলাশয়

সাধারণভাবে স্বাদু পানি এবং উপকূলীয় আধালোনা পানির জলাশয়কে অভ্যন্তরীণ জল সম্পদ বলা হয়। দেশে মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় *৪৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭০৬ হেক্টর জলাশয়ের আকার ও গঠন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ জল সম্পদকে ২ টি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

১. অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয়
২. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়।

১. অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয়

পাড় বা ভূমি দ্বারা বেষ্টিত নির্দিষ্ট আয়তনের স্বাদু পানির জলাশয়কে অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয় বলা হয়। পুকুর-দিঘি, বাঁওড় ও উপকূলীয় চিংড়ি খামার অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয়ের শ্রেণীভুক্ত। দেশে মোট অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় *৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৯০ হেক্টর। বন্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ করে মাছ উৎপাদন করা হয়। দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৩৯ শতাংশ আসে বন্ধ জলাশয় হতে।

২. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

স্বাদু পানির অপেক্ষাকৃত বড় আকারের জলাশয় যার সীমারেখা বা আয়তন পাড় দ্বারা বেষ্টিত থাকে না তাকে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় বলা হয়। নদ-নদী, বিল, কাপ্তাই হ্রদ এবং প্লাবন ভূমি এলাকায় অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ

---

* উৎস : বাংলাদেশ মৎস্য পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০৬-২০০৭

* প্রায় ৪০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩১৬ হেক্টর। মুক্ত জলাশয়ে সাধারণভাবে মাছ চাষ করা হয় না। এরূপ জলাশয় হতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছ আহরণ করা হয়। দেশে উৎপাদিত মোট মাছের প্রায় ৪১ শতাংশ আসে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে।

সামুদ্রিক জলাশয়

মোট উৎপাদিত মৎস্য সম্পদের প্রায় ২০ শতাংশ হল সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ। বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির বিপুল পরিমাণ মাছ ও চিংড়ি। যান্ত্রিক নৌকা ও ট্রলারের সাহায্যে সমুদ্র হতে মাছ আহরণ করা হয়।

মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণ

প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে এ উৎস থেকে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হল।

১. পলি পড়ে ভরাট হওয়ায় জলাশয়ের আয়তন সংকোচন
২. অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ও পানি সেচ
৩. নির্বিচারে পোনা বিনষ্ট করা ও ডিমওয়ালা মাছ ধরা
৪. শীত মৌসুমে বহু বিল ও নিচু অঞ্চল শুকিয়ে যাওয়া
৫. মৎস্য খেত কৃষি খেতে রূপান্তর
৬. মৎস্য প্রজনন ও চলাচলের স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্টকরণ
৭. কৃষি জমিতে নির্বিচারে কীটনাশক প্রয়োগ
৮. শিল্প বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপের ফলে পানি দূষণ
৯. অবৈধ জল ব্যবহার করে ছোট মাছ নিধন।

মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির কার্যক্রম

মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, বন্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ সম্প্রসারণ এবং আধালোনা পানিতে চিংড়ি চাষের প্রসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তা ছাড়া সমন্বিত মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমেও মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্ত জলাশয়

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় মৎস্য সম্পদের অন্যতম, গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দেশে মাছের মোট উৎপাদনের প্রায় ৪১ শতাংশ আসে মুক্ত জলাশয় থেকে। তাই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মুক্ত জলাশয়ে পরীক্ষামূলকভাবে পোনা ছাড়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সাথে সাথে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে।

১. অবৈধ জাল ব্যবহার ও নির্বিচারে ছোট মাছ ধরা বন্ধের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে।
২. নির্দিষ্ট জলাশয়ের ইজারা প্রথা বিলোপ করা হয়েছে। খাস বন্ধ জলাশয়ের রাজস্ব ভিত্তিক ইজারা প্রথার পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদি উৎপাদন পরিকল্পনা ভিত্তিক ইজারা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
৩. নির্দিষ্ট জলাশয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজনন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "অভয় আশ্রম" গঠন করা হয়েছে। এসব স্থানে যে কোনো প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বন্ধ জলাশয়

লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, অধিক সংখ্যক পুকুর চাষের আওতায় আনা এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে বন্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ

* উৎস : বাংলাদেশ মৎস্য পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০৬-২০০৭

কার্যক্রমের ফলে পুকুরে হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ ১০ টন পর্যন্ত রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যা খুবই আশাব্যঞ্জক। পুকুর-দিঘিতে গড় উৎপাদন ১.৫ টন থেকে ৩.০ টনে উন্নীত হয়েছে।

উপকূলীয় জলাশয়

বিগত ৪-৫ বছরে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছে। উপকূলীয় চিংড়ি চাষের জন্য এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, হ্যাচারি স্থাপন, চাষিদের প্রশিক্ষণ দান ও প্রদর্শনী খামার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সমন্বিত মৎস্য চাষ

সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ফলে সৃষ্ট জলাধার বা জলাশয়ে সমন্বিত মাছ চাষ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

এদেশের পুকুর, দিঘি, খাল, হাওর, বাঁওড় ও নদ-নদী একদা মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ না করে কেবল ধরে খাওয়া, নির্বিচারে পোনা মাছ মারা, ডিমওয়ালা মাছ ধরা, কারেন্ট জালের ব্যবহার, নলা মাছ ও জাটকা নিধন ইত্যাদির কারণে বর্তমানে দেশে মাছের প্রকট অভাব দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে যে পোনা মাছ ছাড়া হচ্ছে, যদি সেগুলোকে খাওয়া বা বিক্রির উপযোগী নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত বড় হওয়ার সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

এ কারণে ১৯৫০ সালে "মৎস্য সংরক্ষণ আইন" ১৯৫০ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে অধিকতর যুগোপযোগী করার জন্য ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৮৭, ১৯৮৮, এবং ১৯৯৫ সালে এই আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন, সংযোজন এবং পরিমার্জন করা হয়। এ আইনের প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

১. নদী-নালায় মাছের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত করা যাবে না।
২. বিস্ফোরক, বন্দুক ও ধনুক ব্যবহার করে মাছ শিকার বা আহরণ নিষিদ্ধ।
৩. পানিতে বিষ প্রয়োগ, কলকারখানার বর্জ্য নিক্ষেপ বা অন্য কোনো উপায়ে পানি দূষণ করে মাছের আবাসস্থল বা প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করা নিষিদ্ধ।
৪. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত আষাঢ়ের মাঝামাঝি হতে পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২৩ সেমি-এর চাইতে ছোট রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস এবং ঘনিয়া মাছ ধরা নিষিদ্ধ।
৫. প্রজনন মৌসুমে যে কোনো আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস ও ঘনিয়া মাছ ধরা নিষিদ্ধ।
৬. চৈত্রের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুক্ত জলাশয়ে শোল, গজার ও টাকি মাছের পোনা ধরা নিষিদ্ধ।
৭. জাটকা- নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত ধরা, পরিবহণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ।
৮. কারেন্ট জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ।
৯. এ আইন অমান্যকারীর কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন ছাড়াও মাছ চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কিত নিম্নরূপ আইন প্রচলিত আছে -

১. পুকুর উন্নয়ন আইন - ১৯৩৯
২. সামুদ্রিক মৎস্য আইন - ১৯৮৩
৩. মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা - ১৯৮৩
৪. চিংড়ি চাষ আইন - ১৯৯২
৫. জাতীয় মৎস্য নীতি- ১৯৯৮
৬. জাতীয় মৎস্য কৌশল

উল্লেখ্য যে, সরকার এসআরও নং ৪১ আইন/২০০৮, ২০/০২/০৮ইং প্রজ্ঞাপন বলে পিরানহা মাছ চাষ, বাজারজাতকরণ, আমদানি, পরিবহণ, বিক্রয়, আদান-প্রদান, প্রদর্শন ও নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখা নিষিদ্ধ করেছে।

মাছ পরিচিতি

মাছ পানিতে বসবাসকারী শীতল রক্তবিশিষ্ট একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী, যা স্বাভাবিকভাবে ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালনা করে এবং পাখনার সাহায্যে পানিতে চলাফেরা করে।

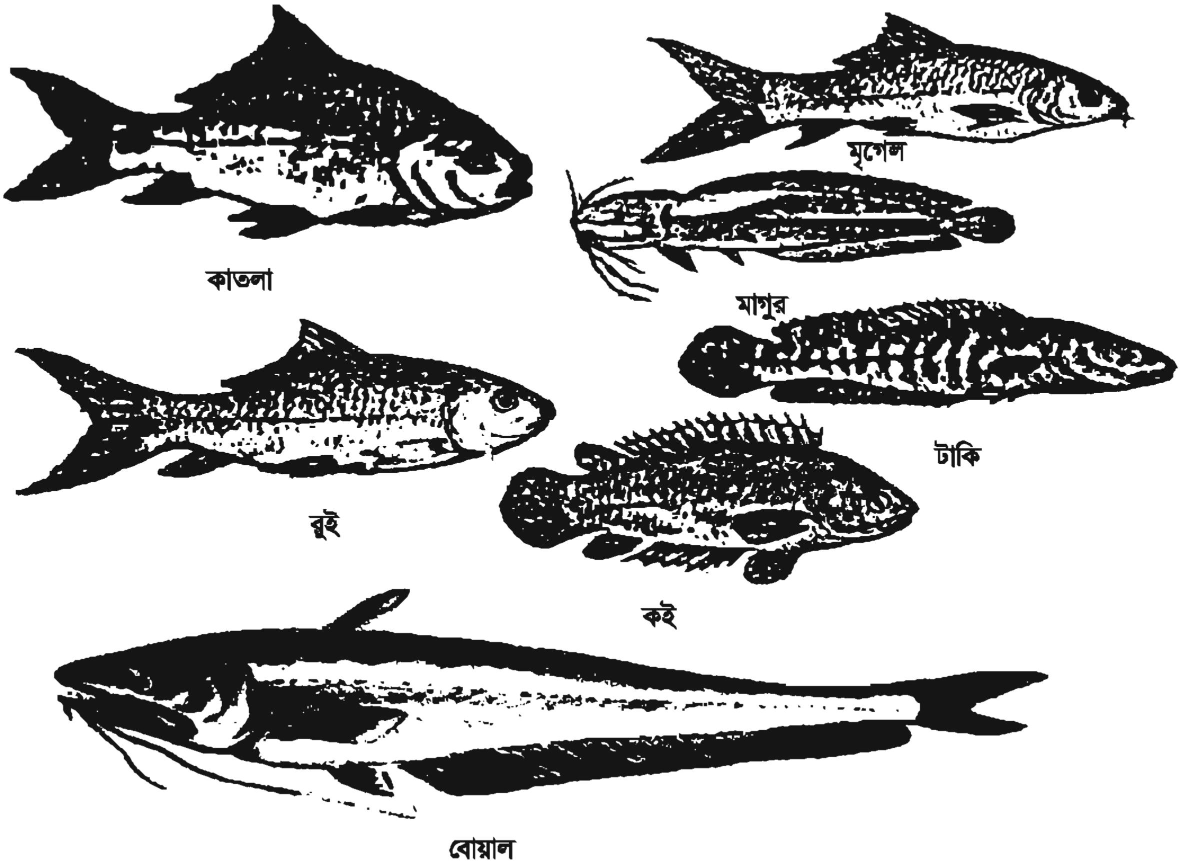
মাছের প্রকারভেদ

আবাসস্থল অনুসারে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে ৩ টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন-

১. স্বাদু পানির মাছ ২. আধালোনা পানির মাছ ও ৩. লোনা পানির মাছ

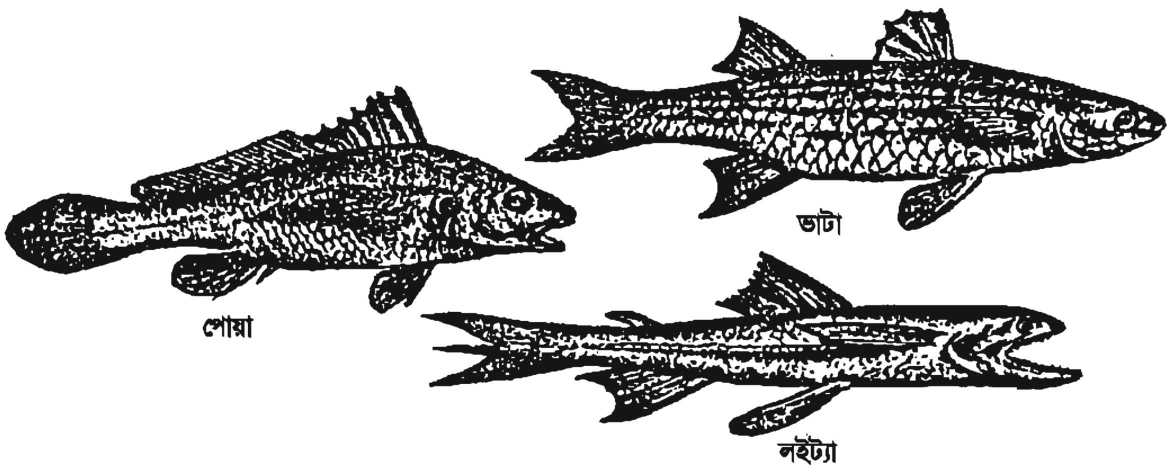
স্বাদু পানির মাছ

অভ্যন্তরীণ বন্ধ ও মুক্ত জলাশয়ে, অর্থাৎ পুকুর, নালা, নদী ও বিলের স্বাদু পানিতে যে সব মাছ বাস করে সেগুলোকে স্বাদু পানির মাছ বলা হয়। যেমন- রুই, কাতলা, শিং, মাগুর, পুঁটি, কই, টাকি ও বোয়াল।



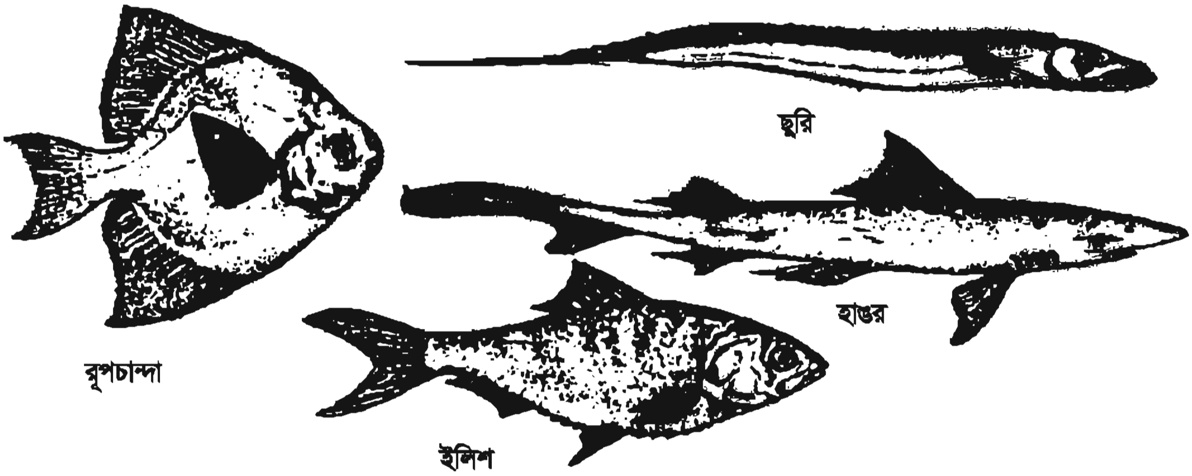
আধালোনা পানির মাছ

নদীর মোহনা ও খাড়ি অঞ্চলের পানি আধালোনা প্রকৃতির। এ অঞ্চলে যে সব মাছ পাওয়া যায় সেগুলোকে আধালোনা পানির মাছ বলে। যেমন- ভেটকি, পোয়া, লইট্যা ও কোরাল।



আধা লোনা পানির মাছ

বঙ্গোপসাগরে ও উপকূলীয় এলাকায় অর্থাৎ লোনা পানিতে যেসব মাছ বসবাস করে সেগুলোকে লোনা পানির মাছ বলে। যেমন - ইলিশ, রূপচান্দা, ছুরি, বেলে ও দাতিনা।



লোনা পানির মাছ

চাষযোগ্য মাছের বৈশিষ্ট্য

নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মাছ পুকুরে চাষের জন্য উপযোগী। যথা -

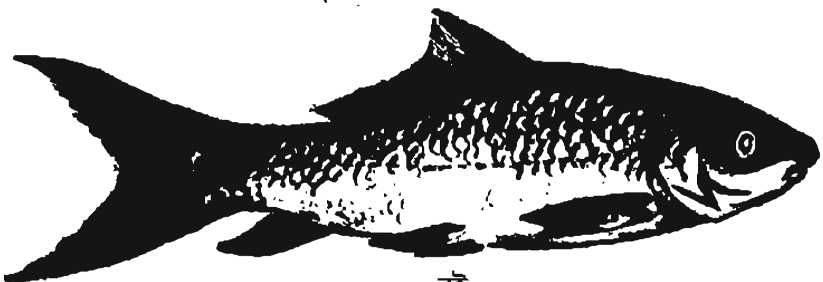
১. দ্রুত বর্ধনশীল
২. পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও খেতে সুস্বাদু
৩. বাজারে চাহিদা ও মূল্য বেশি
৪. সহজেই পোনা পাওয়া যায়
৫. মিশ্র চাষ করা যায়
৬. অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে
৭. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি
৮. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা যায়
৯. যে সব মাছ রাক্ষুসে স্বভাবের নয়
১০. সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে।

কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, কমন কার্প, গ্রাসকার্প ইত্যাদি চাষযোগ্য মাছ।

চাষ উপযোগী মাছ

রুই

রুই মাছ মূলত এ দেশের নদীর মাছ। তবে পুকুরে চাষের জন্য রুই মাছ অত্যন্ত উপযোগী। এটি একটি সুস্বাদু মাছ।



রুই

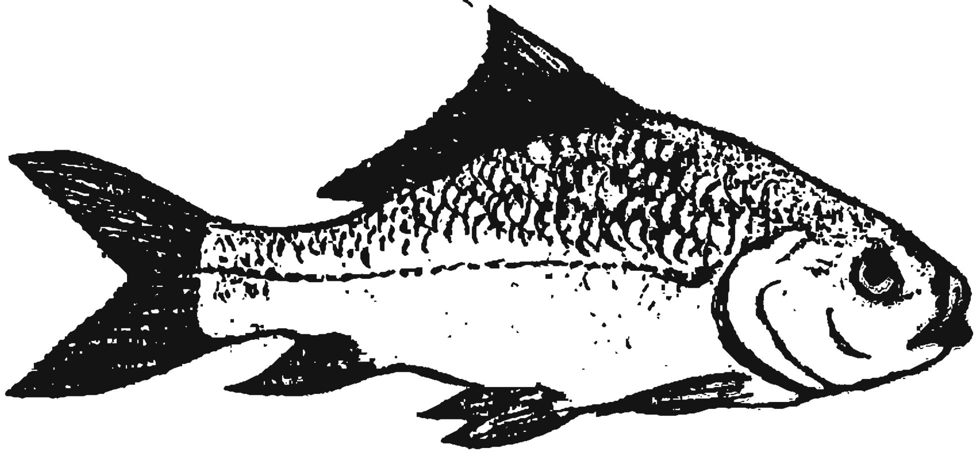
দৈহিক বৈশিষ্ট্য : রুই মাছের মাথা দেহের তুলনায় ছোট। পিঠের দিকের অংশ পেটের অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তল। ঠোঁট পুরু, খাঁজযুক্ত এবং ঠোঁটের অগ্রভাগে দুটি ছোট শুঁড় আছে।

খাদ্য ও খাদ্যাভাস : রুই মাছ পানির মধ্যস্তর থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। এ মাছ জীবকণাভোজী। পোনা অবস্থায় প্রাণিকণা এবং বড় হলে উদ্ভিদকণা, প্রাণিকণা ও পচা জৈব আবর্জনা খেয়ে থাকে।

পরিপক্বতা ও বংশবৃদ্ধি ঃ রুই মাছ দৈর্ঘ্যে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এ মাছ ৩ বছরে যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। অনুকূল আবহাওয়ায় বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত মুক্ত জলাশয়ে ডিম দেয়। কৃত্রিম উপায়েও এ মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়। বন্ধ পানিতে রুই মাছ ডিম ছাড়ে না। হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়।

কাতলা

কাতলা দ্রুত বর্ধনশীল এবং পুকুরে চাষোপযোগী মাছের মধ্যে অন্যতম। এর আদি আবাসস্থল এ দেশের মুক্ত জলাশয় ও নদী। এ দেশের হাওর বিল ও নদী-নালায় এই মাছের বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক।



কাতলা

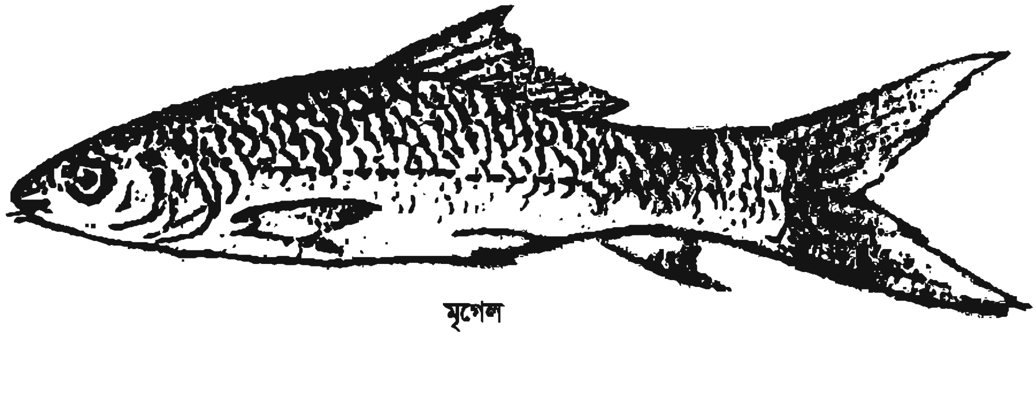
দৈহিক বৈশিষ্ট্য : দেহ খাটো এবং মাথা দেহের তুলনায় বড়। মুখ প্রশস্ত ও উপরের দিক বাঁকানো। ওপরের ঠোঁট পাতলা, নিচের ঠোঁট পুরু। পিঠের অংশ পেটের চেয়ে অধিকতর উত্তল। দেহের উপরের অংশ গাঢ় ধূসর ও পাশের অংশ রূপালি বর্ণের। পাখনা কালচে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : কাতলা পানির ওপরের স্তরের খাবার খায়। এ মাছ মূলত প্রাণিকণা খায়। তবে উদ্ভিদকণাও গ্রহণ করে।

পরিপক্বতা ও বংশবৃদ্ধি : কাতলা মাছ দৈর্ঘ্যে ১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। ৩-৫ বছরে যৌন পরিপক্বতা প্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক আকারের একটি স্ত্রী কাতলা মাছ ১৫-৩০ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ধারণ করে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ পানিতে ডিম ছাড়ে না। অনুকূল পরিবেশে জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত নির্দিষ্ট নদী ও প্লাবন ভূমিতে ডিম দেয়। হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

মৃগেল

রুই-কাতলার ন্যায় মৃগেলও এ দেশের নদীর মাছ। পুকুরে চাষের জন্য মৃগেল খুবই উপযোগী। মৃগেল মাছ দ্রুত বর্ধনশীল।



মৃগেল

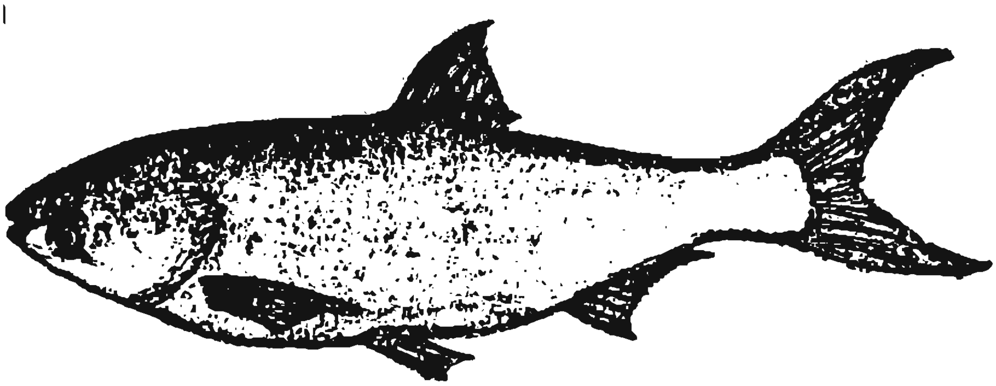
দৈহিক বৈশিষ্ট্য : দেহ লম্বাটে, দেহের নিচের অংশ লম্বালম্বিভাবে প্রায় সোজা। উপরের ঠোঁট নিচের দিকে বাঁকানো, দুটি ছোট শুঁড় আছে। পিঠের অংশ ধূসর, দুই পাশ ও নিচের অংশ রুপালি।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : মৃগেল মাছ পুকুরের তলদেশে বাস করে। সাধারণত পুকুরের তলদেশের খাবার খায়। মৃগেল কাদার ভেতরে ও তলদেশে বাসকারী ক্ষুদে প্রাণী, কিছু জীবকণা ও পচা জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

পরিপক্বতা ও বংশবৃদ্ধি : মৃগেল মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মিটার এবং ওজন ৮-৯ কেজি পর্যন্ত হয়। দ্বিতীয় বছরে এই মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। স্ত্রী মৃগেল ১-৫ লাখ ডিম ধারণ করে। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত এই মাছ নির্দিষ্ট নদীতে ডিম পাড়ে। বদ্ধ পানিতে ডিম দেয় না। কৃত্রিম প্রজনন করে হ্যাচারিতে এ মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

সিলভার কার্প

সিলভার কার্প চীন ও রাশিয়ার মাছ। দেশিয় কার্পের সঙ্গে এই মাছের সফল মিশ্র চাষ করা যায়। এটি অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল মাছ।



সিলভার কার্প

দৈহিক বৈশিষ্ট্য : দেহ ছোট ছোট রুপালি আঁশ দ্বারা আবৃত। পেটের অংশ পিঠের অংশের তুলনায় অধিক উত্তল। দেহের মাঝ অংশ চওড়া ও পিছনের অংশ সরু। পিঠের অংশ কিছুটা ধূসর বর্ণের।

খাদ্য ও খাদ্যাভাস : এই মাছ পুকুরের ওপর স্তরের খাদ্য খায়। সিলভার কার্প সাধারণত উদ্ভিদকণা খেয়ে থাকে। এরা পচা জলজ উদ্ভিদও খায়।

বংশবৃদ্ধি : সিলভার কার্প পুকুরে ডিম দেয় না। স্বাভাবিক পরিবেশে এরা নদীতে ডিম ছাড়ে। কৃত্রিমভাবেও হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন করা যায়।

গ্রাসকার্প

এ মাছের স্বাভাবিক আবাসস্থল চীন ও রাশিয়া। কার্প জাতীয় মাছের সঙ্গে মিশ্র চাষ করা যায়। গ্রাস কার্প জলজ আগাছা ও ছোট উদ্ভিদ খেয়ে পুকুরের পরিবেশ ভালো রাখে।



গ্রাসকার্প

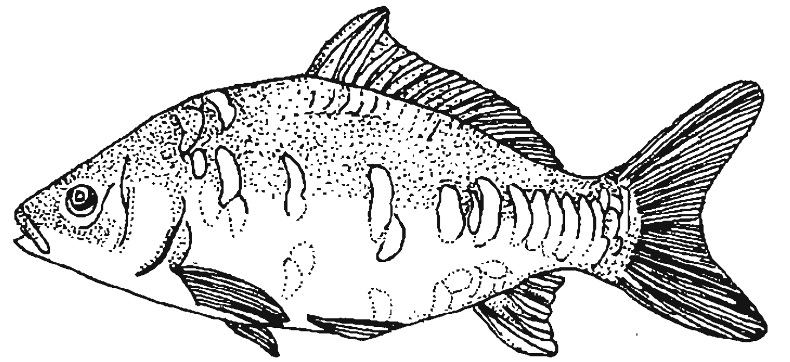
দৈহিক বৈশিষ্ট্য : দেহ অনেকটা মৃগেলের মতো। তবে ঠোঁটে শুঁড় নেই এবং পিঠের পাখনা ছোট। পিঠের দিকের অংশ ঈষৎ সবুজ, দেহের তুলনায় মাথা ছোট।

খাদ্য ও খাদ্যাভাস : গ্রাস কার্প পুকুরের সকল স্তর থেকেই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এই মাছ নরম জলজ আগাছা, উদ্ভিদ এবং সবুজ ঘাস খায়।

বংশবৃদ্ধি : গ্রাস কার্প বন্ধ পানিতে ডিম দেয় না। এরা নদী বা মুক্ত জলাশয়ে ডিম ছাড়ে। হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেও পোনা উৎপাদন করা যায়।

কমন কার্প

কমনকার্প এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণ চীন এলাকার মাছ। আমাদের দেশে দুই ধরনের কমন কার্প পাওয়া যায়। যথা- কার্পিও এবং মিরর কার্প।

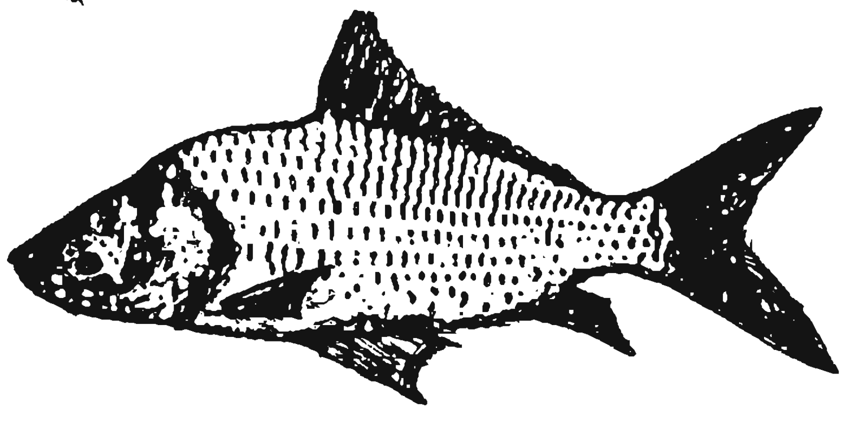


মিররকার্প

দৈহিক বৈশিষ্ট্য : কমন কার্পের দেহ চ্যাপ্টা। দেহের তুলনায় মাথা ছোট। কার্পিও মাছের দেহ ঈষৎ লালচে আঁশ দ্বারা আবৃত। মিরর কার্পের দেহের পিঠের অংশে মাত্র কয়েক সারি আঁশ থাকে। পিঠের অংশ হালকা বাদামি, পেটের দিকের অংশ সোনালি বর্ণের। আঁশ অপেক্ষাকৃত বড়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : কমন কার্প পুকুরের তলদেশে বাস করে। পুকুরের তলায় গর্ত করে এরা কাদার ভেতর থেকে পোকামাকড় ও তলদেশের ক্ষুদে প্রাণী খায়। এরা পচা আবর্জনাও খায়।

বংশবৃদ্ধি : কমন কার্প পুকুরে ডিম দেয়। এরা শীতকালে একবার এবং গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে আরেকবার অর্থাৎ বছরে দুবার ডিম দেয়।



কার্পিও

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ চাষোপযোগী মাছ শনাক্তকরণ

উপকরণ

১. রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ও কার্পিও মাছ।
২. ট্রে, চিমটা, স্কেল, পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধাপা

১. শিক্ষকের সাহায্যে নিকটস্থ বাজার বা পুকুর হতে বর্ণিত মাছ সংগ্রহ কর।
২. সংগৃহীত মাছগুলো ট্রেতে পাশাপাশি সাজাও।
৩. এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত মাছের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ট্রেতে রাখা মাছগুলোর সাথে মেলাও। যেমন-
   ক. মুখে খাঁজ আছে কিনা
   খ. ঠোঁটে শুঁড় আছে কিনা
   গ. পাখনার বিস্তৃতি
   ঘ. আঁশের বর্ণ ও আকার
৪. রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প, কার্পিও শনাক্ত কর।
৫. শনাক্ত করা মাছের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
৬. ব্যবহারিক খাতায় মাছের ছবি আঁক এবং চিহ্নিত কর।

বিষয় ঃ জারে মাছ সংরক্ষণ

উপকরণ

১. কাচের জার ৫টি
২. মাঝারি আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল ও সিলভার কার্প মাছ ৪ টি।
৩. ফরমালিন
৪. বালতি
৫. পানি

কাজের ধাপ

১. প্রথমে মাছগুলো বালতির পানিতে সাবধানে ধুয়ে নাও।
২. মাছটির মাথা নিচের দিকে দিয়ে জারের মধ্যে ঢুকাও।
৩. ৪০% ফরমালিন জারের মধ্যে এমনভাবে ঢাল যেন মাছটি পুরোপুরি ফরমালিন দ্রবণে ডুবে যায়।
৪. জারের মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দাও।
৫. জারের গায়ে মাছের নামসহ লেবেল লাগাও।

সতর্কতা

ফরমালিন চেতনানাশক দ্রব্য। এ জন্য নাক বেঁধে ফরমালিন দ্রবণ নাড়াচাড়া করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কারণগুলোর মধ্যে সম্পদ হ্রাসের প্রধান কারণ কোনটি?

ক. পলি পড়ে জলাশয় ভরাট
খ. শীতকালে কিছু জলাশয় শুকিয়ে যাওয়া
গ. অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ
ঘ. নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ নিধন

২। চাষযোগ্য মাছের বৈশিষ্ট্যগুলো হল-

i. এরা দ্রুত বর্ধনশীল
ii. দ্রুত যৌন পরিপক্বতা লাভ করে
iii. এরা সম্পুরক খাদ্য গ্রহণ করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মৎস্য কর্মকর্তা ওয়াজেদ আলী জ্যৈষ্ঠের এক দুপুরে বাড়ি যাওয়ার পথে রাস্তার দুধারে খালের পানিতে লোকজনকে মাছ ধরতে দেখলেন। তিনি পথে থেমে তাদেরকে ডেকে আনলেন এবং দেখলেন তারা প্রত্যেকে শোল, টাকি এবং ডিমওয়ালা মাছ ধরছে। তিনি তাদেরকে পোনা ধরার কুফল ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে বুঝিয়ে বললেন। তারা সকলে পোনা মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ না ধরার অঙ্গীকার করলেন।

ক. পোনা মাছ কী?
খ. ডিমওয়ালা মাছ নিধনের কুফল ব্যাখ্যা কর।
গ. প্রদত্ত তথ্যের আলোকে মৎস্য সম্পদ সম্প্রসারণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?
ঘ. বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মৎস্য সংরক্ষণ আইনটি মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুকুরে মাছ চাষ

কোনো জলাশয়ের তলদেশের মাটির গঠন, রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং মাটিতে বিদ্যমান বিভিন্ন খনিজ উপাদান পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ কোনো জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা পানির তলদেশের মাটির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। পানির গুণাগুণ তাই মাছের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

পানির গুণাগুণ

পানির গুণাগুণকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. ভৌত গুণাগুণ

২. রাসায়নিক গুণাগুণ

৩. জৈবিক গুণাগুণ।

পানির ভৌত গুণাগুণ

পানির ভৌত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ভৌত গুণাগুণগুলো নিম্নরূপ :

ক. পানির গভীরতা : পানির গভীরতা খুব কম বা বেশি হলে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। পুকুরে পানির গভীরতা ১.৫ মিটার থেকে ৩ মিটার হলে মাছ চাষের জন্য সুবিধাজনক।

খ. পানির স্বচ্ছতা : পুকুরের পানি ঘোলা হলে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে মাছের খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। এতে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পানির স্বচ্ছতা ২৫ সেমি হলে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয়।

গ. তাপমাত্রা : পানির তাপমাত্রার ওপরও মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। শীতকালে মাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি দ্রুত হয়। রুই জাতীয় মাছ চাষের জন্য ২৫° - ৩৫° সে. তাপমাত্রা উত্তম।

ঘ. সূর্যালোক : সূর্যের আলো পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনকে সরাসরি প্রভাবিত করে। পুকুর পাড়ে বড় গাছ থাকলে ডালপালা কেটে দিয়ে পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরে ভাসমান কচুরিপানা, হেলেঞ্চা ইত্যাদিও পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। এগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

পানির রাসায়নিক গুণাগুণ

১. দ্রবীভূত অক্সিজেন : অক্সিজেন জীবনের জন্য অপরিহার্য। ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন প্রস্তুত করে তা পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাতাস থেকে কিছু অক্সিজেন সরাসরি পানিতে মিশে। পুকুরে অবস্থিত মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এই অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। পুকুরের তলার জৈব পদার্থ পচনেও অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। পুকুরের উৎপাদন বজায় রাখার জন্য পরিমিত অক্সিজেন অত্যাবশ্যক। প্রতি লিটার পানিতে ৫-৮ মিলিগ্রাম দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছ চাষের জন্য উত্তম।

২. **দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড :** বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন যেমন অপরিহার্য, মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্রস্তুতের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইডও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোনো কারণে পানিতে এর পরিমাণ বেড়ে গেলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পুকুরের তলায় অত্যধিক জৈব পদার্থ ও কাদা থাকলে অধিক তাপমাত্রায় পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য ঘটে। প্রতি লিটার পানিতে ১-২ মিলিগ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকলে মাছের উৎপাদন ভালো হয়।

৩. **পি এইচ :** পানি অম্লধর্মী না ক্ষারধর্মী পি এইচ দ্বারা তা পরিমাপ করা যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষারধর্মী পানি মাছ চাষের জন্য ভালো। পানির পি এইচ ৬.৫-৮.৫ হলে পানি প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হয়।

৪. **ফসফরাস :** ফসফরাসের ওপর পুকুরের উর্বরতা নির্ভর করে। প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ ফরফরাস থাকে। এই ফসফরাস ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত ফসফেটের উপস্থিতিতে পানিতে প্রচুর পরিমাণ ফাইটোপ্ল্যাংকটন উৎপাদিত হয়।

পুকুরের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী

পুকুরে সাধারণত জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী অতি ক্ষুদ্র। এগুলো দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দরকার হয়। এসব ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। আবার কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটায়। নিম্নরূপ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী পুকুরে জন্মে থাকে-

ভাসমান উদ্ভিদ

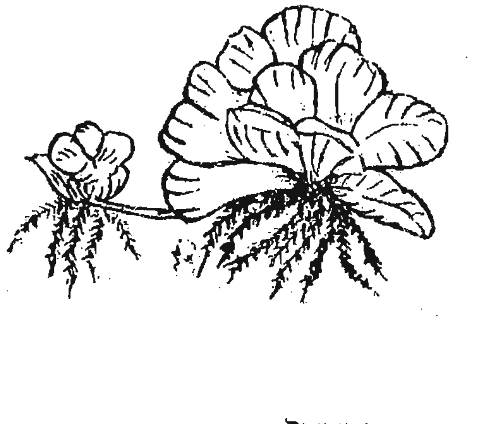
এই ধরনের জলজ উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ড পানির উপর ভাসতে থাকে, কিন্তু মূল পানির মধ্যে ঝুলে থাকে। যেমন- কচুরিপানা, টোপা পানা, ক্ষুদি পানা ইত্যাদি। এগুলো পুকুরের সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে ও পুকুরে ব্যবহৃত সার হতে পুষ্টি গ্রহণ করে। ফলে মাছের উৎপাদন কমে যায়।

ডুবন্ত উদ্ভিদ

এই ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এরা পুকুরের গভীরে সূর্যের আলো প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। যেমন-পাতা ঝাঁঝি, কাঁটা ঝাঁঝি, নাজাস ইত্যাদি।



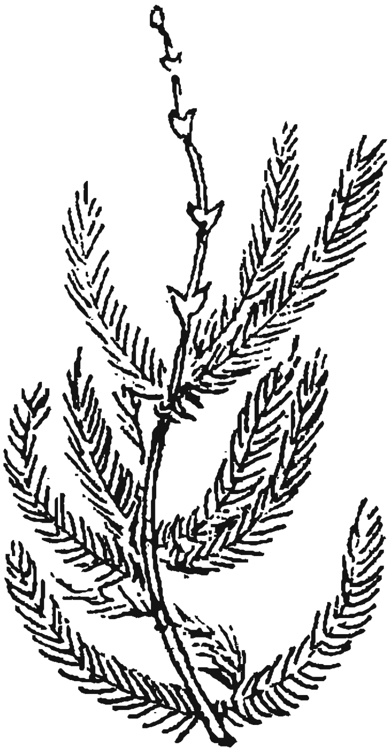
কচুরিপানা

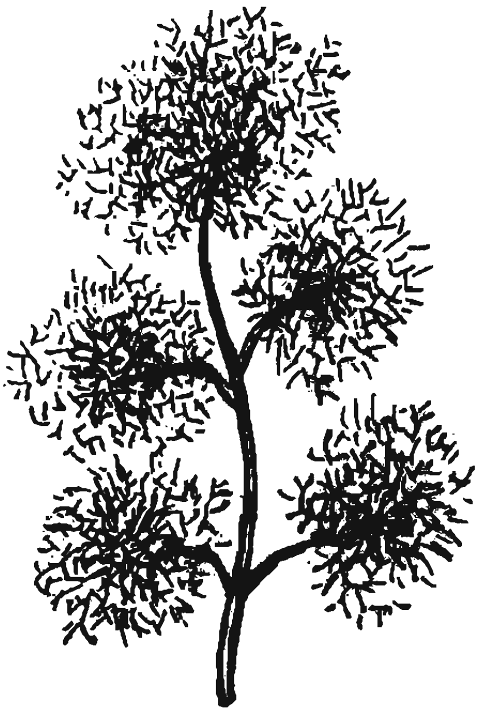


টোপাপানা

নির্গমনশীল উদ্ভিদ

কিছু জলজ উদ্ভিদের মূল পুকুরের কিনারায় থাকে এবং কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা পানির ওপরে বাড়তে থাকে, এগুলো নির্গমনশীল উদ্ভিদ। যেমন–আড়াইল, কলমিলতা ইত্যাদি। আড়াইল অনেকটা বোনা আমন ধানের মতো। কলমিলতা পানির উপরে লতানো জলজ উদ্ভিদ এগুলো বাংলাদেশে এলাকাভেদে বিভিন্ন স্থানীয় নামে পরিচিত।







কলমিলতা

প্ল্যাংকটন

পানিতে যে বীজকণা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে তাকেই প্ল্যাংকটন বলা হয়। প্ল্যাংকটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। প্ল্যাংকটন বেশি থাকা পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। প্ল্যাংকটন দুই প্রকার। যথা-

১. ফাইটোপ্ল্যাংকটন বা উদ্ভিদকণা

২. জুপ্ল্যাংকটন বা প্রাণিকণা।

ফাইটোপ্ল্যাংকটন : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদই ফাইটোপ্ল্যাংকটন। এগুলোর রং সবুজ। ফাইটোপ্ল্যাংকটন মাছের প্রাকৃতিক খাবার। যেমন– ডায়াটম, ভলভক্স, স্পাইরোগাইরা ইত্যাদি। পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটন অত্যধিক জন্মালে সূর্যের আলো পুকুরের পানিতে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি হয়।

জুপ্ল্যাংকটন : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে জুপ্ল্যাংকটন বলা হয়। যেমন-ড্যাফনিয়া, রটিফেরা ইত্যাদি। জুপ্ল্যাংকটন মাছের প্রাকৃতিক খাবার।

কীটপতঙ্গ : পুকুরের পানিতে এবং তলদেশে কাদার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ বাস করে। এগুলো মাছের খাদ্য এবং খাদ্যচক্রে অন্তর্ভুক্ত। যেমন–কাইরোনমিতলার্ভা, জল ফড়িং-এর বাচ্চা।



পুকুর প্রস্তুতি

মাছ চাষ ফসল উৎপাদনের মতোই একটি চাষাবাদ প্রক্রিয়া। ফসল ফলানোর লক্ষ্যে জমিতে চারা রোপণের পূর্বে জমি চাষ, সেচ দেওয়া, সার প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষি জমি তৈরি করা হয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার আগে অনুরূপভাবে পুকুর প্রস্তুত করতে হয়।

পুকুর প্রস্তুতির জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১. পুকুর সংস্কার
২. আগাছা পরিষ্কার
৩. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ
৪. চুন প্রয়োগ
৫. সার প্রয়োগ
৬. পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা।

পুকুর সংস্কার

পুকুর সংস্কার পুকুর প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। পুকুরের সংস্কার কাজ নিম্নরূপ :

কাদা সরানো

পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে তাতে বিষাক্ত গ্যাস, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড় থাকতে পারে। পুকুরের পরিবেশ উন্নত করার জন্য তলায় ২০-২৫ সেমি কাদা রেখে অতিরিক্ত কাদা উঠিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে সহজেই কাদা সরানো যায়।

পাড় মেরামত

পাড় ভাঙা থাকলে বর্ষায় পুকুরের মাছ বাইরে চলে যেতে পারে এবং রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে ঢুকে মাছ চাষ ব্যাহত করতে পারে। এই জন্য শুকনো মৌসুমে ভাঙা পাড় মেরামত করে তাতে ঘাস লাগিয়ে দিতে হবে। এতে পাড় শক্ত হবে। পাড় এমন উঁচু করতে হবে যাতে বন্যায় প্লাবিত না হয়।

আগাছা পরিষ্কার

আগাছা পুকুরে ব্যবহৃত সার হতে পুষ্টি শোষণ করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস করে এবং মাছের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্ন ঘটায়। নিম্নরূপ পদ্ধতিতে পুকুরের আগাছা পরিষ্কার করা যায়।

১. কায়িক শ্রম দ্বারা : পুকুরের ভাসমান ও নির্গমনশীল আগাছা যেমন- কচুরিপানা, হেলেঞ্চা, কলমিলতা, দল ইত্যাদি কায়িক শ্রম দিয়ে সহজেই অপসারণ করা যায়।

২. জৈবিক পদ্ধতিতে : পুকুরে পোনা মজুদের পর ডুবন্ত আগাছা জন্মালে তা দমন করে পুকুরের পরিবেশ যথাযথ রাখার জন্য জৈবিক পদ্ধতি খুবই উপযোগী। গ্রাস কার্প ও রাজপুঁটি উদ্ভিদভোজী মাছ। এসব মাছ পুকুরে মজুদ করলে ডুবন্ত আগাছা খেয়ে পুকুর পরিচ্ছন্ন রাখে।

৩. রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে : পুকুর অতিরিক্ত সবুজ শেওলা হলে মাছের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটে। অত্যধিক শেওলার কারণে অক্সিজেনের অভাবে মাছ মারা যেতে পারে। প্রতি শতকে ১ মিটার গভীরতার জন্য ৩৫ গ্রাম কপার সালফেট (তুঁতে) প্রয়োগ করে অতিরিক্ত সবুজ শেওলা দূর করা যায়।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ

রাক্ষুসে মাছ পুকুরে চাষ করলে মাছের পোনা ও খাদ্য খেয়ে ফেলে মাছের উৎপাদন কমিয়ে দেয়। শোল, টাকি, গজার, চিতল ইত্যাদি রাক্ষুসে মাছ। নিচের ৩ টি পদ্ধতির মাধ্যমে পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়। যেমন-

১. পুকুর শুকিয়ে : পুকুরের পানি শুকিয়ে সব মাছ ধরে ফেলে সহজেই রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়। কাদার মধ্যে রাক্ষুসে মাছ ও ক্ষতিকর প্রাণী লুকিয়ে থাকতে পারে। পুকুরের তলা ভালো করে রোদে শুকালে ক্ষতিকর পোকামাকড় ও জীবাণু ধ্বংস হয় এবং পুকুরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

২. জাল টেনে : পুকুরে পানি কম থাকলে বার বার জাল টেনে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়। জালের নিচের অংশে ইট বা ভারী কিছু বেঁধে দিয়ে আস্তে আস্তে জাল টানতে হয়।

৩. রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে : অনেক সময় পুকুর শুকানো সম্ভব হয় না। আবার জাল টেনেও রাক্ষুসে মাছ সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না। এক্ষেত্রে রোটেনন ও ফসটক্সিন দিয়ে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ এবং ক্ষতিকর প্রাণী দূর করা হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার মাত্রা দেওয়া হল।

রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার মাত্রা

দ্রব্যের নাম	ব্যবহার মাত্রা/শতক/মিটার
রোটেনন	৩০-৩৫ গ্রাম
ফসটক্সিন	৩ গ্রাম (১টি ট্যাবলেট)

রোটেনন পানিতে মিশিয়ে নিয়ে এবং ফসটক্সিন ট্যাবলেট পুকুরে ছিটিয়ে দিয়ে দুই/তিন বার জাল টেনে দিলে ১ ঘণ্টা পর মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে তুলে ফেলতে হয়।

চুন প্রয়োগ

চুন পানি শোধন করে। মাছ চাষের পুকুরে চুন প্রয়োগ অপরিহার্য। চুন মাছের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে। মাটি ও পানির অম্লত্ব কমায় এবং ক্ষারত্ব বাড়ায়। ফলে মাটি ও পানির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। চুন ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ এবং রোগজীবাণু ধ্বংস করে।

চুন প্রয়োগের মাত্রা : মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থের ওপর চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ভর করে। যেমন- লাল বা বাদামি রঙের মাটি অম্লীয়। এই ধরনের মাটিতে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অধিক পরিমাণে চুন প্রয়োগ করতে হয়। চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ভর করে মাটির পি এইচ-এর ওপর।

নিচে মাটির অম্লমান অনুযায়ী চুন প্রয়োগের মাত্রা দেওয়া হল।

মাটির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চুনের পরিমাণ

মাটির পি এইচ	মাটির প্রকার	চুনের পরিমাণ (কেজি/শতক)
৪ এর কম	অত্যন্ত অম্লীয়	১০
৪-৪.৫	অম্লীয়	৫
৪.৬-৫.৫	মধ্যম অম্লীয়	৩
৫.৬-৬.৫	ঈষৎ অম্লীয়	২
৬.৬-৭.৫	প্রায় নিরপেক্ষ / ঈষৎ ক্ষারীয়	১

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি : পুকুরে সরাসরি চুন ছিটিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কলিচুন বালতি বা ড্রামে নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে ঠান্ডা হলে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। কলিচুন গুঁড়া চুনের চেয়ে অধিক কার্যকর।

সার প্রয়োগ

পুকুরের পানিতে সবুজ উদ্ভিদকণা, অর্থাৎ ফাইটোপ্ল্যাংকটনের উৎপাদনের আধিক্যের ওপর মাছের উৎপাদন নির্ভর করে। ফাইটোপ্ল্যাংকটনের আধিক্যের জন্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম প্রভৃতি প্রয়োজন। পানিতে এই সব উপাদান অনেক সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। তদুপরি মাছ আহরণ, পানি পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে পুকুরে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কমে যায়। তাই পানিতে সার ব্যবহার করে এগুলোর প্রয়োজনীয় যোগান দেওয়া হয়। সার দুই প্রকার। যথা-

১. জৈব সার
২. অজৈব বা রাসায়নিক সার।

১. জৈব সার : প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎস থেকে যে সব সার পাওয়া যায় তাকে জৈব সার বলে। যথা- গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, কমপোস্ট, সবুজ সার ইত্যাদি।

২. অজৈব সার : কলে-কারখানায় রাসায়নিক উপায়ে যে সার তৈরি হয় তাকে অজৈব বা রাসায়নিক সার বলে। যথা - ইউরিয়া, টিএসপি,-(ট্রিপল সুপার ফসফেট) এমপি (মিউরেট অব পটাশ) ইত্যাদি।

পুকুরে সার প্রয়োগ মাত্রা : মাটির গুণাগুণ ও পুকুরের প্রকৃতির ওপর সারের মাত্রা নির্ভর করে। যেমন– বেলে ও এঁটেল মাটির পুকুরে দোআঁশ মাটি অপেক্ষা বেশি সার দিতে হয়। আবার পুরোনো পুকুরের তলায় সাধারণত বেশি জৈব পদার্থ থাকে বলে সার কম লাগে। কিন্তু নতুন কাটানো বা সংস্কার করা পুকুরে জৈব সার বেশি প্রয়োগ করতে হয়।

পুকুরে দুই পর্যায়ে সার প্রয়োগ করতে হয়

১. পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর প্রস্তুতির সময়ে একবার সার প্রয়োগ করতে হয়।

২. পোনা মজুদের পরবর্তী সময়ে মাছ আহরণ পর্যন্ত নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : ইউরিয়া বাদে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অন্যান্য অজৈব সার একটি পাত্রে নিয়ে তিনগুণ পানি দিয়ে আগের দিন সন্ধ্যায় ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সকালে সার মেশানো পানি পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য সমৃদ্ধ পানির রং হালকা সবুজ বা বাদামি হয়। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে পুকুরের পানি নিয়ে সূর্যের আলোয় ধরলে যদি পানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মতো সবুজ বা বাদামি কণা দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মেছে। এই অবস্থায় পুকুর পোনা ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

রুই জাতীয় মাছের পোনা চাষ

কোনো নির্দিষ্ট পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা বা চারা পোনা উৎপাদন করার পদ্ধতিকে পোনা পরিচর্যা বা পোনা চাষ বলা হয়। যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে আঁতুড় পুকুর বা নার্সারি বলা হয়। আর যে পুকুরে ধানী পোনা লালন করে চারা পোনা উৎপন্ন করা হয় তাকে চারা পুকুর বা লালন পুকুর বলে। আমাদের দেশে সাধারণত আঁতুড় পুকুরেই রেণু পোনা ছেড়ে চারা পোনা উৎপাদন করা হয়।

আঁতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনা

আঁতুড় পুকুরে পোনা বাঁচার হার ও বৃদ্ধি সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। এই ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

পুকুরে সার প্রয়োগ মাত্রা

সারের নাম	**পরিমাণ/ শতক**	
	পুকুর প্রস্তুতির সময় (একবার)	পোনা মজুদের পরে (প্রতিদিন)
গোবর	৫-৭ কেজি	১৫০-২০০ গ্রাম
বা মুরগির বিষ্ঠা	৩-৪ কেজি	৫০-১০০ গ্রাম
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম	৪-৫ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম	১-২ গ্রাম
এমপি	১০-১৫ গ্রাম	০.৫-১.০ গ্রাম

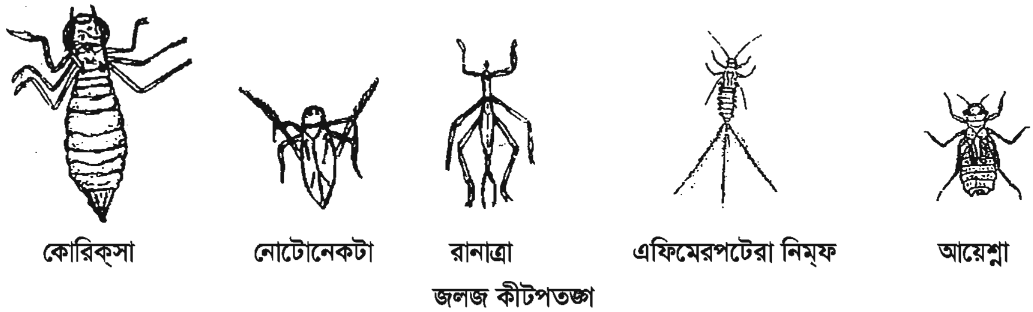
পুকুর নির্বাচন : আঁতুড় পুকুরের আকার ১০-২৫ শতক হলে ভালো হয়। পাড় উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাড়ে কোনো গাছপালা থাকা উচিত নয়। প্রয়োজনমতো পুকুরের পানি শুকিয়ে ফেলা বা পানি দেওয়ার সুযোগ থাকলে ভালো। ছোট আকারের যেসব জলাশয়ে পোনা উৎপাদন মৌসুমে বা সারা বছর পানির গভীরতা অল্প থাকে সে সব জলাশয় আঁতুড় পুকুর হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পানির গভীরতা : রেণু অবস্থায় পোনা অত্যন্ত নাজুক থাকে, তাই বেশি গভীর পুকুরে পোনা ছাড়লে পোনা মারা যায়। এই জন্য আঁতুড় পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভালো হয়।

পুকুর প্রস্তুতি : পুকুর পোনার বাসযোগ্য করে তৈরি করা এবং পোনার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করাই পুকুর প্রস্তুতি। পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে। এরপর জলজ ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমন করতে হবে।

ক্ষতিকর জলজ কীটপতঙ্গ দমন

রেণু ছাড়ার পূর্বে পুকুর হতে অবশ্যই জলজ কীটপতঙ্গ সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে।
ছোট ফাঁসের মশারির জাল টেনে এগুলোকে দমন করা যেতে পারে অথবা রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে ক্ষতিকর জলজ কীট সম্পূর্ণরূপে দমন করা যায়। এরকম দুটি রাসায়নিক দ্রব্য হল।



জলজ কীটপতঙ্গ

১. ডিপটারেক্স

২. কেরোসিন বা ডিজেল।

ডিপটারেক্স প্রয়োগ : প্রতি শতকে ১ মিটার গভীর পানির জন্য ৩৫ গ্রাম হারে ডিপটারেক্স প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ডিপটারেক্স পানিতে মিশিয়ে পোনা ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তা সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে ক্ষতিকর জলজ কীট সম্পূর্ণ দূর হবে।

কেরোসিন বা ডিজেল প্রয়োগ : পুকুরের প্রতি শতকে ১০০ মিলি. ডিজেল বা ৫০ মিলি. কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়েও ক্ষতিকর জলজ কীট দমন করা যায়। বেশি বাতাস থাকলে সেদিন ডিজেল বা কেরোসিন পুকুরে দেওয়া যাবে না। কারণ পানিতে ভাসমান ডিজেল বা কেরোসিন বাতাসে পুকুরের একদিকে জমা হবে। ফলে সব কীটপতঙ্গ মারা পড়বে না। কেরোসিন বা ডিজেল প্রয়োগের ২৪ ঘণ্টা পর পোনা ছাড়া যায়। ডিপটারেক্স বা কেরোসিন প্রয়োগের পর ছোট ফাঁসের জাল টেনে পোনা ছাড়লে ভালো হয়।

রেণু সংগ্রহ ও পরিবহণ

আঁতুড়ে পুকুরে ৪-৫ দিন বয়সের রেণু পোনা ছাড়া হয়। দেশে কয়েকশত সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারি রয়েছে। নিকটস্থ হ্যাচারি থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করা যায়। পলিথিনের ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে রেণু পরিবহণ উত্তম। রেণুসহ পলিথিন ব্যাগ ভেজা চটের বস্তায় ভরে সহজেই পরিবহণ করা যায়। (৮০ × ৫০) বর্গ সেমি. আকারের একটি পলিব্যাগে ৪০-৫০ হাজার রেণু পোনা পরিবহণ করা যায়। এভাবে পরিবহণের ক্ষেত্রে ৮-১০ ঘণ্টা রেণু পোনা ভালো থাকে। সকালে পানির তাপমাত্রা কম থাকে। এই সময় পোনা পরিবহণ ও পুকুরে ছাড়ার উপযুক্ত সময়।

রেণু পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

রেণু পোনা যে পলিথিন ব্যাগে পরিবহণ করা হয় তার অর্ধাংশ আঁতুড় পুকুরে ২৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এ সময়ে অল্প অল্প করে পুকুরের পানি ব্যাগের পানির সাথে মেশাতে হবে। এভাবে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমান হলে ব্যাগের মুখ খুলে কাত করে আস্তে আস্তে পোনা ছাড়তে হবে। সাধারণভাবে প্রতি শতক পুকুরে ৬-১০ গ্রাম হারে রেণু পোনা মজুদ করা যায়।

সার প্রয়োগ

প্ল্যাংকটন পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য। পুকুরে পর্যাপ্ত প্ল্যাংকটন উৎপাদনের জন্য পোনা ছাড়ার ১ দিন পর থেকে প্রতি শতাংশে প্রতিদিন নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ/শতক
গোবর	২০০-২৫০ গ্রাম
বা মুরগির বিষ্ঠা	১০০-১৫০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪-৫ গ্রাম
টিএসপি	২-৩ গ্রাম

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ

প্রাকৃতিক খাদ্যে পোনার পরিপূর্ণ পুষ্টি সাধন হয় না। এই জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি পোনা মাছকে প্রতিদিন সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। খাদ্য হিসেবে চালের মিহি কুঁড়া, গমের ভুসি, সরিষার খৈল, ফিশমিল ও গবাদি পশুর রক্ত দেওয়া যেতে পারে। মাছের কয়েকটি মিশ্র খাদ্যের নমুনা অনুপাত এখানে দেওয়া হল।

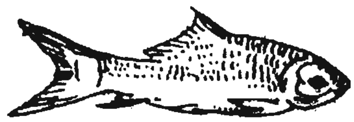
খাদ্য উপাদান / খৈল	অনুপাত
সরিষার খৈল + পশু রক্ত	১ ঃ ১
সরিষার খৈল + কুঁড়া + পশু রক্ত	৫ ঃ ৩ ঃ ২
সরিষার খৈল + কুঁড়া + ফিশমিল	৪ ঃ ৩ ঃ ৩

অনুপাত অনুযায়ী উপাদানগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে। প্রস্তুত করা খাদ্য প্রতিদিন পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

আঁতুড় পুকুরে পোনা মজুদের ১ দিন পর থেকে নিম্নরূপ হারে খাদ্য দিতে হবে।

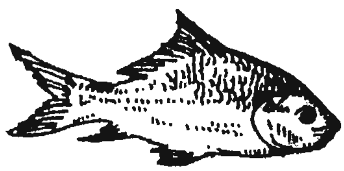
সময়	মজুদকৃত পোনার ওজনের
প্রথম ১০ দিন	১০ গুণ
দ্বিতীয় ১০ দিন	১৫ গুণ
তৃতীয় ১০ দিন	২০ গুণ
চতুর্থ ১০ দিন	২৫ গুণ
পঞ্চম ১০ দিন	৩০ গুণ
ষষ্ঠ ১০ দিন	৩৫ গুণ

প্রয়োজনীয় খাবার ২ ভাগ করে সকালে ও বিকালে দিতে হবে।


রুই

পোনা বাঁচার হার ও বৃদ্ধি পরীক্ষা

রেণু পোনা মজুদের ৭-৮ দিনের মধ্যে চটজাল টানা উচিত নয়। ৮-১০ দিন পর একবার এবং পরবর্তীতে ১০ দিন পর পর মশারির জাল টেনে পোনা বাঁচার হার ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।


কাতলা

পরিচর্যা

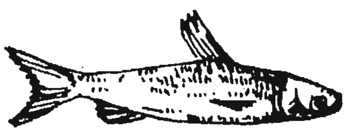
পানির রং বেশি সবুজ হলে বা পানির উপরিভাগ সবুজ আস্তরণ পড়লে সার ও খাদ্য দেওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। বর্ণিত ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে মেনে চললে ২ মাসের মধ্যে পোনার আকার ৫-১০ সেন্টিমিটার হয় (গড় ওজন ১০ গ্রাম) এবং বাঁচার হার শতকরা ৬০ ভাগ এর ওপর রাখা যায়। এ আকারের পোনা চারা পোনা হিসেবে বিক্রির উপযোগী এবং মজুদ পুকুরে ছাড়া যাবে।


মৃগেল

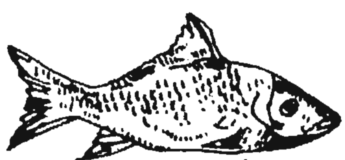

সিলভার কার্প

বিভিন্ন মাছের পোনা শনাক্তকরণ

রুই : দেহ কিছুটা লম্বাটে। লেজের গোড়ায় কালো গোল চিহ্ন থাকে। পাখনার প্রান্ত ভাগ ঈষৎ লালচে। উপরের ঠোঁট সামনের দিকে বাড়ানো ও খাঁজযুক্ত।


গ্রাস কার্প

কাতলা : দেহের তুলনায় মাথা বড়। লেজের গোড়ার কালো গোল চিহ্ন থাকে না। পিঠের, লেজের ও পায়ুপাখনা ধূসর বর্ণের। মুখ চওড়া, ঠোঁট পুরু কিন্তু খাঁজযুক্ত নয়।


কমন কার্প

মৃগেল : দেহ সরু ও লম্বা। লেজের গোড়ায় চারকোনা আকৃতির কালো চিহ্ন থাকে। দেহের উপর লম্বালম্বি ফিতার মতো হালকা কালো দাগ থাকে। লেজের পাখনা লাল রঙের। ঠোঁট সমান, শুঁড় আছে। মুখ নিচের দিকে বাঁকানো।

সিলভার কার্প : দেখতে অনেকটা চাপিলার মতো। দেহ চ্যাপ্টা, রং উজ্জ্বল সাদা, পাখনা ধূসর বর্ণের। পিঠের পাখনা ছোট।

কমন কার্প : দেহ চওড়া, ঈষৎ সোনালি বর্ণের। পিঠের পাখনা প্রায় লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত। মাথা ছোট, পিঠ উঁচু। পিঠের পাখনায় শক্ত কাঁটা থাকে। ঠোঁটে দুজোড়া শুঁড় আছে।

মজুদ পুকুরে মাছ চাষ

মাছ চাষ একটি লাভজনক বিনিয়োগ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি, উপকরণের প্রাপ্যতা, প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও বাজার ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন চাষ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। পুকুরে মাছ চাষ পদ্ধতিকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. সনাতন পদ্ধতির মাছ চাষ
২. আধা নিবিড় মাছ চাষ
৩. নিবিড় মাছ চাষ।

সনাতন পদ্ধতির মাছ চাষ

এই পদ্ধতিতে পুকুরে কিছু মাছের পোনা ছাড়া হয়। পুকুরে কোনো সার বা খাবার দেওয়া হয় না। মাটি ও পানির উর্বরতায় পানিতে যে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয় মাছ তাই খেয়ে জীবন ধারণ করে। অন্য কোনো পরিচর্যা করা হয় না।

আধা নিবিড় মাছ চাষ

যথাযথ পুকুর প্রস্তুতি, প্রজাতিভিত্তিক সঠিক সংখ্যায় পোনা মজুদ, আংশিক সার প্রয়োগ ও মাঝে মাঝে খাদ্য সরবরাহ করে মাছ চাষ করাকে আধা নিবিড় মাছ চাষ বলে। এই পদ্ধতিতে পুকুরের বিভিন্ন স্তরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পুরোপুরি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির পোনা নির্দিষ্ট সংখ্যায় ছাড়া হয়। প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দেওয়ার জন্য পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয় এবং পাশাপাশি কিছুটা সম্পূরক খাবার দেওয়া হয়।

নিবিড় মাছ চাষ

কোনো পুকুর বা জলাশয় হতে কম সময়ে অধিক উৎপাদন পাওয়ার লক্ষ্যে যথাযথ পুকুর প্রস্তুতকরণ, প্রজাতিভিত্তিক সঠিক সংখ্যক ও স্বাস্থ্যবান পোনা মজুদ, পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দেওয়ার জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ, সুষম পুষ্টির জন্য পরিমিত সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ, পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে যে পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয় তাকে নিবিড় মাছ চাষ বলে। এই পদ্ধতিতে লাগসই প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুরের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা পর্যন্ত মাছ উৎপাদন করা যায়।

কার্পজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ

রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কমন কার্প প্রভৃতি মাছকে কার্প জাতীয় মাছ বলা হয়। এসব মাছ পুকুরের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের খাবার খায়। পুকুরের বিভিন্ন স্তরে উৎপন্ন প্রাকৃতিক খাদ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য একটি পুকুরে এক সাথে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা হয়। এরূপ মাছ চাষকে মিশ্র চাষ বলা হয়।

সফলভাবে মাছ চাষের জন্য উর্বর মাটি ও পানি, পর্যাপ্ত সূর্যের আলো, সুস্থ সবল পোনা, সার, সম্পূরক খাদ্য এবং সুষ্ঠু পরিচর্যা প্রয়োজন। কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো নিচে আলোচনা করা হল।

১. পুকুর নির্বাচন
২. পুকুর প্রস্তুতকরণ
৩. পোনা মজুদ
৪. সার প্রয়োগ
৫. সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ
৬. সুষ্ঠু পরিচর্যা
৭. মাছ আহরণ

পুকুর নির্বাচন

পুকুর নির্বাচনের সময় স্থান, মাটির গুণাগুণ, পানির গভীরতা, আকার ও আয়তন, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। স্থান নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে পুকুরটি যেন বসতবাড়ির কাছাকাছি থাকে। যাতে খাদ্য সরবরাহ ও সার প্রয়োগে সুবিধা হয়। ৩০ শতাংশ থেকে ১ একর আকারের পুকুর বেশি উপযোগী। পুকুর পাড়ে বড় গাছ বা ঝোপ ঝাড় থাকা উচিত নয়। বড় গাছের পাতা পড়ে পুকুরের পানি নস্ট করে। ঝোপ ঝাড়ে মৎস্যভুক ও ক্ষতিকর প্রাণী বাস করতে পারে। মাছ চাষের জন্য দোআঁশ মাটির পুকুর উত্তম।

পুকুর প্রস্তুতি

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের জন্য পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে যথাযথভাবে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে।

পোনা মজুদ

সুস্থ সবল পোনা অধিক উৎপাদনের পূর্বশর্ত। পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানোর পর পোনা মজুদ করতে হবে। পুকুরে ৮-১২ সেন্টিমিটার আকারের পোনা মজুদ করা উচিত। বিভিন্ন প্রজাতির পোনার আকার সমান হলে ভালো হয়।

পোনার সংখ্যা : পুকুরে পোনার সংখ্যা ব্যবস্থাপনার ধরন সাপেক্ষে কিছু কম বেশি হতে পারে। সাধারণভাবে কার্পজাতীয় মাছের মিশ্র চাষে পুকুরে নিম্নরূপে হারে পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

পানির স্তর	পোনার প্রজাতি	সংখ্যা/শতক
ওপরের স্তর	কাতলা	৬ টি
	সিলভার কার্প	৮ টি
মধ্য স্তর	রুই	৮ টি
নিচের স্তর	মৃগেল	৪ টি
	মিরর কার্প/কার্পিও	৪ টি
অন্যান্য	গ্রাস কার্প	২ টি
	রাজপুঁটি	৩ টি

সুষম খাদ্য সরবরাহ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে পোনার সংখ্যা আনুপাতিক হারে কিছুটা বাড়তে পারে।

সার প্রয়োগ

পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান দেওয়ার জন্য পোনা মজুদের পর পুকুরে প্রতিদিন বা সপ্তাহে ১দিন ভিত্তিতে মাছ আহরণের পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হয়। অধিক উৎপাদন পেতে হলে প্রতিদিন সার প্রয়োগ করা ভালো। এতে খরচও কম হয়। নিম্নের ছক অনুযায়ী মজুদ পুকুরে প্রতিদিন সার দিতে হবে।

মজুদ পুকুরে দৈনিক সার ব্যবহার মাত্রা

সারের নাম	পরিমাণ/শতক/দিন
গোবর	১৫০-২০০ গ্রাম
বা মুরগির বিষ্ঠা	৯০-১৫০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩-৫ গ্রাম
টিএসপি	১-২ গ্রাম
এমপি	০.৫-১ গ্রাম

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ

পুকুরের মাছকে বাইরে থেকে যে খাবার দেওয়া হয় তাই সম্পূরক খাদ্য। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক খাদ্যে মাছের পূর্ণ পুষ্টি সাধন হয় না। এ জন্য মাছকে প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ সুষম খাদ্য দেওয়া উচিত। নিম্নরূপ উপাদান দিয়ে মাছের সুষম খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে।

উপাদান	পরিমাণ
চালের কুঁড়া	৫০%
সরিষার খৈল	৪৫%
চিটাগুড়	৫%

খাদ্য তৈরির পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় পরিমাণ সরিষার খৈল কোনো পাত্রে ১০-১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভিজা খৈল, কুঁড়া, ও চিটাগুড় একত্রে মিশিয়ে ছোট গোল বল বানাতে হবে।

খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় : পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য থাকলে কার্পজাতীয় মাছের ক্ষেত্রে পুকুরে মজুদ মাছের মোট ওজনের শতকরা ৩ ভাগ হারে সম্পূরক খাদ্য দিতে হয়। শীতকালে শতকরা ২ ভাগ খাদ্যই যথেষ্ট।

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য দুই ভাগ করে সকাল ও বিকাল দুই বারে দিতে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময় খাবার দিলে অপচয় বা খাবার নষ্ট হয় না। প্রয়োজনীয় খাদ্য ঝুড়ি বা সানকিতে করে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে পানির নিচে ঝুলিয়ে দিতে হবে। একই সময়ে কয়েকটি স্থানে খাদ্য দিতে হয়। এতে প্রতিযোগিতা কম হয়।

পরিচর্যা

মাছের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও রোগ বালাই পরীক্ষার জন্য প্রতিমাসে একবার জাল টেনে মাছ পর্যবেক্ষণ করা উচিত। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটন জলজ পরিবেশের নিয়ন্ত্রক উপাদান। এ জন্য নিয়মিত এগুলোর পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করা দরকার। পূর্বে বর্ণিত উপায়ে পানির স্বচ্ছতা নির্ণয় করে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ জানা যায়। ১০০ লিটার পানি প্ল্যাংকটন নেটে ছেঁকে নিলে যদি ১-২ মিলি লিটার প্ল্যাংকটন পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে যথেষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

মাছ আহরণ

মাছ আহরণ মাছ চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরপর খাদ্য গ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও সে হারে দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে না। এ জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মাছ আহরণ গুরুত্বপূর্ণ। রুই, কাতলা, মৃগেল ৮-১২ মাসের মধ্যে ৭০০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি পর্যন্ত হয়। সিলভার কার্প, মিরর কার্প, গ্রাস কার্প ৬-৭ মাসের মধ্যেই ১-১.৫ কেজি হয়। পোনা মজুদের ৬-৭ মাস পর বড় মাছগুলো ধরে বিক্রি করে দিতে হবে। সেই সাথে সমসংখ্যক একই প্রজাতির বড় পোনা পুকুরে ছাড়তে হবে। এতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়।

মাছের চাষে কিছু সমস্যা ও তার প্রতিকার পানির উপর সবুজ আস্তরণ : পুকুরের পানি দীর্ঘ সময় গাঢ় সবুজ থাকলে বা পানির উপর সবুজ আবরণের আস্তরণ পড়লে সার ও খাদ্য দেওয়া সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। অতিরিক্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের জন্য এরূপ স্তর হয়। এর ফলে অক্সিজেনের অভাবে মাছ মারা যেতে পারে।

মাছের খাবি খাওয়া : পুকুরে অক্সিজেনের অভাব হলে মাছ খাবি খায়। এই অবস্থায় পুকুরে বাঁশ পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে পানি ওলটপালট করার ব্যবস্থা করলে সুফল পাওয়া যায়। পাম্প দিয়ে পুকুরে ফোয়ারার মতো পানি ছিটিয়ে দিতে পারলে সাময়িকভাবে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

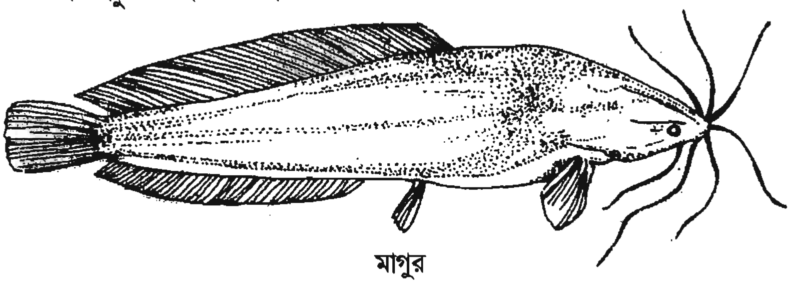
প্রতি শতকে ১ মিটার পানির গভীরতার জন্য ১০০ গ্রাম হারে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করে অক্সিজেনের অভাব দূর করা যায়।

খাদ্যের ব্যবহার পরীক্ষা : পুকুরে দেওয়া সম্পূরক খাদ্য মাছ পুরোপুরি গ্রহণ করছে কিনা খাদ্য দেওয়ার জায়গা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে তা নিশ্চিত হওয়া দরকার।

পানি ঘোলা থাকা : পুকুরের পানি সবসময় ঘোলা থাকলে মাছের উৎপাদন কম হয়। এজন্য প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরের কোনায় খড়ের আঁটি রেখে দিলেও ঘোলা ভাব দূর হয়।

মাছের রোগ : মাছে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। যেমন- পাখনা পচা, উকুন, দাগ ক্ষত, ড্রপসি ইত্যাদি। এসব রোগ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিং-মাগুরের চাষ : শিং-মাগুর খুব সুস্বাদু মাছ। এর পুষ্টিমান বেশি এবং রোগীর পথ্য হিসেবে বহুল ব্যবহার ও স্বাদের কারণে বাজারে এসব মাছের প্রচুর চাহিদা আছে।



মাগুর

এরা সর্বভুক শ্রেণীর মাছ। পোকা-মাকড়ের শূককীট, মুককীট, প্রাণিকণা এবং পচা জৈব পদার্থ শিং-মাগুরের খাদ্য। শিং-মাগুর মাছ বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সর্বত্র ও আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশি মাগুর প্রায় ৩০-৪৫ সেমি লম্বা হয়ে থাকে।

ছোট বড় সব ধরনের পুকুরেই শিং-মাগুর চাষ করা যায়। তবে অগভীর ছোট পুকুরই এদের চাষের জন্য ভালো। পানির গভীরতা ২-৩ মিটার হলে ভালো হয়। পুকুরের আয়তন ২০০ বর্গমিটার থেকে ৪০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত হতে পারে। পুকুরের পাড় অবশ্যই খাড়া হতে হবে। পুকুর পাড়ে ৩০ সেমি ইটের খাড়া দেওয়াল বা বাঁশের বেড়া দিলে ভালো হয়। কার্পের পুকুর প্রস্তুতির পদ্ধতি অনুসারে শিং-মাগুরের জন্য পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে শিং-মাগুরের পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি কিছু খামারেও বিদেশি মাগুরের পোনা পাওয়া যায়। শিং-মাগুর চাষের ক্ষেত্রে প্রতি ৪০ বর্গমিটারে ২০০-৩০০ পোনা ছাড়া যায়। এদের পুকুরে সার কম ব্যবহার করা হয়। ৭ দিন পর পর প্রতি ৪০ বর্গমিটারে ১ কেজি হারে গোবর দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল ও ফিশমিল খাদ্য হিসেবে দেওয়া যায়। মাছের মোট ওজনের ৩-৫% হারে প্রতিদিন খাবার দিতে হয়। তবে চাষের তৃতীয় মাস থেকে গরু-ছাগলের নাড়িভুঁড়ি কেটে দেওয়া যায়।

নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ ও পরিচর্যা করলে ৬ মাসে একটি মাগুর ১৩০-১৫০ গ্রাম এবং একটি শিং ১০০-১২৫ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। ৬ মাসেই শিং-মাগুরের একটি ফসল পাওয়া যায়। প্রতি ফসলে হেক্টর প্রতি ৩-৪ টন উৎপাদন পাওয়া যায়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ পুকুরে প্রয়োগের জন্য সারের পরিমাণ নির্ণয়

উপকরণ

১. মাপার জন্য ফিতা/টেপ
২. বিভিন্ন ধরনের সার
৩. খাতা
৪. পেন্সিল।

কাজের ধাপ

১. শিক্ষকের সাথে পুকুরের পাড়ে যাও। পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ফিতার সাহায্যে মিটারে মাপ ও খাতায় লেখ।
২. দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ কর। গুণফলকে ৪০ দিয়ে ভাগ দিয়ে শতকে পুকুরের আয়তন নির্ণয় কর।
৩. ইউরিয়া সারের মাত্রা অনুযায়ী মোট পরিমাণ নির্ধারণ কর।
৪. গোবর সারের পরিমাণ নির্ণয় কর।
৫. টিএসপি সারের পরিমাণ নির্ণয় কর।

৬. এমপি সারের পরিমাণ নির্ণয় কর।

৭. ব্যবহারিক খাতায় ছক আকারে পুকুরের আয়তন, সারের নাম ও পরিমাণ লেখ।

৮. পুকুরের আকার ও মাপ অনুযায়ী একটি চিত্র আঁক।

বিষয় ঃ পুকুরের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা পর্যবেক্ষণ

উপকরণ

১. প্লাস্টিকের বালতি
২. প্ল্যাংকটন নেট
৩. কাস্তে
৪. বিকার
৫. লম্বা কাঠি
৬. পুকুরের পানি
৭. ড্রপার
৮. অণুবীক্ষণ যন্ত্র
৯. পেন্সিল, স্কেল, ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. শিক্ষকের সাথে পুকুরের পাড়ে যাও। পাড়ে নেমে লম্বা কাঠির সাহায্যে ভাসমান ও ডুবন্ত আগাছা টেনে এনে বালতিতে ওঠাও।

২. বালতিতে করে পুকুরের পানি এনে প্ল্যাংকটন নেটের ওপর ঢালতে থাক। এভাবে পুকুরের বিভিন্ন স্থান থেকে আনুমানিক ১০০ লিটার পানি প্ল্যাংকটন নেটের ওপর ঢাল। এবার প্ল্যাংকটন নেটের শেষ প্রান্তে বোতলে জমাকৃত উদ্ভিদ ও প্রাণিকণাগুলো বিকারে ঢেলে নাও।

৩. বিকারে প্ল্যাংকটনের পরিমাণ দেখে নাও এবং সংগৃহীত উপাদানগুলো বিদ্যালয়ের গবেষণাগারে নিয়ে আস।

৪. এবার প্ল্যাংকটনের বিকার থেকে ড্রপার দিয়ে দু'এক ফোঁটা পানি স্লাইডের ওপর নাও এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখ। প্রাণী ও উদ্ভিদ কণাগুলো পর্যবেক্ষণ কর।

৫. বড় আগাছাগুলো দেখ ও শ্রেণীবিভাগ কর।

৬. ব্যবহারিক খাতায় সব উপাদানের ছবি আঁক ও চিহ্নিত কর।

বিষয় ঃ চাষ উপযোগী মাছের পোনা শনাক্তকরণ

উপকরণ

১. রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, কমন কার্প ও মাছের পোনা।
২. ব্যবহারিক খাতা
৩. আতশি কাচ
৪. ট্রে
৫. বালতি
৬. এক টুকরা কাপড়
৭. পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ খামারে যাও। সেখানে যে সব পোনা পাওয়া যায়। সেগুলো বালতিতে করে ঢেকে বিদ্যালয়ে আন।

২. পরীক্ষাগারে ট্রের ওপর ৪টি পোনা রাখ (পোনাগুলো যদি লাফালাফি করে তবে লবণ পানিতে ডুবিয়ে সহজেই এদের মেরে ফেলতে পারবে)

৩. এবার মাছের পোনাগুলোকে ভালোভাবে পরীক্ষা কর। এদের মাথা, মুখ, দেহ, পাখনা, রং, আঁশ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ কর।

৪. পাঠ্যপুস্তকের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে দেখ। কোনটি কোন মাছের পোনা তা শনাক্ত কর এবং বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

৫. এবার শনাক্তকৃত পোনাগুলোর চিত্র আঁক। অংশগুলো চিহ্নিত কর এবং পোনার নাম লেখ।

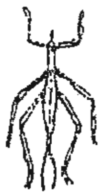
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পুকুরের মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ?

ক. দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড খ. পানির গভীরতা
গ. পানির স্বচ্ছতা ঘ. সূর্যালোক

২. নিচের চিত্রে কোনটি জুপ্ল্যাংকটন?


চিত্র -১


চিত্র- ২


চিত্র -৩


চিত্র - ৪

ক. চিত্র -১ খ. চিত্র -২
গ. চিত্র -৩ ঘ. চিত্র -৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। মৎস্য চাষি রহিমের বাড়ির পাশে একটি বড় পুকুরে সে দিন সকাল ৯:০০ টা থেকে হঠাৎ মাছ খাবি খেতে শুরু করে।

৩. হঠাৎ করে মাছ খাবি খেতে শুরু করল কারণ -
i. সূর্যের আলোর অভাবে
ii. মেঘের গর্জনে
iii. জলজ উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষণ না হওয়ায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। পুকুরের মাছ রক্ষায় তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় কী?

ক. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে খবর দেওয়া

খ. পুলিশকে খবর দেওয়া

গ. পাম্প দিয়ে পুকুরে ফোয়ারার মতোপানি ছিটানো

ঘ. বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানি ওলট পালট করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

গোবিন্দগঞ্জ গ্রামের শানতু বাবু ২$\frac{১}{২}$ মিটার গভীর পুকুরে প্রথম বারের মতো পোনা চাষ শুরু করেন। গত দু'দিন টানা বর্ষণের কারণে তিনি পুকুর পরিদর্শনে যেতে পারেননি। তৃতীয় দিন সকালে তিনি পুকুরে গিয়ে দেখেন বেশ কিছু রেণু ও ধানি পর্যায়ের পোনা মরে পানিতে ভাসছে। এ অবস্থায় দিশেহারা শানতু বাবু দ্রুত মৎস্য কর্মকর্তার কাছে গেলে কর্মকর্তা তার পুকুরটি পরিদর্শন শেষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে শানতু বাবু নতুন ২টি পোনা পুকুর তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

ক. প্ল্যাংকটন কী?

খ. শানতু বাবুর পুকুরে পোনা মারা যাবার প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. কীভাবে শানতু বাবু নতুন পোনা পুকুর তৈরি করবে?

ঘ. "যে ধরে জাটকা তারে ধরে আটকা" শ্লোগানটি মূল্যায়ন কর।

অথবা

"তৈরি করব আদর্শ পুকুর- মাছ ফলাবো প্রচুর" শ্লোগানটি বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিংড়ি চাষ

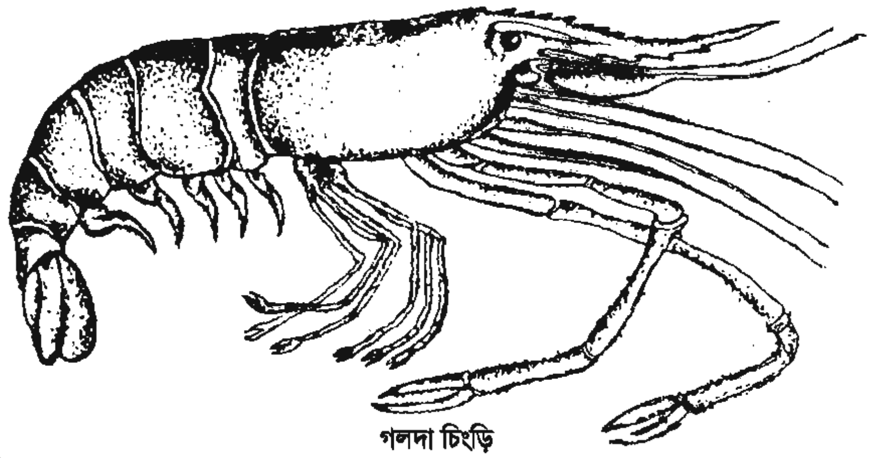
চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদ। এটি সন্ধিপদ অমেরুদণ্ডী জলজ প্রাণী। প্রতিবছর যে পরিমাণ মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়, *তা থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় তার শতকরা ৯০ ভাগ আসে চিংড়ি থেকে। *২০০৬-২০০৭ সালে মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি করে ৩,৩৫২.৮৯ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এর মধ্যে চিংড়ি থেকে আয়ের পরিমাণ ২৯৯২.৩৩ কোটি টাকা। এই সময়ে মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ ৭৩,৭০৪ মেট্রিক টন। এর মধ্যে এককভাবে চিংড়ি রপ্তানির পরিমাণ ৫৩,৩৬১ মেট্রিক টন।

চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ২.২০ লক্ষ হেক্টর চিংড়ি চাষের উপযোগী জমি রয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ১.১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে, যেখানে বছরে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন মাত্র ১৮০-২০০ কেজি ছিল। *২০০৬-২০০৭ সালে বছরে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন প্রায় ৩৯৯ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। আধানিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করলে এক ফসলেই (৬ মাস) প্রতি হেক্টরে ৫-৬ টন উৎপাদন সম্ভব। বর্তমানে দেশের কিছু কিছু চিংড়ি খামারে এই পদ্ধতিতে চাষ আরম্ভ হয়েছে। এই পদ্ধতি সম্প্রসারিত হলে চিংড়ি রপ্তানি করে প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

চাষ উপযোগী চিংড়ির পরিচিতি

বাংলাদেশের জলাশয়ে ৬০ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি চাষের জন্য লাভজনক। স্বাদু পানিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়ে থাকে। এই জাতের চিংড়ি খুব বড় হয়। একটি গলদা ওজনে ২৫০-৪০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। লোনা পানির চিংড়ির মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় বাগদা চিংড়ির ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। এটি ব্ল্যাক টাইগার নামে পরিচিত। লোনা পানিতে চাগ্যা/চাপদা চিংড়ির চাষও করা হয়।



গলদা চিংড়ি

গলদা চিংড়ি চাষ

বাসস্থান : গলদা চিংড়ি স্বাদু পানিতে বাস করে।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য : গলদা চিংড়ি দেখতে হালকা সবুজ বর্ণ থেকে বাদামি বা কালচে রঙের হয়। পোনার ক্যারাপেসের খোলসে ২-৫টি কালচে আড়াআড়ি দাগ থাকে। রোস্ট্রাম লম্বা ও বাঁকানো এবং উপরে ও নিচে খাঁজ কাটা থাকে। রোস্ট্রামের গায়ে খাঁজ সংখ্যা পুরুষ গলদার ক্ষেত্রে ওপরের দিকে ১২-১৫টি ও নিচের দিকে ১১-১৪টি এবং স্ত্রী গলদার

---

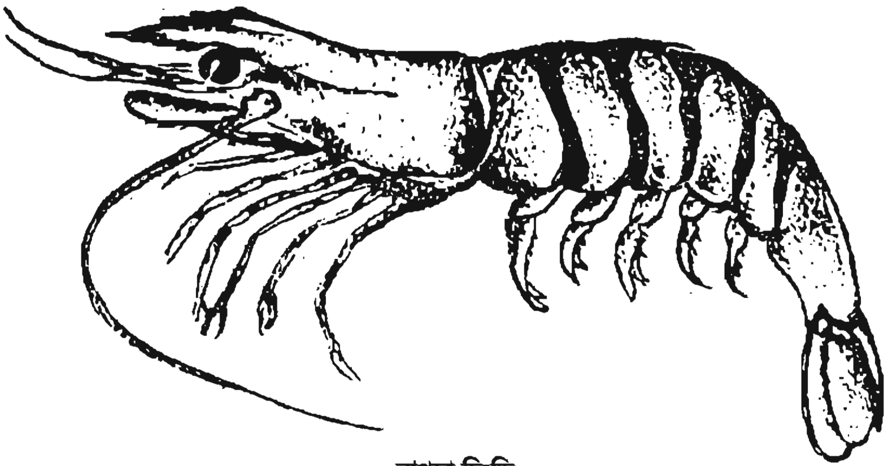
*উৎস : FIQC, DoF DHAKA-2006-2007

*উৎস : বাংলাদেশ মৎস্য পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০৬-২০০৭

ক্ষেত্রে উপরের দিকে ১২-১৩টি ও নিচের দিকে ৫-৭টি। গলদা চিংড়ির শিরঃবক্ষ বেশ বড়। গলদার পা বেশ লম্বা। প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়া পা চিমটাযুক্ত। পুরুষ গলদার দ্বিতীয় পা জোড়া স্ত্রী গলদার তুলনায় বেশ লম্বা।

বাগদা চিংড়ি

বাসস্থান : বাগদা চিংড়ি লোনা পানিতে বাস করে।

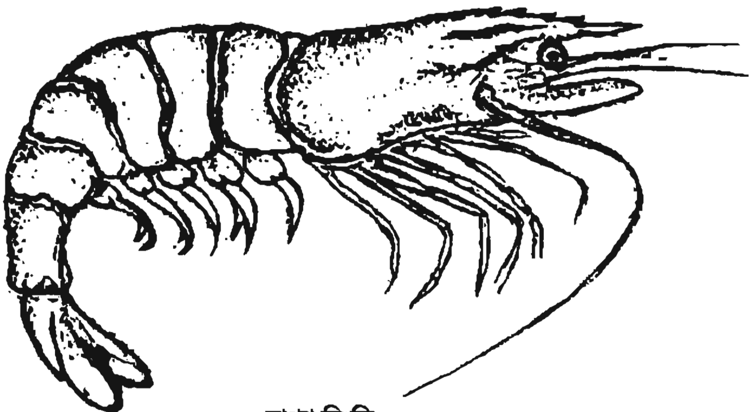


বাগদা চিংড়ি

দৈহিক বৈশিষ্ট্য : বাগদার বর্ণ হালকা বাদামি বা সবুজ। এর গায়ে বাঘের মতো ডোরা কাটা কালচে দাগ থাকে। এই জন্য একে ব্ল্যাক টাইগার বলা হয়ে থাকে। বাগদার পোনার দেহের সম্মুখ থেকে শেষ পর্যন্ত লাল দাগ দেখা যায়। একটু বড় পোনায় এই দাগটি ঈষৎ সবুজ রঙের হয়। বাগদা চিংড়ির রোস্ট্রামটি বাঁকা ও প্রশস্ত। এর উপরের দিকে ৮টি ও নিচের দিকে ৩টি খাঁজ কাটা থাকে।

চাগ্যা/চাপদা চিংড়ি

বাসস্থান : এই চিংড়িও লোনা পানিতে বাস করে।



চাগ্যা চিংড়ি

দৈহিক বৈশিষ্ট্য : পোনার রং ঈষৎ সাদা, রোস্ট্রামের অগ্রভাগ গোলাপি রঙের। বড় চিংড়ির রোস্ট্রাম খাড়া ও বাঁকা। এর উপরের দিকে ৮-১০টি এবং নিচের দিকে ৩টির বেশি খাঁজ কাটা থাকে।

গলদা চিংড়ির একক চাষ

গলদা চিংড়ি পুকুরে এককভাবে অথবা রুই কাতলা মাছের সঙ্গে মিশ্র চাষও করা যায়। এখানে গলদা চিংড়ির একক চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পুকুর নির্বাচন

চিংড়ি চাষের পুকুরে অধিক অক্সিজেন প্রয়োজন হয় বিধায় পুকুরের পানি মাঝে মাঝে পরিবর্তন করতে হয়। এজন্য নদ-নদী, খালবিল বা নলকূপের পাশে পুকুরের জন্য স্থান নির্বাচন করা উচিত। দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ বা এঁটেল মাটি চিংড়ির পুকুরের জন্য উপযোগী। পুকুরে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়ে এ জন্য পুকুর পাড়ে কোনো বড় গাছ রাখা ঠিক নয়। পুকুরের আকার ১০ শতক থেকে ১ একর পর্যন্ত এবং গভীরতা ১-১.৫ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুকুর প্রস্তুতি

প্রথমে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে। এতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ সম্পূর্ণ দূর হবে। পুকুরের তলায় রোদ পড়ার ফলে ক্ষতিকর গ্যাস ও রোগজীবাণু ধ্বংস হবে। পুকুর শুকানো না হলে প্রতি ঘনমিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছ দূর করা যায়।

রাক্ষুসে মাছ অপসারণের পর প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর প্রতি শতকে গোবর ৫ কেজি বা মুরগির বিষ্ঠা ৩ কেজি, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম, টিএসপি ৫০ গ্রাম এবং ২০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার দেওয়ার ১ দিন পর হররা টেনে ক্ষতিকর গ্যাস বের করে দিতে হবে।

পোনা মজুদ

সার দেওয়ার ৫-৭ দিন পর পুকুরের পানির রং হালকা সবুজ হলে পুকুরে চিংড়ির পোনা ছাড়তে হবে। পুকুরের মাটির উর্বরতা, পানির গুণাগুণ, সম্পূরক খাদ্য ও ব্যবস্থাপনার ওপর পোনা মজুদের সংখ্যা নির্ভর করে। সাধারণ ব্যবস্থাপনায় গলদার একক চাষে একর প্রতি ১০,০০০ টি পোনা ছাড়া যেতে পারে। উত্তম পানি ব্যবস্থাপনা এবং সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে আরো অধিক হারে পোনা মজুদ করা যায়। পোনা পরিবহণ ও পুকুরে ছাড়ার পদ্ধতি পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত কার্পজাতীয় মাছের অনুরূপ।

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ

পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাদ্যে চিংড়ির পূর্ণ পুষ্টি সাধন হয় না। এদের দ্রুত বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের ওপর পুকুরে চিংড়ি চাষের সফলতা নির্ভর করে।

নিচে ১ কেজি সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন উপাদান ও পরিমাণ দেওয়া হল।

উপাদান	পরিমাণ
চালের কুঁড়া বা গমের ভুসি	৫০০ গ্রাম
সরিষার খৈল	১৫০ গ্রাম
শুঁটকির গুঁড়া / ফিশমিল	২৫০ গ্রাম
শামুক-ঝিনুকের খোলসের গুঁড়া	৯৫ গ্রাম
লবণ	৩ গ্রাম
ভিটামিন মিশ্রণ	২ গ্রাম
মোট	১০০০ গ্রাম

দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ

পুকুরে মজুদকৃত চিংড়ির মোট ওজনের শতকরা ৪ ভাগ হারে খাদ্য প্রতিদিন দিতে হবে। প্রয়োজনীয় খাদ্য বিকালে দিতে হবে।

চিংড়ির বয়স অনুযায়ী প্রতি ১০০০ পোনার জন্য প্রতিদিন যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তার একটি তালিকা নিচের ছকে দেওয়া হল।

পোনার বয়স	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ
প্রথম মাস	১৫ গ্রাম
দ্বিতীয় মাস	৭৫ গ্রাম
তৃতীয় মাস	২৫০ গ্রাম
চতুর্থ মাস	৪০০ গ্রাম
পঞ্চম মাস	১ কেজি
ষষ্ঠ মাস	২ কেজি
সপ্তম মাস	২.৫-৩.০ কেজি

সার প্রয়োগ

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দেওয়ার জন্য পুকুরে সার দেওয়া প্রয়োজন। দুই সপ্তাহ পরপর একর প্রতি গোবর ১৫ কেজি, ইউরিয়া ৬ কেজি, টিএসপি ২.৫ কেজি এবং ১ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া এসব সার কোনো পাত্রে ৩ গুণ পানির মধ্যে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সূর্য ওঠার ২-৩ ঘণ্টা পর মিশিয়ে নিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

আশ্রয়স্থল স্থাপন : বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় চিংড়ি খোলস পাল্টিয়ে থাকে। খোলস পাল্টানোর সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। এই সময় চিংড়ি অন্য কোনো প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্য পুকুরে কিছু পাতাবিহীন ডালপালা এবং বাঁশ পুঁতে দেওয়া প্রয়োজন। এতে চিংড়ি আশ্রয় নিতে পারে।

চিংড়ি আহরণ ও বিক্রি

সাধারণত ৬-৭ মাসের মধ্যে গলদা চিংড়ি বিক্রির উপযুক্ত হয়। ১০-১৫ টি চিংড়ি ১ কেজি ওজনের হলে তা ধরে বিক্রি করা যায়। বড় ফাঁসের জাল ব্যবহার করে শুধুমাত্র বড় আকারের চিংড়ি ধরা যায়। অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় চিংড়ি আহরণের উপযুক্ত সময়। এসময় চিংড়ির খোলস শক্ত থাকে। চিংড়ি আহরণের সাথে সাথে ছায়াযুক্ত স্থানে বরফ দিয়ে রাখতে হবে এবং তাড়াতাড়ি বিক্রয় করে দিতে হবে।

উৎপাদন

বর্ণিত ব্যবস্থাপনায় চাষ করলে শতক প্রতি ৮-১০ কেজি গলদা চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব।

উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা বিদ্যমান। এই এলাকা সাতক্ষীরা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত।

উপকূলীয় এলাকায় সাধারণত ৩টি পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

১. সনাতন পদ্ধতিতে চাষ
২. উন্নত হালকা পদ্ধতিতে চাষ
৩. আধানিবিড় পদ্ধতিতে চাষ।

সনাতন পদ্ধতিতে চাষ

উপকূলীয় ভেড়ি বাঁধ এলাকায় জোয়ারের পানির সাথে আগত চিংড়ি পোনা, মাছ ইত্যাদি একত্রে পালন করাকে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ বলা হয়। এক্ষেত্রে শতক প্রতি উৎপাদন ৭০০ গ্রামের মতো। এরূপ চাষে পানি পরিবর্তন করা হয় না এবং সার বা খাদ্য দেওয়া হয় না। চাষের সময়কাল ৫-৬ মাস এবং খামারের আয়তন ৪০-৫০ হেক্টর।

উন্নত হালকা পদ্ধতিতে চাষ

মৎস্যভুক মাছ ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী দমন করে লোনা পানিতে বাগদা, চাগ্যা ইত্যাদি চিংড়ির চাষকে উন্নত হালকা পদ্ধতিতে চাষ বলা হয়। এক্ষেত্রে জোয়ারের পানি ঘেরে প্রবেশ করানো হয়। প্রবেশপথে জাল স্থাপন করে ছেঁকে পানি তোলা হয়। ঘেরের পানি মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা হয়। চুন ও সার প্রয়োগের পর ঘের প্রস্তুত করা হয় এবং খাদ্য দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে উন্নত সনাতন পদ্ধতির চাষও বলা হয়।

আধানিবিড় পদ্ধতিতে চাষ

এই পদ্ধতিতে মৎস্যভুক মাছ, ক্ষতিকর প্রাণী, অন্যান্য চিংড়ি ও মাছ দমনের পর একর প্রতি ৭৫০০-১৫০০০টি বাগদার পোনা ছেড়ে নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। এক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতিকরণ, ভালো চিংড়ি পোনা ছাড়া, পরিমিত খাদ্য প্রয়োগ, পানি পরিবর্তন ও পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ চাষের বেলায় শতক প্রতি ২০ কেজি পর্যন্ত চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে।

উন্নত হালকা পদ্ধতিতে ঘেরে চিংড়ি চাষ

দেশের ব্যাপক চিংড়ি চাষ এলাকায় আধানিবিড় বা নিবিড় চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। এজন্য সনাতন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ভেড়িবাঁধের ভেতরে লোনাপানির বড় জলাশয়ে সাধারণভাবে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে আইল বা পাড় দিয়ে বড় জলাশয়কে ২-৩ একর আয়তনের ছোট জলাশয়ে পরিণত করা হয়। এরূপ জলাশয়কে ঘের বলা হয়। উন্নত হালকা চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য ঘেরে পানি ঢুকানোর পথে জাল দিয়ে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পানির সাথে রাক্ষুসে কিংবা অবাঞ্ছিত মাছ ঢুকতে না পারে। ঘেরে পানির গভীরতা ০.৮০-১ মিটার রাখতে পারলে ঘেরের পরিবেশ ভালো থাকে। রাক্ষুসে প্রাণী দমন, চুন, সার প্রয়োগের মাধ্যমে যথারীতি ঘের প্রস্তুতের পর বাগদার পোনা মজুদ করা হয়ে থাকে। সাধারণত মাঘ-ফাল্গুন মাসে ঘেরে বাগদার পোনা মজুদ করা হয়। শতক প্রতি ২০০ টি পর্যন্ত বাগদার পোনা মজুদ করা হয়। পোনা মজুদের পর সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দেওয়া হয়। পানির গুণাগুণ, লবণাক্ততা, ঘেরের পরিবেশ যথাযথ রাখার জন্য মাসে মাসে পানি পরিবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ৭-৮ মাসে শতক প্রতি ৮-১০ কেজি বাগদা চিংড়ি উৎপাদন করা যায়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ গলদা ও বাগদা চিংড়ি শনাক্তকরণ

উপকরণ

১. গলদা ও বাগদা চিংড়ি
২. ট্রে
৩. চিমটা
৪. আতশি কাচ
৫. ব্যবহারিক খাতা

কাজের ধাপ

১. বাজার বা খামার থেকে গলদা ও বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে সাবধানে নিয়ে এসো।
২. ট্রের ওপর চিংড়িগুলো রাখ। এর সূক্ষ্ম অঙ্গগুলো আতশি কাচ দিয়ে দেখ।
৩. চিংড়ির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন- পায়েল আকৃতি, ক্যারাপেসের ওপর চিহ্ন, রং, দেহের দাগ, রোস্ট্রামের খাঁজ সংখ্যা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ কর এবং বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে কোন জাতের চিংড়ি তা শনাক্ত কর।
৪. গলদা ও বাগদা চিংড়ির ছবি এঁকে বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গলদার একক চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের গভীরতা কত মিটার হওয়া উচিত?

ক. ১-১.৫ খ. ২-২.৫
গ. ৩-৩.৫ ঘ. ৪-৪.৫

২. লোনা পানিতে চাষ করা হয়-

i. চাপদা চিংড়ি
ii. গলদা চিংড়ি
iii. বাগদা চিংড়ি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

ছকটি পড় ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১ কেজি চিংড়ির সম্পূরক খাদ্যের উপাদানের তালিকা নিম্নরূপ-

উপাদান	পরিমাণ
চালের কুঁড়া/গমের ভুসি	৫০০ গ্রাম
সরিষার খৈল	১৫০ গ্রাম
ফিসমিল	২৫০ গ্রাম
শামুক-ঝিনুকের খোলসের গুঁড়া	৯৫ গ্রাম
লবণ	৩ গ্রাম
ভিটামিন মিশ্রণ	২ গ্রাম
মোট	১০০০ গ্রাম

৩। যদি একজন চিংড়ি চাষির নিকট ২.০০ কেজি চালের কুঁড়া থাকে, তার সুষম খাদ্য প্রস্তুত করতে তাকে কী পরিমাণ লবণ মেশাতে হবে?

ক. ৮ গ্রাম খ. ১০ গ্রাম
গ. ১২ গ্রাম ঘ. ১৪ গ্রাম

৪। ৫ কেজি সম্পূরক খাদ্য তৈরি করতে তাকে কী পরিমাণ ভিটামিন মিশ্রণ মেশাতে হবে?

ক. ৮ গ্রাম খ. ১০ গ্রাম
গ. ১২ গ্রাম ঘ. ১৪ গ্রাম

সৃজনশীল প্রশ্ন

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে কিশোর ফিরোজ বৃদ্ধ পিতার সহযোগিতায় বাগদা চিংড়ি পোনা আহরণ করে। ফিরোজের অদক্ষ হাতে বাছাইকৃত পোনা ক্রয় করে নতুন চিংড়ি চাষি তাজুল তার ঘেরে ছেড়ে দেয়। তিনি ঘেরে সম্পুরক খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি সার প্রয়োগ ও পানি পরিবর্তন করেন। তথাপি সে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পায়নি।

ক. উপকূলীয় এলাকায় কয়টি পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়?
খ. ঘেরের পানি পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. তাজুলের চিংড়ি চাষে ব্যর্থতার কারণগুলো চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?
ঘ. ফিরোজের পোনা আহরণের অদক্ষতা বাগদা চিংড়ি চাষে প্রতিবন্ধক- বক্তব্যটির স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাছের রোগ ও প্রতিকার

রোগ জীবাণু ও পরিবেশগত পীড়নের পারস্পরিক ক্রিয়ায় মাছের দেহে রোগ সৃষ্টি হয়। সাধারণত নিম্নরূপ কারণসমূহের জন্য মাছের রোগ বালাই দেখা দিতে পারে।

১. পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণের পরিবর্তন
২. অপুষ্টি বা মানসম্পন্ন খাদ্যের অভাব
৩. রোগ জীবাণুর সংক্রমণ
৪. পরজীবীর আক্রমণ
৫. নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক মাছ মজুদকরণ
৬. অতিরিক্ত সার প্রয়োগ
৭. পানি দূষণ।

জলাশয়ের পরিবেশ বিরূপ হলে বা মাছ রোগে আক্রান্ত হলে নিম্নরূপ লক্ষণগুলো দেখা যায়।

১. অস্বাভাবিক ভাবে সাঁতার কাটা
২. পানির উপরিভাগে ভেসে খাবি খাওয়া
৩. পাখনা ক্ষয় হয়ে যাওয়া বা ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া
৪. চোখ বের হয়ে আসা
৫. আঁশ ফুলে ওঠা বা খসে পড়া
৬. ত্বক, পাখনা বা ফুলকায় দাগ বা ক্ষত সৃষ্টি হওয়া বা পরজীবীর উপস্থিতি
৭. দেহে সূক্ষ্ম সাদা সুতার মতো বস্তুর উপস্থিতি
৮. পাখনা পচা বা খসে পড়া
৯. দেহের তুলনায় মাথা বড় হওয়া অথবা পেট ফুলে ওঠা বা শুকিয়ে যাওয়া
১০. স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও বৃদ্ধি না থাকা

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

সাদা দাগ বা ফুটকি রোগ

এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ

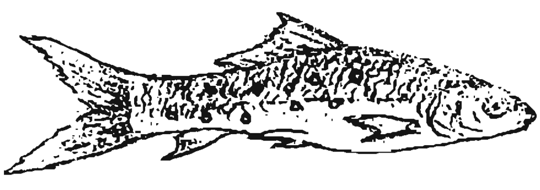
মাছের মাথা, পৃষ্ঠদেশ ও পাখনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার সাদা দাগ বা ফুটকি দেখা দেয়। দেহে অতিরিক্ত পিচ্ছিল পদার্থ জমা হয়। মাছ অলসভাবে চলাফেরা করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে না। বেশি আক্রান্ত মাছ দ্রুত মারা যায়।

প্রতিরোধ

পুকুর প্রস্তুতির সময় পরিমিত পরিমাণ চুন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিকার

১। পুকুরের প্রতি শতকে ১ মিটার গভীরতার জন্য ১০০-১৫০ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (পটাশ) পানিতে মিশিয়ে নিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। অথবা



ফুটকি রোগে আক্রান্ত মাছ

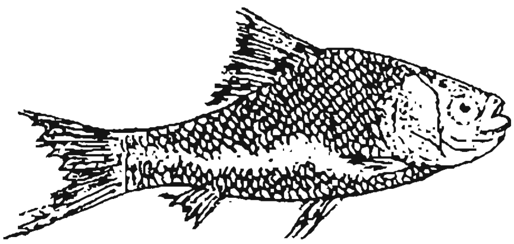
২. আক্রান্ত মাছকে ২-৩% লবণ পানিতে ৩০ মিনিট বা ৫% এমোনিয়া দ্রবণে ১ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

পাখনা ও লেজ পচা রোগ

এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ

প্রথমে মাছের লেজ ও পাখনায় সাদা দাগ পড়ে। পাখনার পর্দা ছিঁড়ে যায়। পাখনা ও লেজ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে মাছ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, রং ফ্যাকাসে হয় এবং অবশেষে মারা যায়।



পাখনা ও লেজ পচা রোগে আক্রান্ত মাছ

প্রতিরোধ

প্রতি শতকে ১ কেজি লবণ ও ১ কেজি চুন পূর্বাহ্নে প্রয়োগ করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

প্রতিকার

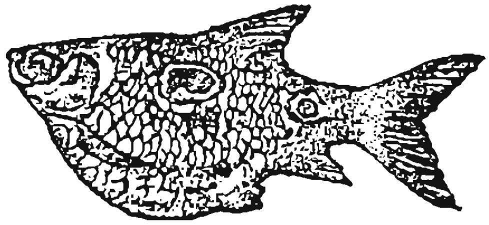
১. আক্রান্ত মাছের পাখনা কেটে ফেলে শতকরা ২.৫ ভাগ লবণে ধুয়ে নিতে হবে। অথবা
২. ১ লিটার পানিতে ০.৫ গ্রাম তুঁতে মিশিয়ে ঐ দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে ১ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছাড়তে হবে।

ড্রপসি বা পেটফুলা রোগ

এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।

লক্ষণ

মাছের দেহ অভ্যন্তরের এক বা একাধিক অঙ্গে তরল পদার্থ জমে যায়। পেট ফুলে ওঠে। চোখ বের হয়ে আসে। আঁশ ঢিলা হয়ে যায় ও ফুলে ওঠে। পেটে চাপ দিলে মলদ্বার দিয়ে পানি বের হয়ে আসে। আক্রান্ত মাছের অধিকাংশই মারা যায়।



ড্রপসি রোগে আক্রান্ত মাছ

প্রতিরোধ

পুকুর প্রস্তুতির সময় শতক প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

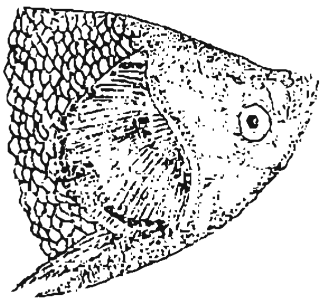
প্রতিকার

১. এ রোগে আক্রান্ত মাছ সাধারণত ভালো হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় পুকুরে প্রতি ঘনমিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
২. প্রতি কেজি খাবারের সঙ্গে ১০০ মিলিগ্রাম হারে টেরামাইসিন মিশিয়ে ৭ দিন খাওয়াতে হবে।

ছত্রাকজনিত রোগ

ফুলকা পচা রোগ

এটি ছত্রাকজনিত রোগ। এক শ্রেণীর ছত্রাক মাছের ফুলকার মধ্যে ঢুকে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে ফুলকার বাইরের অংশে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।



ফুলকা পচা রোগে আক্রান্ত মাছ

প্রতিরোধ

১. পুকুরে অতিরিক্ত জৈব পদার্থ জমতে দেওয়া যাবে না।
২. পূর্বাহ্নে পরিমিত মাত্রায় চুন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিকার

এ রোগে আক্রান্ত মাছ সাধারণত বাঁচে না। প্রাথমিক অবস্থায় এক লিটার পানিতে ৫ মিলিগ্রাম তুঁতে মিশিয়ে আক্রান্ত মাছকে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছেড়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

পরজীবীজনিত রোগ

মাছের উকুনজাত ক্ষত রোগ

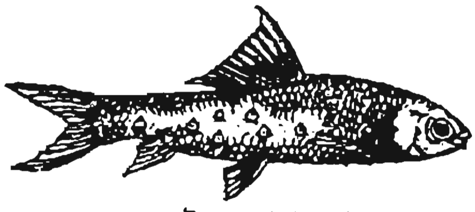
আরগুলাস নামের এক শ্রেণীর পরজীবীর আক্রমণে এ রোগ দেখা দেয়। আরগুলাস খালি চোখে দেখ যায়। আরগুলাস মাছের দেহে বা পাখনায় শোষক দ্বারা আটকে থেকে রক্ত শোষণ করে।



মাছের উকুন

রোগের লক্ষণ

মাছের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ক্ষতগুলোতে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে। মাছ পুকুরে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ছুটাছুটি শুরু করে ও শক্ত বস্তুতে গা ঘষতে থাকে।



উকুনে আক্রান্ত মাছ

প্রতিরোধ

পুকুরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে হবে।

প্রতিকার

১. প্রতি শতক জলাশয়ে ১ মিটার গভীরতার জন্য ৪০ গ্রাম ডিপটারেক্স ৭ দিন পর পর পুকুরে ২ বার প্রয়োগ করতে হবে। অথবা

২. ১৫-২০ নিযুতাংশ ফরমালিন দ্রবণে মাছকে ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছাড়তে হবে।

ভাইরাসজনিত রোগ

ক্ষত রোগ

প্রাথমিক পর্যায়ে ভাইরাস সংক্রমণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এটি একটি সংক্রামক রোগ। জলাশয়ের বিরূপ পরিবেশে এ রোগ দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ

মাছের দেহে প্রথমে লাল দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত অংশের আঁশ পড়ে যায়। লাল দাগ ক্রমে বড় ঘাতে পরিণত হয়। মাছ পানির উপর অলসভাবে ভেসে থাকে এবং খুব ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে। আক্রান্ত মাছ ১০-১৫ দিনেই মারা যায়।

প্রতিরোধ

পুকুর প্রস্তুতির সময় পরিমিত চুন প্রয়োগ করলে এ রোগের প্রকোপ কমে যায়।

প্রতিকার

১. আক্রান্ত পুকুরে প্রতি শতকে ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করতে হবে।

২. আক্রান্ত মাছ ৫ পিপিএম ম্যালাকাইট দ্রবণে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছাড়া যেতে পারে।

পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ

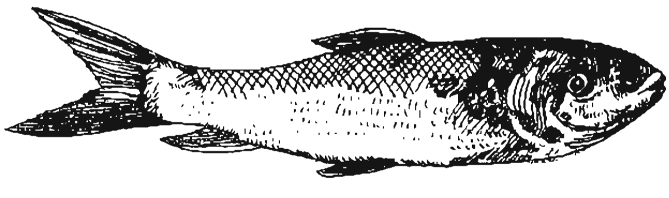
কোনো বিশেষ খাদ্য উপাদানের অভাবে মাছের দেহে যে বিশেষ ধরনের চিহ্ন বা লক্ষণ ফুটে ওঠে তাকে পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ বলে। আমিষ এবং ভিটামিনের অভাবই মাছের ক্ষেত্রে বেশি লক্ষ করা যায়।

লক্ষণ

আমিষের অভাবে মাছের বৃদ্ধি খুব কমে যায়। ফলে মাথা দেহের তুলনায় বেশি বড় দেখা যায়। ভিটামিনের অভাবে মাছের দেহের কোনো অংশ বাঁকা হয়ে যেতে পারে বা মাছ বিকলাঙ্গ হয়। আক্রান্ত মাছ ধীরে ধীরে মারা যায়।

প্রতিকার

সম্পূরক খাদ্যের সঙ্গে চাষকৃত মাছের চাহিদা অনুযায়ী আমিষ, ভিটামিন, খনিজ লবণ পরিমিত পরিমাণে মিশিয়ে মাছকে খাওয়াতে হবে।



অপুষ্টি রোগে আক্রান্ত কাতলা মাছ

ব্যবহারিক

বিষয় : মাছের রোগ শনাক্তকরণ

উপকরণ

১. রোগাক্রান্ত মাছ
২. একটি ট্রে
৩. চিমটা-২টি
৪. আতশি কাচ
৫. খাতা
৬. পেন্সিল।

কাজের ধাপ

১. প্রথমে রোগাক্রান্ত মাছটি ট্রেতে রাখ।
২. মাছটির দেহের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ কর।
৩. আতশি কাচ দিয়ে রোগাক্রান্ত অঙ্গ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।
৪. মাছটির ছবি ব্যবহারিক খাতায় আঁক এবং রোগাক্রান্ত অংশ চিহ্নিত কর।
৫. রোগের লক্ষণগুলো এবং রোগের নাম লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অভিজ্ঞ মৎস্য চাষি আলম একদিন সকালে দেখলেন তার পুকুরে ২/১টি মাছ অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ছুটাছুটি করছে এবং শক্ত বস্তুতে গা ঘষছে। এই দেখে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা নিলেন?

১. কেন মাছ অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ছুটাছুটি করছে এবং শক্ত বস্তুতে গা ঘষছে, কারণ-
   i. পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি হয়েছে।
   ii. পুকুরে পর্যাপ্ত সুর্যালোকের অভাবে।
   iii. আরগুলাস নামক পরজীবীর আক্রমণে।

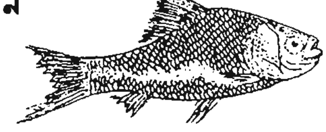
নিচের কোনটি সঠিক?

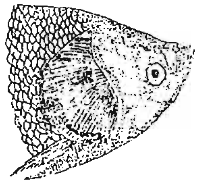
ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i ও ii

২. মৎস্য বিশেষজ্ঞ আলমকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?
ক. পুকুরে সার প্রয়োগ করতে   খ. পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে
গ. পুকুরে বাঁশ পিটিয়ে দিতে   ঘ. অনুমোদিত মাত্রায় ডিপটারেক্স ছিটাতে

৩. কিসের অভাবে মাছের বিকলাঙ্গা হতে পারে?
ক. আমিষের   খ. ভিটামিনের
গ. শর্করার   ঘ. খাদ্যের।

সৃজনশীল প্রশ্ন


চিত্র-ক


চিত্র-খ

ক. চিত্র- ক কোন রোগে আক্রান্ত ?
খ. চিত্র- খ এর আক্রান্তের ১টি প্রধান লক্ষণ ব্যাখ্যা কর।
গ. চিত্র- ক এবং চিত্র খ এর শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর?
ঘ. "চিত্রে উল্লিখিত রোগসহ মাছের নানাবিধ রোগ সফল মৎস্য চাষের অনতরায়" বিষয়ের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ

মাছের স্বাদ ও গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কোনো জলাশয় হতে মাছ আহরণের পর যথাযথভাবে পরিবহণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণের এই প্রক্রিয়াকে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলা হয়। মাছ অতি দ্রুত পচনশীল জীব। আহরণের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর হতে মাছের পচন শুরু হয় এবং তা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এই জন্য মাছ আহরণের পর পরই এর মান বা গুণাগুণ হ্রাস পেতে শুরু করে। মাছ ধরার পর থেকে শুরু করে বাজারে আনা, বিক্রি ও ভোক্তার খাওয়ার উপযোগী করতে বেশ কিছুটা সময় চলে যায়। এই সময়ের মধ্যে মাছ সংরক্ষণ করা না হলে তা পচে গিয়ে খাবার অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। আর মাছ পচা শুরু করলে কোনোভাবেই তা পূর্বাবস্থায় ফেরানো যায় না। সুতরাং মাছের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আহরণের পর থেকে শুরু করে ভোগ করা পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিবহণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

নানাবিধ কারণ মাছের গুণগতমান বিনষ্ট বা মাছের পচনকে প্রভাবিত করে। যথা-

১. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মৃত মাছ রাখা।
২. আহরণের পর নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণের জন্য বরফের ব্যবহার না করা।
৩. মাছ ধোয়ার জন্য অস্বাস্থ্যকর ও দূষিত পানি ব্যবহার।
৪. পরিবহণকালে অপরিষ্কার যানবাহন ব্যবহার করা, কম বরফ ব্যবহার করা এবং বরফ ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা।
৫. সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থাসহ বাজারজাতকরণের সুবিধা না থাকা।

মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাছ ও চিংড়ির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি আয়ে মাছ ও চিংড়ির অবদান তৃতীয়। মাছ, চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে * ২০০৬-২০০৭ সালে ৩৩৫২.৮৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে যা মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫%। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন যেমন বেড়েছে, দেশে বিদেশে মানসম্পন্ন মাছ ও চিংড়ির চাহিদাও ক্রমশ বাড়ছে। আহরণোত্তর পরিচর্যার যে অভাব এতদিন বিরাজ করছিল বর্তমানে তার উন্নয়ন ঘটেছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের মাছ ও চিংড়ির চাহিদা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যে উন্নয়নের ফলেই এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই বিপুল সম্ভাবনাময় সম্পদের গুণগতমান যথাযথভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সঠিক রেখে রপ্তানি করা হলে বিদেশে এর চাহিদা যেমন আরো বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথও প্রসারিত হবে। এতে জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাছের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২ লাখ টন আর রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮ হাজার টন। যা থেকে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৭১ কোটি টাকা। পরিকল্পনার শেষ বছর ১৯৯৪-৯৫ সালে মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি করে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় দেড়গুণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে।

আমেরিকার খাদ্য ও ওষুধ নীতির আলোকে মৎস্য, মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে অধিকতর যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম উন্নয়ন করা হলে প্রতি বছরে ৬৪,০০০ মেঃ টন মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি করা এবং তা থেকে ২০০০ কোটি টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

---

*উৎস : FIQC, DoF Dhaka-২০০৬-২০০৭

উৎস : বাংলাদেশ মৎস্য পরিসংখ্যান কার্যক্রম ২০০৬-২০০৭

দেশে মাছের মোট উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশই ইলিশ। বছরের একটি বিশেষ সময়ে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়ে। যার অধিকাংশই প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে পচে যায়। এগুলো সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হলে দেশে আমিষের যোগান আরও বাড়ানো সম্ভব। সুতরাং জনগণের পুষ্টিমান বাড়ানো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাছ ও চিংড়ির প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাছ পচার কারণ

মাছ সংরক্ষণ করতে হলে কী কী কারণে মাছ পচে প্রথমে তা জানা দরকার।
প্রধানত ৩টি কারণে মাছ পচে। যেমন-

১. ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে
২. এনজাইমের ক্রিয়ায়
৩. রাসায়নিক ক্রিয়ায়।

মাছের দেহে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে। জীবিত অবস্থায় এরা মাছের তেমন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু মাছ মরে গেলে এসব ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে এবং মরা মাছের দেহে পরিবর্তন আনে। ফলে মাছ পচতে শুরু করে।
মাছের শরীরে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম রয়েছে। জীবিত অবস্থায় এগুলো মাছের উপকারে আসে। কিন্তু মরা মাছে এসব এনজাইমের ক্রিয়ায় মাছের কোষকলা ভেঙে গিয়ে মাছে পচন ধরায়।
মাছ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। মরার পর এসব রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ার ফলে মাছের পচন ঘটে।

পচা মাছের লক্ষণ

পচা মাছের দেহ ও ফুলকার রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, পেশি নরম ও শিথিল হয়, চোখ গর্তের মধ্যে চলে যায়, ফুলকায় শ্লেষ্মা দেখা দেয়।

মাছ ও চিংড়ি সংরক্ষণ করার পদ্ধতি

মাছ ও চিংড়ি সংরক্ষণ করার পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

১. বরফজাতকরণ
২. হিমায়িতকরণ
৩. লবণজাতকরণ
৪. শুঁটকি করা

১. বরফজাতকরণ

মাছ ও চিংড়ি ভালো রাখার জন্য এবং পচন থেকে রক্ষার জন্য সংরক্ষণ করা দরকার। ধরার পর বেশি সময় বাইরে রাখলে মাছ ও চিংড়ি পচতে শুরু করে। তাই সংরক্ষণের জন্য টাটকা ও সতেজ মাছ ও চিংড়ি দরকার। বরফ দিয়ে মাছ ও চিংড়ির সংরক্ষণ পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হল।

মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে, যেমন আঁশ, ফুলকা, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদিতে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে। মাছ মরে গেলে এসব জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মরা মাছে ক্রিয়া শুরু করে। ফলে মাছ পচতে শুরু করে। মাছ ধরার পর পরই পর্যাপ্ত বরফে ঢেকে দেওয়া হলে পচন থেকে মাছকে রক্ষা করা যায়। সাময়িকভাবে বা অল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে হলে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ একটি ভালো পদ্ধতি। হিমায়িত করে, শুঁটকি করে বা লবণ দিয়ে মাছ বা চিংড়ি সংরক্ষণ করা হলেও প্রথমে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। গ্রামগঞ্জের হাটেবাজারে বেশি পরিমাণে বরফ দিয়ে ৫-১০ দিন পর্যন্ত মাছ টাটকা রাখা হয়। বরফ দিলে মাছের তাপমাত্রা কমে যায়। ফলে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু অনেকটা অকেজো হয়ে পড়ে। তাই মাছ সহজে পচে না। বরফ দেওয়ার ফলে মাছের জলীয়ভাগ ঠিক থাকে। এ কারণে মাছ সতেজ বা টাটকা থাকে।

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১. বরফ তুলনামূলকভাবে সস্তা
২. সহজে বহন করা যায়
৩. তাড়াতাড়ি মাছকে ঠান্ডা করে
৪. মাছের গুণগতমানের কোনো ক্ষতি করে না
৫. বরফগলা পানি মাছের গায়ে লেগে থাকা জীবাণু, রক্ত, ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করে।

বরফ দেওয়ার পদ্ধতি

চাকা বরফ গুঁড়া বা কুচি করে মাছে দিতে হবে। বরফের টুকরা যত ছোট হবে মাছ তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে এবং বেশি সময় ভালো থাকবে। বরফের টুকরার ব্যাস ২.৫ সেমির বেশি হওয়া উচিত নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত বাঁশের ঝুড়ি বা কাঠের বাক্সে মাছ পরিবহণ করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমে ঝুড়ির তলায় কলাপাতা ও হোগলার চাটাই বিছিয়ে একস্তর বরফ দিতে হয়। এরপর একস্তর মাছ একস্তর বরফ- এইভাবে ঝুড়ি মাছ ও বরফে পূর্ণ করতে হবে। শেষে কলাপাতা, চাটাই ও চট দিয়ে ঝুড়ি ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে যেন সূর্যের আলো মাছের ওপর না পড়ে বা বরফ তাড়াতাড়ি গলে না যায়। ঝুড়ির উচ্চতা ৪০ সেমির বেশি হওয়া উচিত নয়। বেশি হলে চাপে মাছ থেঁতলে যেতে পারে। পর্যাপ্ত বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করলে ৫-১০ দিন পর্যন্ত মাছ ভালো থাকে।

২. হিমায়িতকরণ

যে পদ্ধতিতে হিমাঙ্কের নিচে ৪২° সে. তাপমাত্রায় একটি বিশেষ ব্যবস্থায় পচন সৃষ্টিকারী উপাদানের কার্যকারিতা বন্ধ করে মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায় তাকে হিমায়িতকরণ বলে। হিমায়িতকরণের ফলে মাছ বা চিংড়ির কোষ ও কলার মধ্যস্থিত তরল পদার্থ বরফে রূপান্তরিত হয়। এটি মাছ ও চিংড়ি সংরক্ষণের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মাছের সমস্ত গুণাগুণ বজায় রেখে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। বাংলাদেশে প্রধানত চিংড়ি, ব্যাঙের পা, লবস্টার ও মাছ হিমায়িতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। হিমায়িতকরণের জন্য প্রধানত এয়ারব্লাস্ট ফ্রিজার এবং প্লেট ফ্রিজার ব্যবহার করা হয়।

ঝুড়ি বা বাক্স ভর্তি বরফজাত মাছ ও চিংড়ি কারখানায় আসার পর বরফ থেকে আলাদা ও বাছাই করে ভালোগুলো গ্রহণ করা হয়। গৃহীত মাছ ও চিংড়ি ঠান্ডা পানিতে ভালো করে ধোয়া হয়। বড় মাছের বেলায় পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করা হয়। মাথা ও পাখনা কেটে ফেলা হয়, চিংড়ির ক্ষেত্রে সাধারণত মাথা আলাদা করা হয়। এরপর ২০ পিপিএম ক্লোরিন দ্রবণে চিংড়িগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে আকার অনুযায়ী প্রাথমিক গ্রেড করা হয় এবং চাপযুক্ত ঠান্ডা পানিতে ১০ পিপিএম ক্লোরিনসহ আবার ধোয়া হয়। আবার ওজন করে রপ্তানির জন্য গ্রেড করা হয়, যেমন প্রতি পাউন্ডে ৫টি পর্যন্ত এক গ্রেড, ৮-১২টি পর্যন্ত অন্য গ্রেড, ১৩-১৫টি পর্যন্ত আর এক গ্রেড ইত্যাদি। গ্রেডিং এর পর আবার ৫টি পিপিএম ক্লোরিন পানিতে শেষবারের মতো ধুয়ে নিয়ে একটি ট্রেতে জীবাণুমুক্ত পলিথিনের উপর ব্লক হিসেবে চিংড়ি সাজানো হয়। ট্রে-টিকে প্যানিং ট্রে বলে। সাজানোর পর ৩-৫ পিপিএম ক্লোরিন মিশ্রিত ঠান্ডা পানি দিয়ে প্যানিং ট্রে ভরে বিছানো পলিথিন দিয়ে ঢেকে মোড়কের মতো করা হয়।

অতঃপর প্যানিং ট্রেগুলো প্লেট ফ্রিজারের বা ব্লাস্ট ফ্রিজারের নির্দিষ্ট চেম্বারে স্থাপন করে ৩৮° থেকে ৪০° সেঃ এ হিমায়িত করা হয়। এ তাপমাত্রায় ২-৩ ঘণ্টায় চিংড়ি হিমায়িতকরণ সম্পন্ন হয়।

প্রতিটি ব্লকের ওজন ১-২ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্লেট ফ্লিজার হতে প্যানিং ট্রেগুলো বের করে ব্লকগুলো আলাদা করা হয় এবং ৩-৫ পিপিএম ক্লোরিন মিশ্রিত ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে উঠানো হয়। এ পদ্ধতিকে গ্লেজিং বলে। গ্লেজিং মাছের শুষ্কতা রোধ করে এবং পচন বাধাগ্রস্ত করে। গ্লেজকৃত ব্লকগুলো মোমযুক্ত কাগজ দিয়ে মোড়ানোর পর আকর্ষণীয় বড় কার্টনে ভরে -১৮° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। হিমায়িত এ চিংড়ি যথাসময়ে রপ্তানি করা হয়।

৩. লবণজাতকরণ

লবণ মাছের দেহ হতে পানি শোষণ করে। এতে মাছের দেহে পানির পরিমাণ এমন পর্যায়ে নেমে আসে যে মাছের দেহে অবস্থানকারী ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মাছ পচে না। এই পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এক বছর পর্যন্ত মাছ সংরক্ষণ করা য়ায়।

আমাদের দেশে ইলিশ মাছ শুধুমাত্র লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। ইলিশ মাছে বেশি তেল থাকে বলে রোদে শুকিয়ে শুঁটকি করা যায় না। এ ক্ষেত্রে দুই পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা যায়। যেমন-

১. শুষ্ক লবণজাতকরণ পদ্ধতি

২. আর্দ্র বা দ্রবণ লবণজাতকরণ পদ্ধতি।

নিম্নে শুষ্ক লবণজাতকরণ পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হল

শুষ্ক লবণজাতকরণ পদ্ধতি

প্রথমে মাছের দেহ থেকে আঁশ, রক্ত, ফুলকা, নাড়িভুঁড়ি, ডিম ইত্যাদি অপসারণ করতে হবে। এরপর মাছ আড়াআড়িভাবে টুকরা করে এমনভাবে কাটতে হবে যাতে টুকরাগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। এ ক্ষেত্রে মাছ ও লবণের অনুপাত ৪ ঃ ১ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ ৪ কেজি ওজনের একটি মাছের ক্ষেত্রে ১ কেজি লবণ ব্যবহার করতে হবে। মাছে লবণ লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কাটা অংশে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ ঢুকে। মাছের চোখ ছিদ্র করেও লবণ ঢুকাতে হবে। লবণ মেশানোর পর মাছকে কাঠের পাটাতনের উপর মাদুর কিংবা চাটাই বিছিয়ে তার উপর স্তূপ করে রাখা উচিত। মাছের স্তর সাজানোর সময় একই দিকে পরপর মাথা ও লেজগুলো রাখা বাঞ্ছনীয়। লবণ মিশিয়ে এভাবে রাখলে ১৫-২০ দিনের মধ্যে ইলিশ মাছ পুরোপুরি লবণজাত হয়। লবণজাতকরণের মাধ্যমে ১ বছর পর্যন্ত মাছ সংরক্ষণ করা যায়।

৪. শুঁটকিকরণ

সূর্যের তাপে মাছের দেহে অবস্থিত পানি অপসারণ করে মাছ সংরক্ষণ করাকে শুঁটকিকরণ বলে। তৈলাক্ত মাছ ছাড়া ছোট বড় সব মাছই শুঁটকিকরণ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা যায়।

ছোট মাছের ক্ষেত্রে প্রথমে মাছ ভালোভাবে ধোয়া হয় ও লবণ পানিতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে মাছগুলো তুলে নিয়ে পানি ঝরানো হয়। এরপর চাটাইয়ের উপর মাছ সাজিয়ে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। প্রখর সূর্যতাপে ২-৩ দিনেই মাছ শুঁটকি হয়ে যায়। শুঁটকি মাছ পলিথিনের ব্যাগে সংরক্ষণ করা হয়।

বড় মাছের ক্ষেত্রে আঁশ, পাখনা, নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে মাছ ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া হয়। অতঃপর ধারালো ছুরি বা বঁটি দিয়ে লম্বালম্বিভাবে মাছ চিরে নেওয়া হয়। চেরা মাছ কিছুক্ষণ লবণ দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর তুলে নিয়ে লম্বালম্বিভাবে র‍্যাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এতে পানি ঝরে যায় ও মাছ শুঁটকিকরণ শুরু হয়। এভাবে ৫-৭ দিনে শুঁটকিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শুঁটকি মাছগুলো পলিথিনের ব্যাগে করে শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ শুষ্ক লবণজাতকরণের মাধ্যমে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ

উপকরণ

১. টাটকা ইলিশ মাছ
২. বঁটি বা দা
৩. লবণ
৪. পাটাতন
৫. চাটাই।

কাজের ধাপ

১. শিক্ষকের সাহায্যে বাজার থেকে ৫টি টাটকা ইলিশ মাছ সংরক্ষণ কর।

২. সংগৃহীত মাছ থেকে সাবধানে আঁশ, পাখনা অপসারণ কর।

৩. মাছের পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করে নাও। পেটে ডিম থাকলে তা বের করে নাও এবং মাছটির ওজন নাও।

৪. মাছটিকে আড়াআড়ি এমনভাবে কাট যাতে অনেক টুকরা হলেও টুকরোগুলো পরস্পরে সাথে যুক্ত থাকে।

৫. মাছের ওজনের ৪ ঃ ১ ভাগ (মাছ ঃ লবণ) পরিমাণ লবণ নাও ও মাছের দেহের কাটা অংশে লাগাও। দেহের সব অংশেই ভালোভাবে লবণ লাগাও। চোখ ফুটো করে লবণ দাও।

৬. কাঠের পাটাতনের উপর চাটাই বিছিয়ে পর্যাপ্ত লবণ মাখানো মাছগুলোকে একই দিকে পরস্পর মাথা ও লেজ রেখে ভালোভাবে সাজাও।

৭. এভাবে ১৫-২০ দিন রাখলে মাছ লবণের সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতিতে মাছ ও লবণের অনুপাত কত?

ক. ১ : ৪ খ. ২ : ৩
গ. ৪ : ১ ঘ. ৫ : ১

২. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মৎস্য সংরক্ষণে কোন পদ্ধতিটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক?

ক. লবণ প্রয়োগ খ. বরফ প্রয়োগ
গ. মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা ঘ. সূর্যের তাপে শুকানো

৩. একবছর পর্যন্ত মাছ সংরক্ষণ করা যায়-

i. বরফজাতকরণ পদ্ধতিতে।
ii. হিমায়িতকরণ পদ্ধতিতে।
iii. লবণজাতকরণ পদ্ধতিতে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. লবণজাতকরণ পদ্ধতিতে ৮০ কেজি ইলিশ মাছ সংরক্ষণের জন্য কত কেজি লবণ প্রয়োজন?

ক. ১০ খ. ২০
গ. ৩০ ঘ. ৪০

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাকির তার নিজস্ব পুকুরে গলদা চিংড়ির চাষ করে বিক্রয় উপযোগী হলে নিজেই স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। একদিন সকালে সে পুকুর থেকে চিংড়ি আহরণ করে বেশি মূল্য পাওয়ার আশায় একটু দূরবর্তী জেলা শহরে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি পিকআপ ভাড়া করে রওনা হয়। পথিমধ্যে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে তা মেরামত করে পুনরায় রওনা হতে বেশ সময় লেগে যায়। জাকির মাছের পচন রোধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অধিকাংশ মাছেই ইতোমধ্যে পচন ধরে এবং সে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৫. জাকির কোন সহজ পদ্ধতিতে চিংড়ি সংরক্ষণ করে বাজারে নিলে উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হত না–

ক. শুঁটকিকরণ খ. লবণজাতকরণ
গ. বরফজাতকরণ ঘ. হিমায়িতকরণ।

৬. জাকির তার পুকুরের চিংড়ি ভবিষ্যতে রপ্তানি করার চিন্তা করলে কী পদ্ধতিতে তা সংরক্ষণ করবে?

ক. বরফজাতকরণ খ. হিমায়িতকরণ
গ. লবণজাতকরণ ঘ. শুঁটকিকরণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

শুভ তার দাদা বাড়ি জয়পুরহাটের এক নিবৃত্ত পল্লীতে বেড়াতে গেল। পরদিন দাদার পুকুরটি সেচ দিলে আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি মাছ আহরণ করে। তারা সিদ্ধান্ত নিল বাজারে বিক্রি না করে ছোট বড় বিভিন্ন জাতের কিছু মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করবে।

ক. মাছ-প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে কী বোঝায়?
খ. মাছ পচনের অন্যতম কারণটি ব্যাখ্যা কর।
গ. শুভ'র দাদাবাড়িতে মাছ সংরক্ষণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?
ঘ. দেশের সকল স্থানে শুভর দাদাবাড়ির মতো অতিরিক্ত আহরিত মাছ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সরংক্ষণ করা হলে তা জাতীয় মৎস্য চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়
গৃহপালিত পাখি পালন

প্রথম পরিচ্ছেদ
হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন

নিষিক্ত ডিম থেকে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়। ডিম ফুটানোর পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. প্রাকৃতিক পদ্ধতি ২. কৃত্রিম পদ্ধতি।

বাচ্চা উৎপাদন উপযোগী ডিমকে উর্বর ডিম বলা হয়। ডিম ফুটানোর পূর্বে ডিম বাছাই করা হয়। উর্বর ডিম পাওয়ার জন্য ৮-১০ টি মুরগির সাথে ১টি মোরগ রাখতে হয়।

বাচ্চা ফুটানোর উপযোগী ডিম নির্বাচন

ডিম বাছাই করার সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

১. **ডিমের আকার :** ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য মাঝারি আকারের ডিম ভালো। অস্বাভাবিক আকৃতি ও পাতলা খোসার ডিম বাদ দিতে হবে। কেবল মসৃণ, মোটা ও শক্ত খোসা বিশিষ্ট ডিম বাছাই করতে হবে।

২. **খোসার রং :** মুরগি জাতভেদে বিভিন্ন রঙের ডিম পাড়ে। ডিমের খোসার রং সাদা, বাদামি, কালো বা লালচে হতে পারে। যে জাত যে রঙের ডিম দেয় সে অনুযায়ী ডিম বাছাই করতে হবে।

৩. **ফাটা ডিম :** ফাটা ডিম বাদ দিতে হবে। একটি ডিমের গায়ে আর একটি ডিম দিয়ে আঘাত করলে সৃষ্ট শব্দ দ্বারা বোঝা যায় ডিম ফাটা কিনা।

৪. **ডিমের ভেতরের বৈশিষ্ট্য :** ডিমের ভেতর স্বচ্ছ হলে এবং কুসুম ডিমের মাঝখানে থাকলে সেই ডিম বাচ্চা ফুটানোর জন্য উত্তম।

৫. **পরিষ্কার ডিম :** ডিম বাছাই করার সময় ডিম পরিষ্কার কিনা তা দেখতে হবে। ময়লাযুক্ত ডিম নেকড়া দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

৬. **ডিমের ওজন :** উন্নত জাতের মুরগির ডিমের ওজন ৫০-৬০ গ্রাম হতে হবে। ডিম পানিতে ধোয়া যাবে না।

৭. **ডিমের বয়স :** ফুটানোর উপযোগী ডিমের বয়স গ্রীষ্মকালে ৩-৪ দিন এবং শীতকালে ৭-১০ দিনের বেশি হবে না।

বাছাইকৃত ডিম সংরক্ষণ

ডিম সংরক্ষণের ওপর ডিম ফুটানো নির্ভর করে। সুতরাং ফুটানোর জন্য বাছাইকৃত ডিম সংরক্ষণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

১. **ডিমের বয়স :** ডিম শীতকালে ৭-১০ দিন এবং গ্রীষ্মকালে ৩-৪ দিন সংরক্ষণ করা যায়। এর চেয়ে বেশি দিন সংরক্ষণ করা হলে ডিম ফুটে না।

২. **তাপমাত্রা :** ডিম সংরক্ষণের আদর্শ তাপমাত্রা ১০°-১৫° সেঃগ্রেঃ। বড় বড় হ্যাচারিতে ডিম সংরক্ষণ করতে হলে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ব্যবহার করা উচিত। ডিম সংরক্ষণের সময় মোটা অংশ উপরের দিকে এবং সরু অংশ নিচের দিকে রাখতে হবে।

৩. **বায়ুর আর্দ্রতা :** বায়ু আর্দ্রতা কম হলে ডিম ফুটার ক্ষমতা কমে যায়। ৭৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা ডিম সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত।

৪. **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :** সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে ডিম সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ ময়লায় ডিমের খোসায় ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভ্রূণের শ্বাসকার্য ব্যাহত হয়।

ডিম ফুটানোর পদ্ধতি

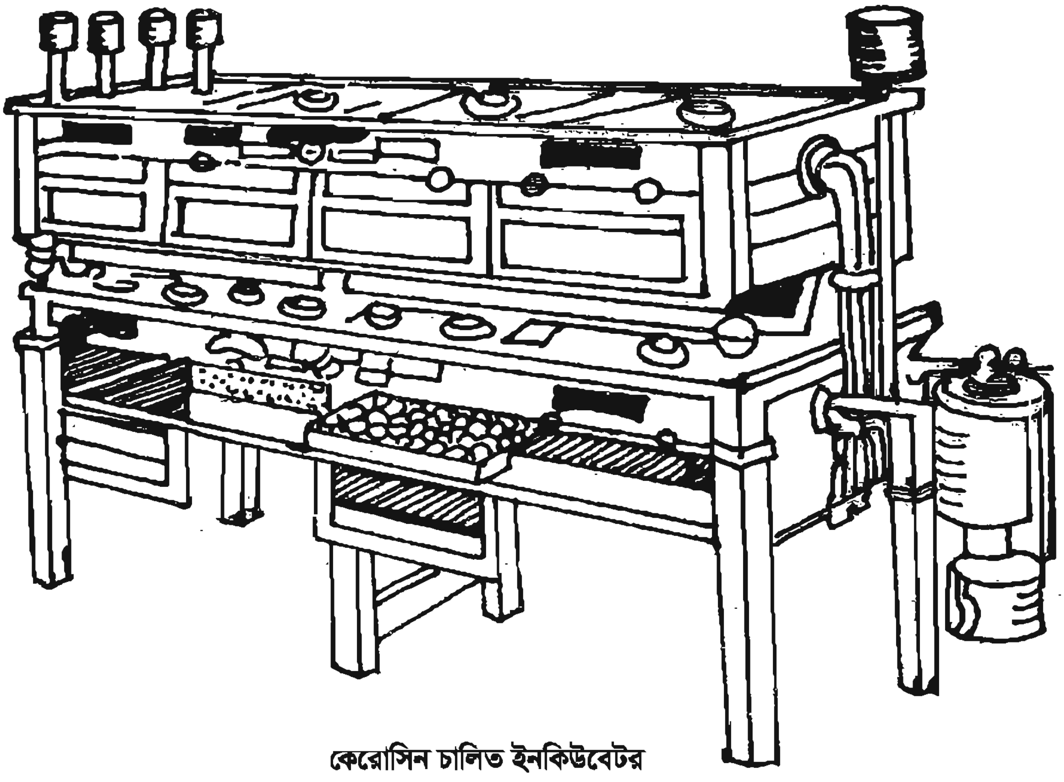
দুই উপায়ে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হল।

কৃত্রিম পদ্ধতি : বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত যন্ত্রে উপযুক্ত তাপের ব্যবস্থা করে ডিম ফুটানোকে কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানো বলা হয়। কৃত্রিম উপায়ে একসাথে অনেক ডিমে তাপ দিয়ে বাচ্চা উৎপাদন করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানোর জন্য ২টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা- ১. ইনকিউবেটর পদ্ধতি ও ২. তুষ পদ্ধতি। এ দুটি পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হল।

ইনকিউবেটর পদ্ধতি : এই পদ্ধতির সাহায্যে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত ব্যবস্থা। বড় বড় মুরগির খামারে ইনকিউবেটরের সাহায্যে ডিম ফুটানো হয়।

ইনকিউবেটর যন্ত্র সাধারণত দুই প্রকার। যথা-

১. কেরোসিন ইনকিউবেটর
২. বৈদ্যুতিক ইনকিউবেটর।



কেরোসিন চালিত ইনকিউবেটর

কেরোসিন ইনকিউবেটর কেরোসিনের সাহায্যে চালাতে হয়। এতে এক সাথে ৫০-৫০০ টি পর্যন্ত ডিম ফুটানো যেতে পারে। যেখানে বিদ্যুৎ সুবিধা নেই সেখানে এই ইনকিউবেটর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ইনকিউবেটরের দামও কম।

ডিম ফুটানোর আবশ্যকীয় বিষয়

তাপমাত্রা : কেরোসিন ইনকিউবেটরে ডিম বসানোর প্রথম দুই সপ্তাহে ৩৮.৩°-৩৯.৫° সেঃ গ্রেঃ এবং তৃতীয় সপ্তাহে ৩৮.৬° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রা রাখা উচিত। বৈদ্যুতিক ইনকিউবেটরে প্রথম ১৮ দিন ৩৭.৫° সেঃ গ্রেঃ এবং পরবর্তী তিন দিন ৩৭° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রা রাখা দরকার।

আর্দ্রতা : কেরোসিন বা বৈদ্যুতিক ইনকিউবেটরে প্রথম ১৮ দিন আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০%-৬০% এবং শেষের তিন দিন ৬৫%-৭০% রাখা উচিত।

ডিম ঘুরানো : দিনে ৮ বার অর্থাৎ তিন ঘণ্টা পর পর ডিম ঘুরাতে হবে। উন্নত ইনকিউবেটরে টাইমারের সাহায্যে ডিম নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে। কেরোসিন ইনকিউবেটরে 'ইউ' (ট) আকৃতির তারের সাহায্যে ডিম ঘুরানো হয়।

ডিম বসানো : ডিম ফুটানোর ট্রে-তে ডিমের সরু অংশ নিচে ও মোটা অংশ ওপরে ৪৫° কোণে বসাতে হবে।

ডিম পরীক্ষা করা : সপ্তম দিনে একটি অন্ধকার ঘরে টর্চ লাইট বা বৈদ্যুতিক বাল্ব দ্বারা ডিম পর্যবেক্ষণ করা হয়। যদি ডিমের মধ্যস্থল ও প্রান্তে বেশি রক্ত নালিকা দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে ভ্রূণ বর্ধিত হচ্ছে। ডিম উর্বর, এতে বাচ্চা ফুটবে। ১৪তম দিনে পুনরায় পরীক্ষা করতে হয়। ডিমের মধ্যে ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন প্রয়োজন। সেজন্য ইনকিউবেটরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়।

সেটিং ট্রে থেকে হ্যাচিং ট্রে-তে ডিম স্থানান্তর : সাধারণত ডিম সেটিং ট্রে-তে বসানোর পর থেকে ১৯তম দিনে হ্যাচিং ট্রে-তে স্থানান্তর করতে হয়। এই ট্রে-তে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা : ইনকিউবেটর প্রতিবার বাচ্চা ফোটানোর আগে ও পরে জীবাণুনাশক ওষুধ মিশ্রিত পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করার জন্য ইনকিউবেটর ফিউমিগেশন করতে হয়।

ফিউমিগেশন করার প্রক্রিয়া : প্রতি ১০০ ঘনফুট (৯-১০ ঘন মি) আয়তন বিশিষ্ট ইনকিউবেটরের জন্য ৮০ সিসি (৪০%) ফরমালিনের সাথে ৪০ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইনকিউবেটরে রেখে দিতে হয়। তাতে যন্ত্রের মধ্যে কোনো রোগজীবাণু থাকলে মরে যায়। এই প্রক্রিয়াকে ফিউমিগেশন বলা হয়। ডিম ফিউমিগেশনের জন্য উল্লিখিত মাত্রার হারে ফরমালিন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশাতে হয়।

তুষ পদ্ধতি

এটা প্রাচীন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সাধারণত গ্রামে যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই সেসব অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়। তুষ পদ্ধতিতে হাঁস এবং মুরগির ডিম ফুটানো যায় তবে আমাদের দেশে হাঁসের ডিমই বেশি ফুটানো হয়।

প্রাকৃতিক পদ্ধতি

নিষিক্ত ডিমের ওপর মুরগির নিজের দেহের তাপ দিয়ে ডিম ফুটানোকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ডিম ফুটানো বলা হয়। এই পদ্ধতি অতি পুরাতন পদ্ধতি। বাংলাদেশের প্রায় সকল গ্রামে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ডিম ফুটানো হয়। এক্ষেত্রে দেশি মুরগি ব্যবহার করা হয়। দেশি মুরগি কিছু দিন ডিম দেওয়ার পর কুঁচে হয় এবং ডিমে তা দিতে চায়। এইরূপ একটা সুস্থ সবল কুঁচে মুরগির নিচে ৮-১০টি পরিষ্কার নিষিক্ত ডিম বসানো হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ঝুড়ি বা ছোট গামলা খড়কুটা ও পাতা দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। ঝুড়িতে হাত দিয়ে গর্ত বানিয়ে মুরগির বসার উপযুক্ত নরম বিছানা তৈরি করতে হবে। তারপর মুরগির বাসাটি ঘরের নির্জন কোণে রাখতে হবে যেন মুরগি বাইরের কোলাহল মুক্ত থাকে। মুরগির বাসা ৩৭ সেমি ব্যাস ও ১০ সেমি গভীরতা বিশিষ্ট হবে। বাসার আয়তন বেশি হলে ডিম গড়াবে, ডিম ফুটানোতে বাধা সৃষ্টি হবে ও ডিম ভেঙেও যেতে পারে।

মুরগিকে ডিমে বসানোর পূর্বে দানাদার খাবার ও পানি খাওয়াতে হবে। প্রথমে মুরগির নিচে কয়েকটি খারাপ ডিম দিয়ে বসিয়ে মুরগিকে তা দেওয়ার অভ্যাস করে নিতে হবে। মুরগি যখন তা দিতে অভ্যস্ত হবে তখন রাত্রে ৮-১০টি ভালো ডিম মুরগির নিচে দিয়ে খারাপ ডিমগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। মুরগির বাসা কাপড়, চট বা খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মুরগির বাসার কাছে দানাদার খাবার, পানি রেখে দিতে হবে।

প্রতিদিনের জন্য মুরগিকে বাইরে ছেড়ে দিতে হবে যেন ঘোরাফেরা করতে পারে কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার সময়টা প্রতিদিন একই হতে হবে।

৮-১০ দিন পর ডিমগুলো সূর্যের আলোয় ধরে পরীক্ষা করতে হবে। ডিমের ভ্রূণ থাকলে একটা কালো দাগ ডিমের মাঝে দেখা যাবে। ২১ থেকে ২৩ দিনের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসবে। মুরগি দুইমাস পর্যন্ত বাচ্চার তত্ত্বাবধান করে। তারপর বাচ্চাগুলো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে।



প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ডিম ফুটানো

প্রাকৃতিক উপায়ে ডিম ফুটানোর সুবিধা

১. এই পদ্ধতিতে খরচ কম ও নিশ্চয়তা বেশি।
২. মানুষের তেমন যত্ন নিতে হয় না। মুরগি নিজেই বাচ্চার তত্ত্বাবধান করে।

সাবধানতা

১. ১ বৎসর বয়সের কম মুরগি দ্বারা ডিম বসানো যাবে না। তাতে অনেক সময় ১০-১৫ দিন পর মুরগি তা দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে।
২. মুরগি যখন ডিমে তা দিতে চায় তখনই ডিম দিয়ে বসাতে হবে।
৩. পালক বদলানো অবস্থায় কোনো মুরগিকে ডিমে বসানো যাবে না।
৪. কীটনাশক ওষুধ যেমন গ্যামাক্সিন, সোডিয়াম ক্লোরাইড গুঁড়া স্প্রে করে মুরগি ও মুরগির বাসা শোধন করতে হবে।
৫. ঘর পরিষ্কার রাখতে হবে।
৬. ডিম হতে বাচ্চা ফুটানোর সময় রাত্রে মুরগিকে ডিমে বসাতে হবে। রাতে ডিমে বসালে ২১ দিন পরে রাতেই বাচ্চা ফুটার সম্ভাবনা থাকে।

বাচ্চা ফুটানোর সময় তালিকা

কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে হাঁস মুরগি ও অন্যান্য পাখির ডিম কতদিনে ফুটে তা এখানে দেওয়া হল।

পাখির নাম	কতদিনে ফুটে
মুরগি	২১ দিন
হাঁস, তিতির	২৮ দিন
রাজ হাঁস, টার্কী	৩২ দিন
কবুতর, কোয়েল	১৮ দিন

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ বাচ্চা ফুটানোর উপযোগী ডিম নির্বাচন

উপকরণ

১. ডিম রাখার পাত্র।
২. বিভিন্ন আকার, ওজন ও মান অনুসারে ডিম সংগ্রহ।
৩. ডিমের সংখ্যা (এক ডজন প্রতি ক্লাসের জন্য)।

কাজের ধাপ

১. ডিমের ক্রমিক নম্বর দাও।
২. উর্বর ডিম বাছাইকল্পে পাত্রে দেওয়া ডিমগুলো গঠনের প্রেক্ষিতে পৃথক কর।
৩. আলোর মধ্যে ডিমগুলো তুলে ধর এবং অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা কর।
৪. যে সকল ডিম ফুটানোর জন্য উপযুক্ত নয় সেগুলো পৃথক কর এবং ক্রমিক নং উল্লেখ করে কারণ বর্ণনা কর।
৫. উর্বর ডিমগুলো (বাছাইকৃত) কীভাবে সংরক্ষণ করবে তা উল্লেখ কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোয়েলের ডিম কত দিনে ফুটে?

ক. ১২ খ. ১৪
গ. ১৬ ঘ. ১৮

২. ডিমের মধ্যে ভ্রুণের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন-

i. অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন
ii. নাইট্রোজেন গ্রহণ ও হাইড্রোজেন নির্গমন
iii. অক্সিজেন গ্রহণ ও নাইট্রোজেন নির্গমন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় একং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রহিমা খাতুন গ্রামে বাস করে। ডিম নির্বাচনে তার ভালো অভিজ্ঞতা নেই। সে কুঁচে মুরগি দিয়ে ১০টি সংগৃহীত ডিম ফোটাতে দেয়। ২১ দিন পর তিনি দেখলেন মাত্র ৮টি বাচ্চা ফুটে বের হয়েছে। অবশিষ্ট ডিম ২টি থেকে বাচ্চা ফোটেনি।

৩. রহিমা খাতুনের ফুটতে দেওয়া ডিমের মধ্যে ২টি ডিম থেকে বাচ্চা না ফোটার সম্ভাব্য কারণ কী?

ক. ঘরের তাপমাত্রা কম খ. ডিমগুলো বিভিন্ন রঙের
গ. ডিমগুলো অনিষিক্ত ঘ. বায়ুর আর্দ্রতা বেশি

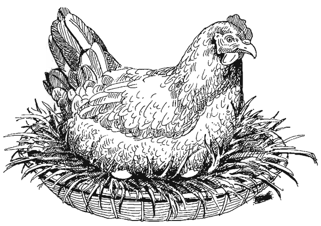
৪. নির্বাচনের সময় ডিম অপরিষ্কার হলে বাচ্চা না ফোটার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ-

i. ভ্রুণের শ্বাসকষ্ট ব্যাহত হয়
ii. ডিমের আর্দ্রতা কমে যায়
iii. খোসার ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



ক. চিত্রে প্রদর্শিত ডিম ফুটানোর পদ্ধটির নাম কি?
খ. বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ডিম ফুটানোর বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিটি কি? ব্যাখ্যা কর।
গ. চিত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিটি ব্যবহার করে ২০টি ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উপরিউক্ত পদ্ধতি হাঁস-মুরগি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে- এর স্বপক্ষে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুরগি পালন

আজকাল মুরগি পালন মানুষের জীবিকার অন্যতম উপায়। এই জন্য খামারে বা বাড়িতে বাণিজ্যিক জাতের মুরগি পালন করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ মুরগিকে অধিক উৎপাদনশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতের সংকরায়ন করে বাণিজ্যিক জাতের মুরগি সৃষ্টি করেছে। এসব সংকর বা বাণিজ্যিক জাতের মুরগি দেশি ও বিদেশি জাতের তুলনায় অধিক মাংস বা ডিম উৎপাদন করে। বাণিজ্যিক জাতের মুরগির মধ্যে অধিক মাংসের জন্য সৃষ্ট মুরগিকে ব্রয়লার এবং অধিক ডিমের জন্য সৃষ্ট মুরগিকে লেয়ার বলা হয়।

আমেরিকান শ্রেণীর রোড আইল্যান্ড রেড, নিউ হাম্পসায়ার, ইংল্যান্ডের অস্ট্রালর্প, কর্নিশ, সাসেক্স, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের হোয়াইট লেগহর্ন এবং মিশরের ফাইওমি আমাদের দেশে সফলভাবে পালন করা হচ্ছে। তাছাড়াও অধিক উৎপাদনকারী মুরগির ১ দিনের বাচ্চা কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে এনে সরাসরি সরবরাহ করছে।

মুরগির খামার স্থাপন

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মুরগি পালন প্রচলিত আছে। অন্যদিকে বিদেশের মুরগির খামারের অর্থনৈতিক সফলতা এদেশে খামার স্থাপনের প্রেরণা যোগাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নতজাতের মুরগি পালন পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। ফলে আগের চেয়ে বর্তমানে আমাদের দেশে খামার স্থাপন করা অনেক সহজ হয়েছে।

মুরগির খামার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এদের মধ্যে ব্রয়লার খামার, লেয়ার খামার ও হ্যাচারি খামারই প্রধান। নিম্নে এ সকল খামারের বর্ণনা দেওয়া হল।

ব্রয়লার খামার

ব্রয়লার খামার স্থাপনের পরিকল্পনায় প্রথমে মূলধন ও খামারের আকার বিবেচনায় আনতে হবে। ব্রয়লার পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। অতি অল্প সময়ে এর আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ব্রয়লার বাচ্চা সংগ্রহ, সুলভে সুষম খাদ্যের সরবরাহ, ৭-৮ সপ্তাহ পরে লাভজনক মূল্যে বাজারজাতকরণ, সময়মতো টিকাদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে খামারের পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে।

ব্রয়লারের পরিচিতি

যে সকল মুরগি ৭-৮ সপ্তাহ বয়সে পূর্ণ ওজন প্রাপ্ত হয় এবং শুধুমাত্র মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয় তাদেরকে ব্রয়লার মুরগি বলে। অধিক মাংস উৎপাদনকারী বিভিন্ন জাতের মুরগি সংকরায়নের মাধ্যমে এই বিশেষ জাতের সৃষ্টি। নিম্নে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় ব্রয়লারের নাম দেওয়া হল। যথা-

১. হাইব্রো
২. মিনিব্রো
৩. রস ব্রয়লার
৪. ইন্ডিয়ান রিভার
৫. স্টারব্রো
৬. ইসা ভিডেট
৭. বি-৭৭।

সংকরায়নের ফলে তৈরী এসব ব্রয়লারের শারীরিক বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। এদের মুখ্য কাজ হল নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যকে পুরোপুরি মাংসে রূপান্তরিত করা।

ব্রয়লার পালন ব্যবস্থাপনা

ব্রয়লার পালন বা ব্রয়লার খামার ব্যবস্থাপনার আওতায় যে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

স্থান নির্বাচন : পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর ব্রয়লার পালনের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। বাসস্থান থেকে একটু দূরে বা আড়ালে উঁচুস্থানে খামারের জন্য জায়গা নির্বাচন করা যেতে পারে। লক্ষ রাখতে হবে খামারের সামনে বাজার বা রাস্তাঘাট না পড়ে। ভালো পয়ঃনিষ্কাশন ও ড্রেনের ব্যবস্থা আছে এমন জায়গা বেছে নিতে হবে। খামারের স্থান বায়ু চলাচল সম্পন্ন হতে হবে।

বাসস্থান : ব্রয়লারের ঘর শুষ্ক পরিষ্কার ও আলো বাতাসপূর্ণ হতে হবে। ঘরের মেঝে পাকা হতে হবে। ঘরটির উচ্চতা ১৫০ সেমি হবে। ঘরের চারদিকে বায়ু চলাচলের জন্য চালা হতে নিচের দিকে ৬০ সেমি জায়গায় জালের ন্যায় বেড়া বা নেট দিতে হবে।

মেঝের জায়গা : প্রতিটি ব্রয়লারের জন্য ৯০০ বর্গসেমি জায়গা দিতে হবে।

আলো ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থা : ব্রয়লার অন্ধকার পছন্দ করে না। তাই ব্রয়লারের ঘরের পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা : আপেক্ষিক আর্দ্রতা ব্রয়লারের ত্বকের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ঘরে ৬০%-৭০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকতে হবে।

তাপমাত্রা : ব্রয়লারের ঘরে তাপমাত্রা ১৫° - ২৫° সেঃ গ্রেঃ হতে হবে।

খাদ্য : ব্রয়লার যে পরিমাণ খাদ্য খেতে পারে ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। অর্থাৎ ফিডারের মধ্যে খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে খাদ্য প্রদান করতে হবে। ব্রয়লারের প্রারম্ভিক খোরাকে ২৩% ও সমাপ্তি খোরাকে ২০% আমিষ থাকা প্রয়োজন। ১-৪ সপ্তাহ প্রারম্ভিক খোরাক ও ৪-৮ সপ্তাহ সমাপ্তি খোরাক খাওয়ানো হয়ে থাকে। ব্রয়লার মুরগিকে সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে। নিম্নে ব্রয়লার মুরগির আদর্শ সুষম খাদ্যের তালিকা দেওয়া হল।

ব্রয়লারের আদর্শ খাদ্য তালিকা

উপকরণ	শতকরা ভাগ
গম ভাঙা/ভুট্টা	৫০
চালের কুঁড়া	১১
তিলের খৈল	১৬
মাছের গুঁড়া	১০
সয়াবিনমিল	৫
প্রোটিনকনসেনট্রেট	৫
হাড়ের গুঁড়া	২.২৫
ভিটামিন খনিজ মিশ্রণ	০.২৫
লবণ	০.৫
মোট	১০০

৬০-৭০ সেমি লম্বা ও ২৩ সেমি প্রস্থ এবং ৭.৫ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট কাঠ দ্বারা খাবারের পাত্র তৈরি করা উচিত। এই ধরনের একটি পাত্রে ২০টি মুরগি দুইদিক থেকে সহজেই খেতে পারে।

সাধারণভাবে ১০০টি ব্রয়লার মুরগির দৈনিক খাদ্য ও পানি গ্রহণের পরিমাণ

বয়স	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ	দৈনিক পানির পরিমাণ
১ম সপ্তাহ	১.০ কেজি	২.৩ লিটার
২য় সপ্তাহ	২.৩ কেজি	৫.৫ লিটার
৩য় সপ্তাহ	৩.৯ কেজি	৯.১ লিটার
৪র্থ সপ্তাহ	৫.৩ কেজি	১২.৭ লিটার
৫ম সপ্তাহ	৬.৫ কেজি	১৬.০ লিটার
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	৮.৩ কেজি	২০.০ লিটার
৭ম সপ্তাহ	৯.৩ কেজি	২২.৫ লিটার
৮ম সপ্তাহ	১০.৮ কেজি	২৬.০ লিটার

শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকালে পানি গ্রহণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

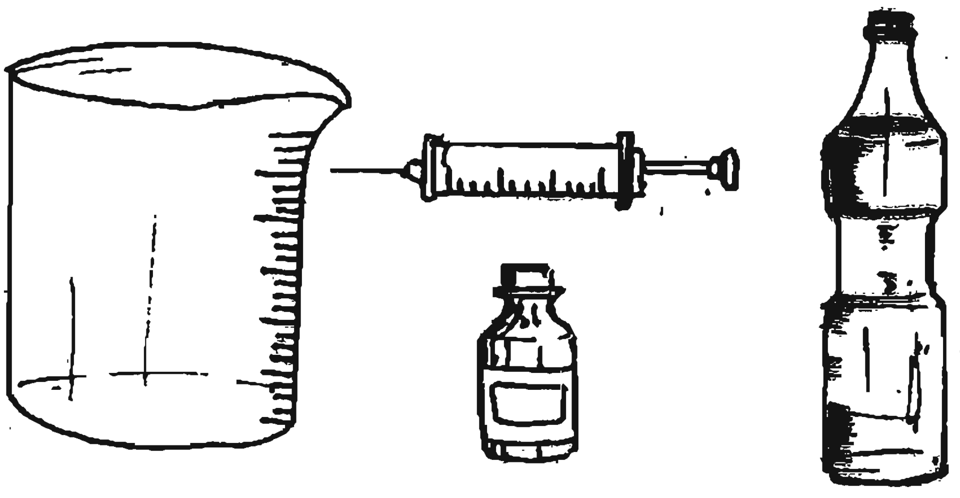
ব্রয়লার মুরগির রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি নিম্নে দেওয়া হল।

১. বাইরের লোকজনের মুরগির ঘরে প্রবেশ নিষেধ করা।
২. রোগাক্রান্ত মুরগি তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা করা।
৩. ব্রয়লার মুরগির পরিচর্যার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্ধারণ করা।
৪. পরিচর্যাকারী ব্যক্তির মুরগির ঘরে ঢোকার সময় আলাদা পোশাক ব্যবহার করা।
৫. মুরগির ঘরে ঢোকার আগে জীবাণুনাশক ওষুধ মিশ্রিত পানি দিয়ে হাত পা ধোয়া।
৬. মৃত মুরগিকে মাটিতে পুঁতে ফেলা।

ব্রয়লারের জন্য টিকাদান কর্মসূচি

ব্রয়লারের জন্য নিচে উল্লিখিত রুটিন অনুসারে টিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

বয়স	রোগের নাম	টিকা দান পদ্ধতি
৬ দিন	রাণীক্ষেত	বি সি আর, ডি ভি, টিকা দুই চোখে দুই ফোঁটা ড্রপারের সাহায্যে দিতে হবে।
১৪ দিন	গামবোরো	খাবার পানির সাথে নির্দেশিকা মতো দিতে হবে।
২১ দিন	রাণীক্ষেত	বি সি আর, ডি ভি, টিকা দুই চোখে দুই ফোঁটা দিতে হবে।



টিকা দেওয়ার বিভিন্ন সরঞ্জাম

ব্রয়লার বাচ্চার ব্রুডিং সরঞ্জাম

১। ব্রুডার টিন, কাঠ বা হার্ড বোর্ড দিয়ে তৈরি করা যায়। এক মিটার পরিধির ব্রুডারের নিচে ২০০-২৫০টি বাচ্চা রাখা যায়। ব্রুডার ঘর ছনের চালা বা চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে নির্মাণ করা যেতে পারে।

তাপযন্ত্র বা বৈদ্যুতিক হিটার, বাল্ব, কেরোসিনের বাতি বা হ্যাজাক দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে তাপ দেওয়া যায়। ইনফ্রারেড বাল্ব দিয়ে তাপ দিলে রোগজীবাণু নষ্ট হয়ে যায়।

২. **ব্রুডিং বা তাপ দেওয়া :** ১ দিন হতে ২১ দিন পর্যন্ত ব্রয়লার বাচ্চাকে যে পদ্ধতিতে তাপ দেওয়া হয় তাকে ব্রুডিং বলে। ব্রুডার ছাড়াও ইলেকট্রিক বা তুষের চুলা দ্বারা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মুরগির বয়স	তাপমাত্রা
১ম সপ্তাহ	৩৫ ° সেঃ
২য় সপ্তাহ	৩২.২° সেঃ
৩য় সপ্তাহ	২৯.২° সেঃ
৪র্থ সপ্তাহ	২৬.৬ ° সেঃ
৫ম সপ্তাহ	২৩.৮° সেঃ
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	২১ °সেঃ

চার সপ্তাহের পর আর তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

৩. **চিকগার্ড :** ব্রুডার থেকে ৭৫ সেমি দূরে ৪৫ সেমি উঁচু চাটাই বা হার্ডবোর্ড বেষ্টনী তৈরি করতে হয় যেন বাচ্চা ঘর থেকে দূরে যেতে না পারে। একে বেষ্টনী বা চিকগার্ড বলে। বাচ্চার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে জায়গার পরিমাণ বাড়াতে হবে। চিকগার্ড ক্রমান্বয়ে বড় করতে হবে। দুই সপ্তাহ পরে চিকগার্ড সরিয়ে ফেলতে হবে।

৪. **খাবার পাত্র :** ব্রুডিং এর সময় প্রথম ২ দিন বাচ্চাকে ট্রেতে খাবার দিতে হবে। এরপর ছোট খাবার পাত্রে এবং ৪ সপ্তাহের পর বড় খাবার পাত্র ব্যবহার করতে হবে। খাবার পানির পাত্র পরিষ্কার রাখতে হবে।

৫. **আলো :** মুরগির বাচ্চা যাতে খাবার ও পানির পাত্র দেখতে পায় সেজন্য ঘরে প্রচুর আলো থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দিনের আলো ও রাতের পর্যাপ্ত কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. **বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা :** ব্রুডার ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ভালো ব্যবস্থা থাকতে হবে।

তাপ নিয়ন্ত্রণ বিধি

১. মুরগির বাচ্চাগুলোকে যদি ব্রুডারের নিকট জড় অবস্থায় থাকতে দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে ঘরের তাপমাত্রা কম।

২. মুরগির বাচ্চাগুলো যখন সারা ঘরে ছড়ানো অবস্থায় থাকতে দেখা যায় তখন বুঝতে হবে মুরগির ঘরে সঠিক তাপমাত্রা আছে।

৩. মুরগির বাচ্চা ব্রুডার থেকে দূরে থাকলে বুঝতে হবে ঘরের তাপমাত্রা বেশি।

ব্রুডার হাউজের উপকরণ

নিম্নে ব্রুডার হাউজের প্রধান প্রধান উপকরণ ও এদের বিবরণ উল্লেখ করা হল।

প্রতি ১০০টি বাচ্চার জন্য।

১. মোট জায়গার পরিমাণ ৯ বর্গমিটার।
২. খাবার পাত্রের পরিমাণ (০-২ সপ্তাহ বয়স) ২৫৪ বর্গ সেমি।
৩. খাবার পাত্রের পরিমাণ (২-৬ সপ্তাহ বয়স) ৩৮০ বর্গ সেমি।
৪. পানির পাত্র (প্রথম ১০ দিন) ২ লিটারের পাত্র ৪টি।
৫. পানির পাত্র (১০ দিন বয়স থেকে ৬ সপ্তাহ বয়স) ২ লিটারের পাত্র ৮টি।

লেয়ার মুরগির বাচ্চা পালন : ব্রয়লার বাচ্চার অনুরূপ ব্রুডিং করতে হবে।

বাড়ন্ত লেয়ার মুরগি পালন

দুই থেকে চার মাস বয়সের মুরগিকে বাড়ন্ত মুরগি বলা হয়। এই সময়ে মুরগির লালনপালন খুব যত্নের সাথে করতে হয়। কেননা পরবর্তী সময়ে বেশি ডিম উৎপাদন, মুরগির এই বাড়ন্ত সময়ের গঠনের ওপর নির্ভরশীল। বাড়ন্ত সময়ে মুরগি সুগঠিত হলে বেশি দিন ডিম পাড়ে। নিম্নে অধিক ডিম উৎপাদনশীল কয়েকটি লেয়ার মুরগির নাম দেওয়া হল। এগুলো বাণিজ্যিক লেয়ার হিসেবে পরিচিত।

১. হাইসেক্স ব্রাউন
২. হাইসেক্স হোয়াইট
৩. স্টার ক্রস ব্রাউন
৪। লোহম্যান
৫. ইসা ব্রাউন
৬. হাই লাইন
৭. স্টার ক্রস-৫৭৯
৮. হারবার্ড

উন্নত ব্যবস্থাপনায় এসব জাতের মুরগি বছরে ২৮০টি পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। প্রতিটি ডিমের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম।

বাড়ন্ত মুরগির একটি সুষম খাদ্য তালিকা নিম্নে দেওয়া হল (বয়স ৮-১৬ সপ্তাহ) :

উপকরণ	শতকরা হার
গম ভাঙা	৫০ ভাগ
গমের ভুসি	৫ ভাগ
চালের কুঁড়া	২১ ভাগ
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৯ ভাগ
তিলের খৈল	১২ ভাগ
ঝিনুকের গুঁড়া	২.২৫ ভাগ
লবণ	০.৫ ভাগ
ভিটামিন মিনারেল মিশ্রণ	০.২৫ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ

প্রতিটি বাড়ন্ত মুরগিকে দৈনিক ৭০-৮০ গ্রাম খাদ্য দিতে হবে। সঙ্গে খাদ্যের পূর্ণতা হিসেবে ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স দিতে হবে।

বাড়ন্ত মুরগি পালনে করণীয়

১. বাড়ন্ত মুরগি রাখার আগে লিটার পরিষ্কার করে নিতে হয়।
২. জীবাণুনাশক ওষুধ যেমন–ফিনাইল, আয়োসন বা লাইজল পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে ঘর ধুতে হয়।
৩. নতুন লিটার, তুষ বা কাঠের গুঁড়া ঘর শুকানোর পর মেঝেতে ছড়িয়ে দিতে হয়।
৪. খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার করে সারিবন্ধ ভাবে রাখতে হবে। সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা সর্বদা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বাড়ন্ত মুরগির মেঝের জায়গা বাড়াতে হবে।
৬. বাড়ন্ত মুরগির ঘরে কম বয়সের বাচ্চা রাখা যাবে না।
৭. পাঁচ মাস বয়সে মুরগি ডিম পাড়া শুরু করে। তবে পূর্ণ উৎপাদনে আসতে আরো এক মাস সময় লাগে। এসময় মুরগির খাদ্য, পানি ও বাসস্থান বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে।
৮. নির্ধারিত বয়সে প্রয়োজনীয় সকল সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে।

৯. চার থেকে সাড়ে চার মাস বয়স হলেই তাদেরকে ডিম পাড়ার ঘরে দিতে হয়। তবে এর আগে বাড়ন্ত মুরগিকে প্রয়োজনীয় ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে উকুন হলে এই সময় কীটনাশক দ্রব্য স্প্রে করতে হবে।

লেয়ার মুরগি পালন

সাধারণত ডিম পাড়ার মুরগি পালন ২১-৭৬ সপ্তাহের মধ্যেই সীমিত থাকে। উক্ত সময়ে মুরগিকে বেশি উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, রোগমুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অবশ্যই দিতে হবে। তাহলেই লেয়ার পালন লাভজনক হবে। লেয়ার মুরগির একটি সুষম খাদ্য তালিকা (বয়স ১৬ সপ্তাহের ওপরে) দেওয়া হল।

উপকরণ	শতকরা হার
গম ভাঙা	৪৬ ভাগ
গমের ভুসি	৫ ভাগ
চালের কুঁড়া	২৫ ভাগ
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৮ ভাগ
তিলের খৈল	১২ ভাগ
ঝিনুকের গুঁড়া	৩.২৫ ভাগ
লবণ	০.৫ ভাগ
ভিটামিন মিনারেল মিশ্রণ	০.২৫ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ

প্রতিটি লেয়ারকে দৈনিক ১১০-১২০ গ্রাম খাদ্য দিতে হবে। সঙ্গে ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ দিতে হবে। লেয়ার খাদ্যে কমপক্ষে ১৬% ক্রুড আমিষ থাকা প্রয়োজন।

লেয়ার মুরগি পালনের করণীয়

১. ঘর, ঘরের সকল আসবাবপত্র ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। মেঝেতে নতুন লিটার ১৫-২০ সে.মি পুরু করে বিছিয়ে দিতে হবে।
২. খাবার ও পানির পাত্র দৈনিক পরিষ্কার করতে হবে যাতে কোন প্রকার ময়লা না থাকে।
৩. ডিম পাড়া মুরগির ঘরে ৪০-৬০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
৪. চার থেকে সাড়ে চার মাস বয়স হলেই, অর্থাৎ বাড়ন্ত মুরগি প্রত্যহ ২-৪টি ডিম পাড়া শুরু করলে তাদেরকে লেয়ার হাউজে নিয়ে আসতে হবে। তখন থেকেই লেয়ারকে সুষম খাদ্য দিতে হবে। এসময় খনিজ বিশেষ করে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণে ঝিনুকের গুঁড়া দেওয়া দরকার।
৫. ডিম পাড়ার সাথে সাথে কৃত্রিম আলোর সময়সীমা বাড়াতে হবে। দিবারাত্র মিলে মোট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে ১৬ ঘণ্টা আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৭. ডিম দিনে ২-৩ বার সংগ্রহ করতে হবে।
৮. মুরগিকে নিয়মিত কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে।
৯. লিটার সপ্তাহে ২ বার করে ওলটপালট করে দিতে হবে। মাঝে মাঝে লিটারে চুন ছিটিয়ে দেওয়া ভালো।
১০. সাধারণত ৭৫-৭৬ সপ্তাহের মধ্যেই ডিম পাড়া মুরগি খাওয়ার জন্য বিক্রি করে দিতে হয়।

খামার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা

সুষ্ঠু খামারের ব্যবস্থাপনা অধিক উৎপাদনের পূর্বশর্ত। ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকলে খামারে ক্ষতি হবে, খামার অলাভজনক হবে। বাংলাদেশে অত্যধিক গরম ও আর্দ্রতায় লেয়ার খামার ব্যবস্থাপনায় জটিলতা দেখা দেয়। ফলে অনেক খামারেই এ সময় উৎপাদন ব্যাহত হয়।

অত্যধিক গরমে লেয়ার মুরগির প্রতিক্রিয়া

ক. মুরগির শ্বাসকষ্ট হয়, শব্দ করে শ্বাস নিতে থাকে।
খ. অধিক পিপাসার ফলে পানি বেশি খায়, দানাদার খাদ্য খাওয়া কমে যায়।

অত্যধিক গরমে করণীয়

ক. মুরগির ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা।
খ. টিনের চালে পানি ঢেলে টিন ভিজা রাখা।
গ. চালের নিচে সিলিং দেওয়া।
ঘ. মুরগিকে সুষম খাদ্য ও পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা।
ঙ. খামারে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

লেয়ার মুরগির টিকা প্রদান ব্যবস্থা

বয়স	রোগের নাম	টিকা দান পদ্ধতি
৬ দিন	বাচ্চা রাণীক্ষেত	বি, সি, আর, ডি, বি এক চোখে এক ফোঁটা ড্রপারের সাহায্যে।
১৪ দিন	গামব্রো	খাবার পানিতে নির্দেশিকা মোতাবেক মিশাতে হবে।
২১ দিন	বাচ্চা রাণীক্ষেত (বুস্টার)	বি, সি, আর, ডি, বি এক চোখে এক ফোঁটা ড্রপারের সাহায্যে।
৬০ দিন ও প্রতি ৬ মাস পরপর	রাণীক্ষেত	আর, ডি, বি টিকা ১ মি.লি., রানের মাংসে ইনজেকশন দিতে হবে।
৪২ দিন	ফাউল পক্স	ফাউল পক্স টিকা ইনজেকশন দিতে হবে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ ব্রয়লার ও বাড়ন্ত মুরগির জন্য দানাদার খাদ্য তৈরি

ব্রয়লারের খাদ্য

উপকরণ	পরিমাণ
গম ভাঙা/ভুট্টা ভাঙা	৫.০ কেজি
চালের কুঁড়া	১.১ কেজি
খৈল (চিনা বাদাম, তিল)	১.৬ কেজি
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১.০ কেজি
সয়াবিন মিল	১ কেজি
হাড়ের গুঁড়া	.২৫ গ্রাম
লবণ	৫০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	২৫ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

বাড়ন্ত মুরগির খাদ্য

উপকরণ	পরিমাণ
গম/ভুট্টা ভাঙা	৫.০ কেজি
গমের ভুসি	০.৫ কেজি
চালের কুঁড়া	২.১ কেজি
তিলের খৈল	১.২ কেজি
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	০.৯ কেজি
ঝিনুকের গুঁড়া	০.২২৫ কেজি
লবণ	০.০৫০ কেজি
ভিটামিন মিনারেল মিশ্রণ	০.০২৫ কেজি
মোট	১০.০০ কেজি

এভাবে তৈরী খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলা হয়।

উপকরণ

১. দাঁড়ি পাল্লা
২. ট্রে বা বালতি
৩. অ্যালুমিনিয়াম বোল/ডিশ।

কাজের ধাপ

১. প্রথমে ব্রয়লারের খাদ্য তৈরীর নমুনা অনুযায়ী হার ভিত্তিক দশ কেজি খাদ্য তৈরির একটি চার্ট তৈরি কর।
২. সঠিক হিসাব অনুযায়ী দশ কেজি খাদ্য উপকরণ মেপে নাও।
৩. হিসাবসহ পৃথকভাবে মাপা খাদ্য উপকরণগুলো শিক্ষককে দেখাও।
৪. এখন উপকরণগুলো একত্রে মিশিয়ে খাদ্য তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি জনপ্রিয় ব্রয়লার?
ক. ইসা ব্রাউন খ. ইসা ভিডেট
গ. স্টার ক্রস ব্রাউন ঘ. স্টার ক্রস- ৫৭৯

২. বাড়ন্ত মুরগির একটি খাদ্য তালিকা নিচের ছকে দেখানো হলো।

উপকরণ	শতকরা
গম ভাঙা	৫০ গ্রাম
গমের ভুসি	৫ গ্রাম
চালের গুঁড়া	২১ গ্রাম
শুঁটকি গুঁড়া	১০ গ্রাম
তিলের খৈল	১১ গ্রাম
ঝিনুকের গুঁড়া	২ গ্রাম
লবণ	১ গ্রাম

যদি প্রত্যেক মুরগিকে দৈনিক ৭০ গ্রাম খাদ্য দিতে হয় তবে ১০টি মুরগির জন্য দৈনিক কত গ্রাম শুঁটকি মাছের গুঁড়া প্রয়োজন?

ক. ৫০ গ্রাম খ. ৬০ গ্রাম
গ. ৭০ গ্রাম ঘ. ৭০ গ্রাম

৩. লেয়ার মুরগি পালনে করণীয়-
i. ঘরসহ সকল আসবাব পত্র পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে
ii. ঘরে ৪০-৬০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে রাখতে হবে
iii. ডিম দিনে ২ বার করে ওলটপালট করতে হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. লেয়ার মুরগি পালনের ক্ষেত্রে টিনের চালের নিচে সিলিং দেওয়া হয়। কারণ-
i. মুরগির ঘর ও চাল মজবুত করে
ii. মুরগিকে অত্যাধিক গরম হতে রক্ষা করে
iii. মুরগির ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নাজমা সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য ব্রাক থেকে ঋণ নিয়ে একটি লেয়ার খামার গড়ে তোলেন। নাজমা ব্রাক আয়োজিত কর্মশালায় যোগ দেন। সেখানে প্রধান বক্তা মানসম্মত ডিম উৎপাদনে সুষম খাদ্য উপাদানের ভূমিকার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নাজমা প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান নিজ খামারে প্রয়োগ করে সফল হয়েছিলেন।

ক. লেয়ার কী?
খ. লেয়ার ডিম পারা শুরু করলে সুষম খাদ্যে ঝিনুকের গুঁড়া দেওয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. নাজমা ব্রাক কর্মশালার অভিজ্ঞতাকে সফল লেয়ার খামার স্থাপনে কীভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন? বর্ণনা কর।
ঘ. কর্মশালার প্রধান বক্তা রোগ প্রতিরোধের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন কেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুকুরে হাঁস-মুরগি-মাছ এর সমন্বিত চাষ

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পুকুরে হাঁস-মুরগি-মাছ একই সময়ে উৎপাদন করার পদ্ধতিকে সমন্বিত চাষ বলা হয়। বাংলাদেশে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষের ওপরে। এসব পুকুরের অধিকাংশই মজা বা অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। অর্থাভাবে সার ও মাছের খাদ্য সরবরাহ করতে না পারায় এসব পুকুরে উৎপাদন খুব কম বা নেই বললেই চলে। অন্যদিকে এদেশে হাঁস-মুরগি পালন বহুল প্রচলিত। *২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশে মোরগ ও মুরগির সংখ্যা প্রায় ২০.৬৮৯ কোটি এবং হাঁসের সংখ্যা প্রায় ৩.৯০৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

পুকুরে হাঁস-মুরগির সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা পুকুরের জৈব সার উৎপাদক ও সরাসরি মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাঁস-মুরগি-মাছ সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে পুকুরে সার ও খাদ্য সরবরাহ ছাড়াই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া পুকুরে পানির উপর হাঁস-মুরগির ঘর তৈরি করা হয়। এ জন্য হাঁস-মুরগি পালনে বাড়তি জমির প্রয়োজন হয় না।

হাঁস ও মাছের সমন্বিত

চাষের সুবিধা

১. হাঁসের বিষ্ঠা উৎকৃষ্ট সার, পুকুরে হাঁস পালন করলে মাছের জন্য কোনো সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয় না।
২. কোনো কোনো মাছ, হাঁসের বিষ্ঠা সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।
৩. পানিতে পড়ে যাওয়া হাঁসের খাদ্য মাছের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৪. হাঁস পুকুরের শামুক, ঝিনুক খেয়ে ফেলে। ফলে মাছকে আক্রান্ত করে এমন কিছু পরজীবীর জীবনচক্র বিনষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া হাঁস পুকুরের ব্যাঙ, মশা ও অন্যান্য জলজ পোকা খেয়ে পুকুরের পরিবেশ ভালো রাখে।
৫. হাঁস পুকুরে সাঁতার কাটার সময় বাতাস থেকে অক্সিজেন পানিতে মিশে যায়। এই অক্সিজেন মাছের জন্য প্রয়োজনীয়।
৬. খাদ্যের অন্বেষণে হাঁস পানিতে ডুব দিয়ে পুকুরের তলায় মাটি নাড়াচাড়া করে মাটির সারবস্তু পানিতে মিশিয়ে দেয়। ফলে পানির উৎপাদিকাশক্তি বেড়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে পুকুরের তলায় মাটিতে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যায়।
৭. পুকুরের উপর হাঁসের ঘর তৈরি করা যায়, হাঁসের জন্য আলাদা জমির প্রয়োজন হয় না।
৮. জলজ উদ্ভিদ দমনেও হাঁসের ভূমিকা রয়েছে।

হাঁসের ঘর

হাঁসের ঘর নির্মাণ করার জন্য পুকুরের নিরিবিলি জায়গা বেছে নিতে হয়। পুকুরের পাড় থেকে দূরে যেখানে পানির গভীরতা বেশি সেখানে হাঁসের ঘর তৈরি করা উচিত। তাতে শুষ্ক মৌসুমে পুকুরের পানি কমে গেলেও হাঁসের ঘর শুকনো জায়গায় পড়ে না। পানির উপরে ভাসমান অথবা স্থায়ী দুই জাতের ঘর তৈরি করা যায়। পুকুরের পাড়েও ঘর তৈরি করা যায়।
সাধারণত প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের জন্য ২৭০০ বর্গ সেমি জায়গার দরকার হয়। অর্থাৎ যদি ৩০টি হাঁসের জন্য ঘর নির্মাণ করতে হয় তবে ঘরটির আয়তন কমপক্ষে ১০ বর্গমিটার হওয়া উচিত, ঘরের উচ্চতা ২.২৫ মিটার।
ঘরের ছাদ টিন, খড়, ছন দ্বারা তৈরি করা যায়। তবে ঘরের মেঝে বাঁশের বাতা দ্বারা এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে হাঁসের বিষ্ঠা সরাসরি পানিতে পড়ে যায়। মেঝেতে পর পর সাজানো বাঁশের বাতার দূরত্ব ১ সেমি হওয়া উচিত।

---

* উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০০৮

কারণ দূরত্ব বেশি হলে তাতে হাঁসের পা আটকে যেতে পারে। হাঁসের সম্পূর্ণ বিষ্ঠা সরাসরি পানিতে না পড়লে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

জাত নির্বাচন

সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে ইনডিয়ান রানার বা খাকি ক্যাম্বেল ও জিনডিং জাতের হাঁস পালার জন্য নির্বাচন করা হয়। কারণ ইন্ডিয়ান রানার বছরে ২০০ থেকে ২৫০টি, জিনডিং ও খাকি ক্যাম্বেল ২৩০ থেকে ২৫০টি ডিম দিয়ে থাকে।

পুকুর প্রস্তুতকরণ

পুকুর মাছ চাষের উপযোগী করতে হয়। এই জন্য পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ যেমন- শোল, বোয়াল, গজার, আইড় ও টাকি সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুরের অবাঞ্ছিত মাছের জন্য রোটেনন ৩৫ গ্রাম প্রতি শতাংশে ব্যবহার করা হবে অথবা পানি নিষ্কাশন করে মাছ অপসারণ করা হয়।

পুকুর থেকে জলজ আগাছা শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে। পুকুরের তলদেশ হতে কাদা, পচা পাতা আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয়। পুকুরের তলদেশ যদি অসমান থাকে তা সমান করে দিতে হবে। পুকুর পাড় উঁচু-নিচু থাকলে তা সমান করে দিতে হবে। পুকুর পাড়ে বেশি জঙ্গল থাকলে কিছু কেটে আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

পুকুরের পানি নিষ্কাশন করার পর প্রতি শতকে ১ কেজি চুন ছিটিয়ে দিতে হয়। পুকুরে যদি বিষ প্রয়োগ করা হয় তাহলে বিষ প্রয়োগের ৭ দিন পর চুন ব্যবহার করতে হবে। চুন ব্যবহারের ৭ দিন পর পুকুরের উপর নির্মিত ঘরে হাঁসের বাচ্চা আনা যাবে। হাঁসের বাচ্চা আনার ১০ থেকে ১২ দিন পর পুকুরে মাছ ছাড়তে হবে। সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে পুকুর প্রস্তুতকরণের পর সঠিকভাবে মাছের প্রজাতি নির্বাচন করা প্রয়োজন।

পুকুরে মাছের জাত নির্বাচন

এই চাষ পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছের খাদ্য পুকুরের তলায় জমা হয়। এই জন্য মৃগেল, কালবাউস ও কমনকার্প জাতীয় মাছ ছাড়তে হয়। কারণ এই জাতীয় মাছ পুকুরের তলায় জমাকৃত খাদ্য খায়। এছাড়া পুকুরে গ্রাসকার্প মাছ ছাড়া ভালো।

মাছের ওজন পরীক্ষা

প্রতি মাসে একবার জাল টেনে মাছের ওজন পরীক্ষা করে দেখতে হয়। মাছের বৃদ্ধি কম হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

মাছ ধরা

সাধারণত ১০ থেকে ১২ মাস পর মাছ বিক্রি উপযোগী হয়। এই সময় মাছ বাজারজাত করে পুনরায় ৭-৮ সেমি আকারে সিলভার কার্পের পোনা ছাড়তে হয়।

মাছের রোগ দমন

মাছের রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা করা বেশ কঠিন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পুকুর প্রস্তুতকরণ মাছের রোগ দমনের প্রধান শর্ত। তবে রোগ দেখা দিলে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নেওয়া উচিত।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

১. হাঁসের প্রাকৃতিক খাদ্য

পুকুর থেকে হাঁস প্রাকৃতিক খাবার খায়। পুকুরের আগাছা, ক্ষুদে পোনা, পোকামাকড়, কচি ঘাস, পাতা, ঝিনুক, শামুক, ছোট মাছ ইত্যাদি খেয়ে হাঁস তার খাদ্যের প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেক মেটায়। বাকি প্রয়োজন মেটানোর জন্য হাঁসকে সুষম খাদ্য দিতে হয়।

২. খাদ্য সামগ্রী

ভাঙা গম, গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, তিলের খৈল, সয়াবিন ও মাছের গুঁড়া একত্রে মিশিয়ে হাঁসকে খাওয়াতে হয়। বাচ্চা হাঁসের খাবারে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২১ ভাগ ও ডিম দেওয়া হাঁসের জন্য আমিষের পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ রাখতে হবে। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ১.৫ গ্রাম/প্রতি কেজি খাদ্যে মিলাতে হয়। হাঁসকে খাওয়ানোর সময় প্রয়োজন মতো পানি মিশিয়ে দিতে হবে।

৩. খাবার খাওয়ানোর পাত্র

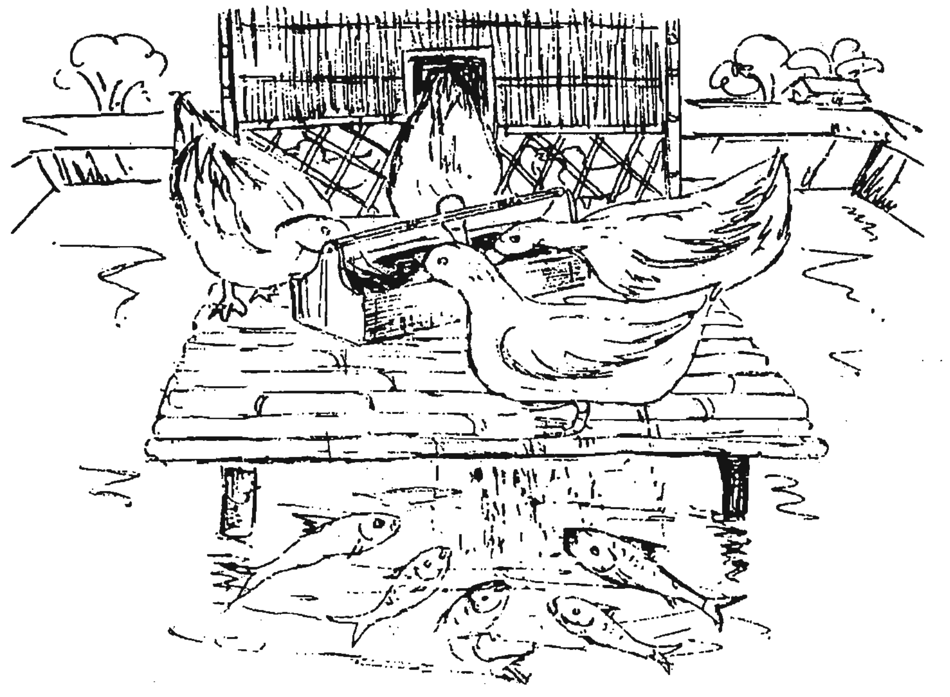
খাবারের পাত্রগুলোর কাঠের, টিনের বা এলুমিনিয়ামের হতে পারে। বাচ্চা হাঁসকে খাওয়ানোর জন্য পাত্রের গভীরতা কম থাকতে হবে।

৪. হাঁসের খাদ্য

হাঁস ভিজা খাবার পছন্দ করে। হাঁসের খাদ্যে সবসময় পানি মিশিয়ে দিতে হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাওয়াতে হয়।

হাঁসের সুষম খাদ্যের তালিকা

খাদ্যের উপাদান	বাচ্চা অবস্থায় খাদ্যের শতকরা হার	পরিণত অবস্থায় খাদ্যের শতকরা হার
ভাঙা গম	৪৫.০	৪৫.০
চালের কুঁড়া	২৭.০	৩০.০
তিলের খৈল	১৪.০	১২.০
মাছের গুঁড়া	১২.০	১০.০
ঝিনুক চূর্ণ	১.৫	২.৫
লবণ	০.৫	০.৫
মোট	১০০	১০০



হাঁস ও মাছের সমন্বিত খাদ্য চক্র

হাঁসের খাদ্য ও পানি আলাদা পাত্রে দিতে হয়। সাধারণত ১-২ মাস বয়স পর্যন্ত হাঁসকে দিনে ৪-৫ বার করে খাবার দিতে হয়। ৮ সপ্তাহ বয়স থেকে ২-৩ বার এবং বাড়ন্ত হাঁসকে ২ বার খাওয়াতে হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক একটি হাঁসকে প্রতিদিন ১১০ গ্রাম খাদ্য দিলে চলে। সকাল নয়টার দিকে হাঁসকে প্রথমবারের মতো খাওয়াতে হবে। তারপর পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। বিকালে সূর্যাস্তের আগেই আবার খাবার খাওয়াতে হবে। খাওয়ানোর পর ঘরে তুলতে হবে। রাত্রের জন্য পানি ও খাবার দিয়ে রাখতে হবে তাতে হাঁস রাত্রে ইচ্ছামতো খাবার ও পানি খেতে পারবে। সমন্বিত হাঁস ও মাছ চাষ পদ্ধতিতে পুকুরে মাছের আলাদা খাদ্য বা সার প্রয়োগ করা হয় না। কারণ হাঁসের বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাদ্য মাছের খাদ্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

৫. হাঁস-মাছের সংখ্যা নির্ণয়

হাঁসের সংখ্যা নির্ণয়

প্রতি শতক পুকুরে ২টি হাঁস পালন করলে পুকুরে মাছের জন্য আলাদা খাদ্য সরবরাহ করতে হয় না। হাঁসের বয়স আড়াই বছর হলে বাজারজাত ও বিক্রির ব্যবস্থা করে সমান সংখ্যক নতুন হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করতে হয়।

মাছের সংখ্যা নির্ণয়

মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে প্রতি শতকে ২৫টি মাছের পোনা ছাড়া যায়। হাঁস পালন পুকুরে ৮-১০ সেমি আকারের মাছের পোনা ছাড়তে হয়। এই আকারের মাছ হাঁসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। মাছের ওজন ৪ গ্রামের কম হলে হাঁস মাছ খেয়ে ফেলতে পারে। নিম্নের তালিকা অনুসারে সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে পুকুরে মাছ ছাড়লে গ্রাস কার্প ছাড়া অন্যান্য মাছের খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

মাছের প্রজাতি	শতকরা আনুপাতিক হার	শতক প্রতি মাছের সংখ্যা
কাতলা	১২	৩টি
সিলভার কার্প	৩৪	৯টি
মৃগেল	৩০	৭টি
গ্রাস কার্প	১২	৩টি
মিরর কার্প	১২	৩টি

মাছ ও মুরগির চাষ

হাঁস ও মাছ চাষ করার জন্য যে পুকুর তৈরি করা হয় ঐ পুকুরে মাছের সঙ্গে মুরগিও চাষ করা যায়। হাঁসের মতো এক্ষেত্রেও মুরগির উচ্ছিষ্ট খাবার ও বিষ্ঠা মাছের খাদ্য ও পুকুরের জৈব সার উৎপাদক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে ২০০৬-২০০৭ সালে মোরগ ও মুরগির সংখ্যা প্রায় ২০.৬৮৯ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এদের সমন্বিত পদ্ধতিতে চাষ করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে সুবিধা

১. পুকুরের ওপর মুরগির ঘর তৈরি করা হয় বলে আলাদা জায়গার প্রয়োজন হয় না।
২. মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি পানিতে পড়ে।
৩. মুরগির বিষ্ঠা পুকুরের সার যোগান দেয়।

ঘর তৈরি ও পুকুর প্রস্তুতকরণ

মুরগির ঘর তৈরি

পুকুরের নিরিবিলি জায়গা মুরগির ঘর তৈরির জন্য নির্বাচন করতে হবে। জায়গাটা আলো বাতাসপূর্ণ থাকতে হবে। প্রয়োজনে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

পুকুরের উপর মুরগির ঘর তৈরি করলে ঘরের মেঝে বাতা দিয়ে তৈরি করতে হবে। মেঝেতে একটি বাতা হতে অন্যটির সামান্য দূরত্ব থাকা উচিত যাতে বাতার ফাঁকে মুরগির পা না ঢুকে। আবার ফাঁক দিয়ে মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাবার সরাসরি পানিতে পড়তে পারে। ঘর আয়তকার হওয়া উচিত এবং পুকুরের পানির গভীরতা কমপক্ষে ১ মিটার হতে হবে যাতে শুকনো মৌসুমে পানি কমে গেলেও মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাদ্য পানিতে পড়তে পারে। দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য ঘর দোচালা করাই ভালো। ঘরের মেঝে থেকে ২০০-২৫০ সেমি উঁচুতে চালা দিতে হবে। ঘরের চারদিক ৬০ সেমি উচ্চতা পর্যন্ত বাঁশের শক্ত চাটাই দিয়ে ঘিরে দিতে হবে, চাটাইয়ের উপর থেকে চালা পর্যন্ত ৪ সেমি জায়গা এমনভাবে বাঁশের চটা দিয়ে ফাঁক ফাঁক করে ঘিরে দিতে হবে যেন ঘরে ঠিকভাবে আলো বাতাস আসে। শীত অথবা গ্রীষ্মকালে ছনের ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।

প্রজাতি নির্বাচন : অধিক মাংস উৎপাদনের জন্য স্টারব্রো ব্রয়লার জাতীয় মুরগি উত্তম। অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য স্টার ক্রস, ইসা ব্রাউন ও লোহম্যান জাতীয় লেয়ার মুরগি নির্বাচন করা যেতে পারে।

পুকুর প্রস্তুতকরণ : হাঁস ও মাছের অনুরূপ।

মুরগির ও মাছের খাদ্য

মুরগি : মুরগির খাদ্য গম, চালের কুঁড়া, তিলের খৈল, মাছের গুঁড়া ও লবণ মিশিয়ে তৈরি করা হয়।

ব্রয়লার মুরগির সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য এবং ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদনের হার বৃদ্ধির জন্য এদেরকে সুষম খাদ্য দিতে হবে। যা পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

মাছ : সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় তেমন ঝামেলা নেই। কারণ মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাবার পুকুরের পানিতে পড়ে। এই বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট মাছের খাদ্য হিসেবে পুকুরে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে মাছের খাদ্য ও সার সরবরাহের প্রয়োজন হবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পুকুরের মুরগির ঘনত্ব বা সংখ্যার ওপর।

মুরগির সংখ্যা : প্রতি শতক পুকুরে ২টি মুরগি পালন করলে মাছ উৎপাদনের জন্য কোনো প্রকার সার বা খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। মুরগির এই ঘনত্বে পুকুরের পানিও দূষিত হয় না।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ পুকুরে হাঁস-মুরগি-মাছের সমন্বিত খামার পর্যবেক্ষণ

উপকরণ

স্থানীয় বা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে স্থাপিত খামার ও নোট খাতা।

কাজের ধাপ

১. নিকটবর্তী কোনো একটি হাঁস-মুরগি-মাছের সমন্বিত খামারে যাও। (খামারটি হাঁস-মাছ বা মুরগি-মাছ বা হাঁস-মুরগি-মাছের সমন্বিত খামার হতে পারে।
২. পুকুরের আকার, হাঁসের ও মাছের সংখ্যা জেনে লিপিবদ্ধ কর।
৩. এ পদ্ধতিতে হাঁসের ডিম ও মাছ উৎপাদন করে কেমন লাভবান হওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ কর।
৪. বাংলাদেশে এ ধরনের খামার ব্যাপকভাবে গড়ে তোলা উচিত কিনা, তার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

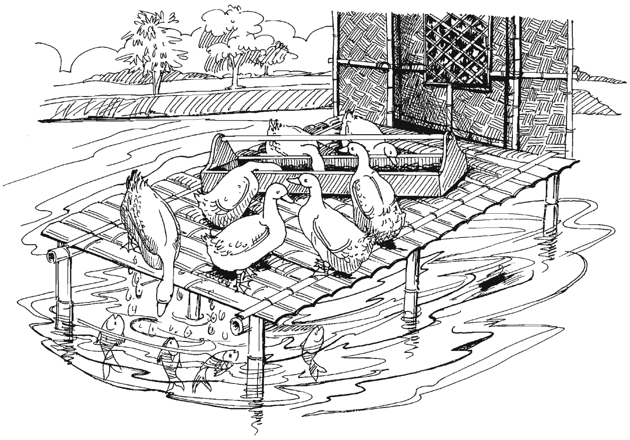
আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত যুবক সোলায়মান তার বাড়ির ১ একর আগাছাপূর্ণ পতিত পুকুরে হাঁস-মাছ চাষের উপযোগী করার জন্য যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেন। অবাঞ্ছিত মাছ দমনে অনুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে কয়েকদিন পর পুকুরে চুন ছিটিয়ে দিলেন।

১. সোলায়মান পুকুরে রাক্ষুসে মাছ দমনের জন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার করেন?
   ক. ডিপটারেক্স খ. ম্যালাথিয়ন
   গ. নগস ঘ. রোটেনন।

২. উল্লিখিত পুকুরে কত কেজি চুন ছিটাতে হবে?
   ক. ২০০ কেজি খ. ১৫০ কেজি
   গ. ১০০ কেজি ঘ. ৫০ কেজি

৩. পুকুরে হাঁস-মাছ চাষের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্ভাব্য কাজের-
   সবচেয়ে যৌক্তিক ক্রমবিন্যাস হবে-
   ক. আগাছা পরিষ্কার, অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ, ঘর নির্মাণ ও হাঁসের বাচ্চা আনা এবং সঠিক প্রজাতির মাছ ছাড়া
   খ. অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ, আগাছা পরিষ্কার, ঘর নির্মাণ ও হাঁসের বাচ্চা আনা এবং সঠিক প্রজাতির মাছ ছাড়া।
   গ. আগাছা পরিষ্কার, জঞ্জাল কাটা, অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ, সঠিক প্রজাতির মাছ ছাড়া এবং ঘর নির্মাণ ও হাসের বাচ্চা আনা?
   ঘ. অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ, সঠিক প্রজাতির মাছ ছাড়া, আগাছা পরিষ্কার, এবং ঘর নির্মাণ ও হাসের বাচ্চা আনা ।

সৃজনশীল প্রশ্ন



ক. চিত্রে প্রদর্শিত চাষ পদ্ধতির নাম কী?
খ. এ ধরনের চাষ পদ্ধতিতে মাছের পৃথক খাদ্যের প্রয়োজন নেই কেন?
গ. তোমার বাড়ির পুকুরে হাঁসের পরিবর্তে মুরগি-মাছের চাষ পদ্ধতির প্রয়োগ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।
ঘ. প্রদর্শিত চাষ পদ্ধতিটি জনবহুল বাংলাদেশের আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে-যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে হাঁস-মুরগি পালন করা হয় তাকে হাঁস-মুরগির খামার বলে। উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে খামার তিন প্রকার হতে পারে। যথা-

১. মাংস উৎপাদন খামার বা ব্রয়লার খামার
২. বাচ্চা উৎপাদন খামার বা হ্যাচারি
৩. ডিম উৎপাদন খামার বা লেয়ার খামার।

খামার স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভজনকভাবে ডিম ও মাংস উৎপাদন করা। সুষ্ঠু পরিকল্পনাই একমাত্র এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়।

খামার পরিকল্পনা

হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করতে হলে প্রথমেই খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে খামার স্থাপনে খুব বড় পরিকল্পনা নেওয়া ঠিক নয়। এতে বেশি মূলধন ও বেশি জায়গার প্রয়োজন হবে। ছোট আকারে হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনের ২-১ বছরের অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে বড় আকারের পরিকল্পনা গ্রহণে সাহায্য করবে। ছোট আকারে খামার কম মূলধনে, অল্পসংখ্যক হাঁস-মুরগি নিয়ে শুরু করা ভালো।

বরাদ্দকৃত অর্থ পরিকল্পনা গ্রহণের মূল মাধ্যম। বরাদ্দকৃত অর্থকে মূল তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

১. প্রাথমিক মূলধন বিনিয়োগ
২. বাৎসরিক পৌনঃপুনিক ব্যয় বা আবর্তক ব্যয় ও
৩. লাভ-ক্ষতি।

প্রাথমিক মূলধন বিনিয়োগের খাতে পড়ে খামারের জায়গায় ঘর, হাঁস-মুরগি ক্রয়, আবশ্যকীয় রাস্তাঘাট, পানির ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি, বেড়া ও নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি। বাৎসরিক পৌনঃপুনিক ব্যয় বা আবর্তক ব্যয় খাতে পড়ে দৈনন্দিন খরচ, হাঁস-মুরগির খাদ্য, যাতায়াত খরচ, বিদ্যুৎ খরচ, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি। এছাড়া মুরগির টিকা, ওষুধপত্র ইত্যাদি বিবিধ খরচ এর আওতায় আসবে।

খামার ব্যবস্থাপনা

উন্নত ব্যবস্থাপনাই খামারে অধিক উৎপাদনের চাবিকাঠি। তাই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

১. **বাসস্থান :** উন্নত ও আরামদায়ক বাসস্থান দরকার। ঘরের উচ্চতা ২ মিটার, বেড়ার নিচে ৭৫ সেমি ইটের গাঁথুনি, তার উপরে ১২০ সেমি তারের জাল দিয়ে বেড়া দিতে হবে। মেঝে পাকা হতে হবে। ঘরের চাল ছন বা বাঁশের বেড়া দিয়ে করা যেতে পারে। বাঁশের বেড়ার নিচে পলিথিন দেওয়া ভালো। ঘর আরামদায়ক হবে।

২. **মেঝের জায়গা :** লিটার ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি লেয়ারের জন্য ২৩০০-২৮০০ বর্গ সেমি জায়গার প্রয়োজন হবে। এ হিসেবে ঘর তৈরি করতে হবে।

৩. **লিটার ব্যবস্থাপনা :** লেয়ার মুরগির ঘরের মাঝে ১৫-২০ সেমি পুরুে তুষ বা কাটের শুকনো গুঁড়া বিছিয়ে দিতে হবে। প্রতি সপ্তাহে অন্তত ছয় বার এই লিটার ওলটপালট করে দিতে হবে। মাঝে মাঝে লিটার পরিবর্তন করে রোদে শুকানো ভালো।



মুরগির খামার

৪. **ঘরে আলো ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থা :** মুরগির ঘরে অবশ্যই আলো ও বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. **তাপমাত্রা :** বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা এ দুটো পরিবেশই মুরগির ডিম উৎপাদন ব্যাহত করতে পারে।

৬. **মুরগির খাদ্য :** খামারে অন্ততপক্ষে ১৫ দিনের জন্য মুরগির খাদ্য মজুদ রাখতে হবে। মুরগিকে সুষম খাবার দিতে হবে। মুরগির খাদ্য তৈরি করার সময় নিম্নলিখিত উপাদানগুলোর প্রয়োজনীয় পরিমাণ অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন (১) আমিষ বা প্রোটিন (২) শর্করা বা শ্বেতসার (৩) স্নেহ বা তৈল (৪) ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (৫) খনিজ পদার্থ বা লবণ এবং (৬) পানি।

৭. **খাবার পাত্র :** খাবার পাত্র মুরগির বয়স অনুপাতে যে কোনো আকারের হতে পারে। প্রতিদিন পাত্র পরিষ্কার করতে হবে।

৮. **পানির পাত্র :** পানির পাত্র টিন দিয়ে করা যেতে পারে। প্রতিদিন পাত্র পরিষ্কার করতে হবে এবং মুরগিকে বিশুদ্ধ পানি দিতে হবে।

৯. **ঝিনুকের গুঁড়া রাখার পাত্র :** ডিম পাড়া মুরগিকে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণের জন্য ঝিনুকের গুঁড়া খেতে দিতে হয়। অতএব মুরগির ঘরে ২-৩ টা পাত্রে এই গুঁড়া রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. **মুরগির খাওয়ানো পদ্ধতি :** মুরগিকে প্রত্যহ ৩ বার খাবার দেওয়া যেতে পারে। সকাল ৭-৮ টায় প্রথমবার, দুপুর ১২-১টা ২য় বার এবং বিকাল ৪-৫ টায় তৃতীয় বার খাবার দিতে হবে।

১১. **ডিম পাড়ার বাক্স :** মুরগির ডিম পাড়ার বাক্স রাখতে হবে। বাক্সে কিছু খড় দিতে হবে। তা হলে ডিম ভাঙার সুযোগ থাকবে না।

১২. **মুরগির ঘরে আলোর ব্যবস্থা ঃ** ডিম পাড়া অবস্থায় মুরগির ঘরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কৃত্রিম আলোসহ ১৬ ঘণ্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. **মুরগির ঠোঁটকাটা :** মুরগির ঠোঁট কেটে দিলে একে অপরকে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতে পারে না। ডিম ভাঙতে পারে না। মেশিনের সাহায্যে ঠোঁট কাটা যায়। প্রতি ৪-৫ মাস অন্তর ঠোঁট কাটানো উচিত।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

১০০টি লেয়ারের জন্য একটি খামার স্থাপনের আয়-ব্যয়ের হিসেবের নমুনা এখানে দেওয়া হয়েছে।

হিসাবের উদাহরণ (নমুনা)		
মোট ব্যয়		
১। জমি : নিজস্ব বাড়িতে খামার স্থাপন		
২। ঘর : ১০০টি লেয়ারের জন্য ৩০০ ঘনফুট (কাঁচাঘর) মেঝে পাকা,		
(ছনের ঘর) প্রতি ঘনফুট ৩০/- টাকা হিসাবে	৩০ × ৩০০ = ৯০০০	টাকা
৩। খাবার পাত্র ৪টি, প্রতিটি ৭০ টাকা হিসাবে	৪ × ৭০ = ২৮০	টাকা
৪। পানির পাত্র ৪টি, প্রতিটি ৫০ টাকা হিসাবে	৪ × ৫০ = ২০০	টাকা
৫। ডিমের ট্রে ১০ টি প্রতিটি ২৫ টাকা হিসাবে	১০ × ২৫ = ২৫০	টাকা
৬। থার্মোমিটার ১ টা ১৫০ টাকা হিসাবে	১ × ১৫০ = ১৫০	টাকা
৭। লিটার ১৫ বস্তা, প্রতি বস্তা ২৫/- হিসাবে	১৫ × ২৫ = ৩৭৫	টাকা
৮। ১০০টি মুরগি প্রতিটি ১০০/- টাকা হিসাবে	১০০ × ১০০ = ১০০০০	টাকা
৯। মুরগির খাদ্য ২২০০ কেজি প্রতিটি ৭/- টাকা হিসাবে	২২০০ × ৭ = ১৫৪০০	টাকা
মোট ব্যয়	= ৩৫৬৫৫	টাকা
মোট আয়		
ক. ডিম বিক্রির টাকা, ৭০ টি মুরগি, প্রতিটি মুরগি ২৮০ টি করে		
ডিম দিলে, প্রতিটি ডিম ২.৫০ টাকা হিসাবে ৭০ × ২৮০ × ২.৫০	= ৪৯০০০	টাকা
খ. মুরগির বিষ্ঠা কমপোস্ট বিক্রি টাকা	= ৯০০	টাকা
গ. মুরগি বিক্রি (ডিম পাড়া শেষে) ৩০টি প্রতিটি		
১০০ টাকা হিসেবে ৩০ × ১০০	= ৩০০০	টাকা
মোট আয়	= ৫২৯০০	টাকা
এক বছর শেষে আয়-ব্যয়ের হিসাব-		
মোট আয়	= ৫২৯০০	টাকা
মোট ব্যয়	= ৩৫৬৫৫	টাকা
মোট আয়	= ১৭২৪৫	টাকা

১৪. ছাঁটাই : কম উৎপাদিত মুরগির খামার খাদ্যের ও ব্যবস্থাপনার অপচয় করে। তাই মুরগির বয়স ৭৬ সপ্তাহ হলেই তাদেরকে ছাঁটাই করতে হবে।

১৫. স্বাস্থ্য পরিচর্যা : অসুস্থ মুরগিকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে এবং মৃত মুরগিকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়ে ফেলতে হবে। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে মুরগিকে যথাসময়ে টিকা দিতে হবে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ হাঁস-মুরগির খামার পরিদর্শন

উপকরণ

খাতা, কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. শিক্ষক মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট খামারে যাও।

২. খামারটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।
৩. খামারে মুরগির জাত ও হাঁসের জাত, ডিম, উৎপাদন, খাদ্য, মুরগির সংখ্যা, ব্যবস্থাপনা আলোচনা কর।
৪. ব্যবহারিক খাতায় যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মুরগির বয়স কত সপ্তাহ হলে তাকে ছাঁটাই করতে হয়?

ক. ৭২ খ. ৭৪
গ. ৭৬ ঘ. ৭৮

২. মুরগির ঠোঁটকাটার কারণ হল-

i. ঠোঁট দিয়ে খাবার নষ্ট করতে পারবে না
ii. ঠোঁট দিয়ে একে অপরকে আঘাত করবে না
iii. ডিম ভাঙতে পারবে না।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. রায়হান সাহেব তাঁর খামারে ১০০টি মুরগি পালন করেন। মুরগির দৈনিক খাদ্য লাগে ১০ কেজি। প্রতি কেজি খাদ্যের মূল্য ১০ টাকা এবং শ্রমিক খরচ দৈনিক ৫০ টাকা। খামার থেকে দৈনিক আয় ২৫০ টাকা হলে তাঁর মাসিক সঞ্চয় কত?

ক. ১০০০ টাকা খ. ২০০০ টাকা
গ. ৩০০০ টাকা ঘ. ৪০০০ টাকা

সৃজনশীল প্রশ্ন

মনু মণ্ডল শিক্ষিত যুবক। সে নিজ বাড়িতে ডিম উৎপাদনের জন্য একটি ক্ষুদ্র মুরগি খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করে। মূলধন সংগ্রহে সে স্থানীয় এন জি ও থেকে ঋণ গ্রহণ করে। মনু মণ্ডল হিসেব করে দেখল তার নিজ বাড়িতে যে জায়গা আছে তা ৭৫ টি লেয়ার মুরগির খামারের জন্য উপযুক্ত। মেঝে পাকা ছনের ঘর তৈরির মাধ্যমে সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে এবং পরিশেষে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে।

ক. উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে খামারকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
খ. মনু মণ্ডল প্রথমেই বড় খামার না করে ক্ষুদ্র খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে কেন।
গ. মনু মণ্ডল যে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে তার জন্য একটি ব্যয় বাজেট তৈরি কর।
ঘ. উন্নত ব্যবস্থাপনাই মনু মণ্ডলের খামার স্থাপনে সাফল্য বয়ে এনেছে- বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাঁস-মুরগির খাদ্য

হাঁস-মুরগি থেকে অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদনের প্রধান শর্ত হল তাদেরকে সঠিকভাবে সুষম খাদ্য প্রদান। মুরগির এই সুষম খাদ্য তৈরি করার সময় নিম্নলিখিত পুষ্টি উপাদানগুলো পরিমাণমতো অবশ্যই থাকতে হবে।

১. আমিষ
২. শর্করা
৩. স্নেহ
৪. খনিজ পদার্থ
৫. ভিটামিন
৬. পানি।

খাদ্যের উৎস ও কার্যাবলি

শর্করা : শস্যকণা যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার, বাজরা, চিনাবাদাম, লালিগুড়, গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, মিষ্টি আলুর মধ্যে শর্করা বিদ্যমান।

কাজ : এই ধরনের খাদ্য মুরগির দেহের তাপ ও শক্তি যোগায়। মুরগির ডিমের কুসুম তৈরি ও চর্বি উৎপাদনে এই ধরনের খাদ্য কাজে লাগে।

আমিষ : গরু, ছাগলের সিদ্ধ নাড়িভুঁড়ি, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, সরিষা, তিল ও চিনাবাদামের খৈল, খেসারি, মাষকলাই ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ থাকে।

কাজ : এই জাতীয় খাদ্য মুরগির শরীরের ক্ষয়পূরণ, মাংস বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন, তাপশক্তি বৃদ্ধি ও চর্বি উৎপাদনে কাজে লাগে।

চর্বি : সরিষা, সয়াবিন, বাদাম তৈল যে কোনো প্রকারের ভেষজ তৈল এবং বীজে প্রচুর পরিমাণে চর্বি জাতীয় খাদ্য বিদ্যমান।

কাজ : চর্বি দেহে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রয়োজনে তাপ ও শক্তি যোগায়।

বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদানের উৎসের তালিকা

পুষ্টি উপাদান	খাদ্যের উৎস
আমিষ	শুঁটকির গুঁড়া, শামুক, ঝিনুকের ভেতরের অংশ, গরু-ছাগলের নাড়িভুঁড়ি সিদ্ধ, তিল ও চিনাবাদামের খৈল, সয়াবিন বীজ সিদ্ধ, শুকনো রক্ত।
শর্করা	গম, ভুট্টা, গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, যব ও সরগাম।
স্নেহ	তিলের তৈল, সয়াবিন তৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিন বীজ সিদ্ধ।
ভিটামিন	শাকসবজি, কড লিভার অয়েল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিন প্রিমিক্স।
খনিজ পদার্থ	লবণ, ঝিনুকের গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া, ডিমের খোসা, চুনাপাথর।

ভিটামিন : সবুজ ঘাস, হলদে শস্যকণা, মাংস, মাছের শুঁটকিতে ভিটামিন মজুদ থাকে। সূর্যের আলো ও কডলিভার অয়েলে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়।

কাজ : ভিটামিনের অভাবে আমিষ, শর্করা, তেল ও খনিজ পদার্থ শরীরের অভ্যন্তরে প্রক্রিয়াজাত না হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। ভিটামিন শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।

খনিজ পদার্থ : ঝিনুকের গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া, চুনাপাথর, ডিমের খোসা ইত্যাদিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে।

কাজ : এই জাতীয় খাদ্য মুরগির দেহের অস্থি বর্ধন ও ডিম প্রস্তুত করে।

পানি : মুরগিকে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হয়। কচি ঘাস ও খাদ্যদ্রব্যেও পানি থাকে।

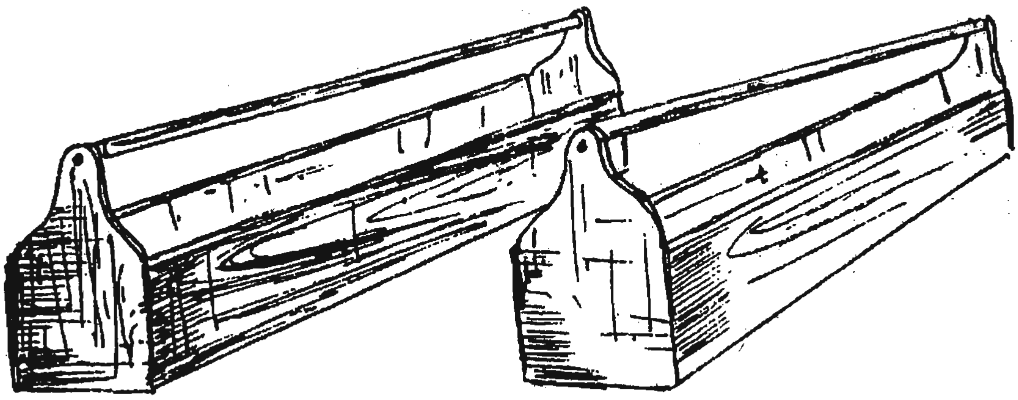
কাজ : পানি হাঁস-মুরগির দেহের দূষিত পদার্থ বের করে ও শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকোষ সজীব রাখে।

হাঁস-মুরগির খাদ্যের বিবেচ্য বিষয়

হাঁস-মুরগির খাদ্যে মূলধনের ৭০%-৭৫% ব্যয় হয়ে যায়। হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য সরবরাহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

যেমন-

১. খাদ্য ব্যয় সাপেক্ষ হবে না;
২. খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পরিমাণ মতো থাকতে হবে;
৩. বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উপাদানের মিশ্রণ সুষম হতে হবে;
৪. মুরগির জন্য সহজপাচ্য হতে হবে;
৫. খাদ্য যেন কোনো প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত না হয়;
৬. ভেজাল খাদ্য পরিহার করতে হবে;
৭. বর্ষাকালে কোনো অবস্থাতে ৫ দিনের বেশি মিশ্রিত খাদ্য মজুদ করা যাবে না। তাতে মিশ্রিত খাদ্যে ছত্রাক জন্মাবে।
৮. খাদ্য মজুদ করে রাখলে প্রতি সপ্তাহে অন্তত ১ দিন ভালোভাবে রোদে শুকাতে হবে।



খাদ্যপাত্র

খাদ্য তৈরির নিয়মাবলি

বিভিন্ন কাজের জন্য যেমন মাংস উৎপাদনের জন্য বা ডিম উৎপাদনের জন্য মুরগির খাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের হয়। আবার বিভিন্ন বয়সের জন্যও খাদ্যের পরিমাণ ও উপাদানের তারতম্য আছে। কাজেই তালিকা অনুযায়ী মুরগির খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।

খাদ্য তৈরি করার প্রক্রিয়া

সর্বপ্রথম ভুট্টা বা গম আটা মিলে ভেঙে নিতে হবে। তিল ও আস্ত খৈল ভালো করে মিশিয়ে ভেঙে নিতে হবে। পরিষ্কার জায়গাতে গম ভাঙা, ভুট্টা ভাঙা ঢালতে হবে, এর ওপরে কুঁড়া ঢালতে হবে, কুঁড়ার ওপর মাছের গুঁড়া, তার ওপর তিল, খৈল এবং শেষে সয়াবিন ঢালতে হবে। এইভাবে সবগুলো ঢালার পর সমস্ত খাদ্য উকরণগুলো একটি পিরামিডের মতো দেখা যাবে। এবার ঝিনুকের গুঁড়া ও লবণ ঐ পিরামিডের ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে। তিন হতে চার মুষ্টি খাদ্য আলাদা করে নিয়ে ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স উত্তমরূপে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর এই মিশ্রিত অংশ পিরামিডের ওপর সমস্ত খাদ্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। সয়াবিন তৈলও পিরামিডের চারদিকে ঢেলে দিতে হবে। এবার হাত দিয়ে সবগুলো খাদ্য উপাদান উল্টা পাল্টা করে মিশ্রণ করতে হবে। উত্তমরূপে মিশ্রণের ফলে খাদ্য বাদামি রঙের দেখা যাবে। পোলট্রি খাদ্যে ব্যবহৃত শামুক বা ঝিনুকের মাংস ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন হোটেল থেকে মুরগির নাড়িভুঁড়ি যোগাড় করে গরম পানিতে ধুয়ে সিদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করে পোলট্রি রেশনে মিশিয়ে দিতে হবে। তাতে শুঁটকি মাছের গুঁড়া না মিশালেও চলবে। গরু ছাগলের নাড়িভুঁড়ি একই প্রক্রিয়ায় শুঁটকি মাছের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়।

সয়াবিন সিদ্ধ শুঁটকি মাছের বিকল্প খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের খাদ্যে প্রচুর আমিষও রয়েছে। হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য তৈরির সময় আমিষের পরিমাণ বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়

ক. হাঁস-মুরগির খাদ্য গ্রহণের দৈনিক পরিমাণ

ক. হাঁস-মুরগির খাদ্য গ্রহণের দৈনিক পরিমাণ

বয়স	মুরগি	হাঁস
প্রথম সপ্তাহ	১০ গ্রাম	১৫ গ্রাম
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২০ গ্রাম	২৫ গ্রাম
তৃতীয় সপ্তাহ	৩০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম
চতুর্থ সপ্তাহ	৪০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম
বাড়ন্ত	৭৫ গ্রাম	৯০ গ্রাম
পূর্ণবয়স্ক	১১৫ গ্রাম	১২৫ গ্রাম

গ. ৯ থেকে ২০ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার খাদ্য তৈরীর নমুনা

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
গম ভাঙা	৪.৬ কেজি
চালের কুঁড়া	২.৬ কেজি
খৈল	১.৮ কেজি
শুঁটকি গুঁড়া	.৮ কেজি
ঝিনুক চূর্ণ	১৩০ গ্রাম
লবণ	৫০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	২০ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

খ. আট সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের বাচ্চার খাদ্য তৈরীর নমুনা

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
গম ভাঙা	৪.৫ কেজি
চালের কুঁড়া	২.৫ কেজি
খৈল	১.২ কেজি
শুঁটকি গুঁড়া	১.০ কেজি
সয়াবিন মিল	০.৬ কেজি
ঝিনুক চূর্ণ	১৩০ গ্রাম
লবণ	৫০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	২০ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

ঘ. পূর্ণ বয়স্ক হাঁস-মুরগির খাদ্য তৈরীর নমুনা

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
গম ভাঙা	৪.৫ কেজি
চালের কুঁড়া	৩.৫ কেজি
খৈল	৯০০ গ্রাম
শুঁটকি গুঁড়া	৮০০ গ্রাম
ঝিনুক চূর্ণ	২৫৫ গ্রাম
লবণ	৫০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	২৫ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

ঙ. ব্রয়লারের খাদ্য তৈরীর নমুনা

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
গম ভাঙা	৪.৫ কেজি
চালের কুঁড়া	২.১ কেজি
খৈল	১.৬ কেজি
শুঁটকি গুঁড়া	১.০ কেজি
সয়াবিন মিল	০.৬ কেজি
ঝিনুক চূর্ণ	১২৫ গ্রাম
লবণ	৫০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	২৫ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হাঁস মুরগির খাদ্যে মূলধনের কত % ব্যয় হয়?

ক. ৫৫- ৬০% খ. ৬৫- ৭০%

গ. ৭০- ৭৫% ঘ. ৮০- ৮৫%

নিচের ছকটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ব্রয়লারের খাদ্য তৈরির তালিকা নিম্নরূপ-

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
গম ভাঙা	৪.৫ কেজি
চালের গুঁড়া	২.১ কেজি
খৈল	১.৬ কেজি
শুঁটকি গুঁড়া	১.০ কেজি
সয়াবিন মিল	০.৬ কেজি
ঝিনুকের গুঁড়া	১২৫ গ্রাম
লবণ	৫০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	২৫ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

২. প্রতি কেজি খৈলের দাম ২০ টাকা হলে ব্রয়লারের জন্য ২৫ কেজি খাদ্য তৈরি করতে কত টাকার খৈল লাগবে?

ক. ৭০ টাকা খ. ৮০ টাকা

গ. ৯০ টাকা ঘ. ১০০ টাকা

৩. খাদ্য তৈরিতে শুঁটকির পরিবর্তে কী ব্যবহার করা যায়?

ক. প্রিমিক্স মিশ্রণ খ. হাড়ের গুঁড়া

গ. পোলট্রি রেশন ঘ. নাড়িভুঁড়ির টুকরা

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণবয়স্ক হাঁস-মুরগির খাদ্য তৈরীর নমুনা নিম্নরূপ :

খাদ্য উপকরণ	**পরিমাণ**
গম ভাঙা	৪.৫ কেজি
চালের কুঁড়া	৩.৫ কেজি
খৈল	৯০০ গ্রাম
শুঁটকি গুঁড়া	৮০০ গ্রাম
ঝিনুকের চূর্ণ	২৫৫ গ্রাম
লবণ	৫০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	২৫ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

ক. হাঁস মুরগি থেকে অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদনের প্রধান শর্ত কী?

খ. উল্লিখিত চার্টে আমিষের প্রধান উৎসগুলো বর্ণনা কর?

গ. উল্লিখিত চার্ট থেকে হাঁস-মুরগির ৩০ কেজি খাদ্যের তালিকা তৈরি কর।

ঘ. হাঁস মুরগির খাদ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে খাদ্য উপাদানের আনুপাতিক হার নির্ধারণ অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হাঁস-মুরগির রোগ ও প্রতিকার

বাংলাদেশে প্রতিবছর সঠিক চিকিৎসার অভাবে বহু হাঁস-মুরগি মারা যায়। ফলে মাংস ও ডিমের চাহিদা পূরণে এমনকি দেশের অর্থনীতিতে অনেক ক্ষতি হয়।

হাঁস-মুরগির রোগকে সাধারণত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ভাইরাসজনিত রোগ
২. ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ
৩. ছত্রাকজনিত রোগ
৪. পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ
৫. অপুষ্টিজনিত রোগ

হাঁস-মুরগির রোগের বেলায় রোগাক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফল খুব কম পাওয়া যায়। হাঁস-মুরগির বেলায় চিকিৎসার চেয়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই উত্তম। হাঁস-মুরগির কয়েকটি প্রধান রোগের লক্ষণ এখানে বর্ণনা করা হল।

১। রাণীক্ষেত রোগ

এটা ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এই রোগকে গ্রামাঞ্চলে চুনাহাগা রোগও বলা হয়ে থাকে। এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে শীত ও বসন্তকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি ঘটে।

রোগের লক্ষণ

১. এই রোগের জীবাণু দেহে ঢুকবার এক সপ্তাহের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।
২. আক্রান্ত মুরগি দল ছেড়ে ঘরের এক কোণে নির্জীব হয়ে বসে থাকে। ডিম পাড়া মুরগি ডিম দেওয়া বন্ধ করে দেয়।
৩. খাওয়া বন্ধ করে দেয়। মাথা নিচু ও চোখ বন্ধ করে ঝিমাতে থাকে।
৫. আক্রান্ত মুরগি সাদা চুনের মতো পাতলা মল ত্যাগ করে।
৫. আক্রান্ত মুরগির নাক দিয়ে সর্দি ও মুখ দিয়ে লালা ঝরে।
৬. শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়। অনেক ক্ষেত্রে শ্বাস নেওয়ার সময় কক্ কক্ শব্দ করে।
৭. পাখা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। মুরগির ঘাড় বেঁকে যায়। কখনও কখনও একই স্থানে দাঁড়িয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।
৮. মুরগি দুর্বল হয়ে ঠোঁট ও বুক মাটিতে লাগিয়ে বসে পড়ে। পেছনের পালকে পাতলা মল লেগে থাকে।
৯. রোগ দেখা দেওয়ার ২-১ দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

রোগ প্রতিরোধ

প্রতিষেধক টিকা এই রোগের হাত থেকে মুরগিকে বাঁচাবার প্রধান উপায়। বাংলাদেশের সর্বত্র পশু সম্পদ অফিসের মাধমে এই টিকা বিতরণ করা হয়ে থাকে। এই টিকা দুই রকমের হয়ে থাকে। যথা-

১. ছোট বাচ্চার জন্য বিসিআরডিভি :

একদিনের বাচ্চাকে টিকা দিতে হয়।

ব্যবহার পদ্ধতি : ভায়েলের টিকা বীজ ৬ মিলি পরিমাণ পাতিত পানিতে গুলে ড্রপার দিয়ে এক চোখে এক ফোঁটা দিতে হয়।

২. **বড় মুরগির জন্য আরডিভি :** দুই মাস বয়সের বেশি মুরগিকে এই টিকা দিতে হয়।
ব্যবহার পদ্ধতি : ভায়েলের টিকা বীজ ১০০ মিলি পরিমাণ পাতিত পানিতে মিশিয়ে প্রতি মুরগির রানের মাংসে ১ মিলি ইনজেকশন দিতে হয়।

প্রতিকার

১. এই রোগের সঠিক কোনো চিকিৎসা নেই।
২. আক্রান্ত মুরগি আলাদা রাখা উচিত এবং অন্য কোথাও বিক্রি করা উচিত নয়।
৩. মৃত মুরগি যেখানে সেখানে না ফেলে মাটিতে পুঁতে ফেলা প্রয়োজন।
৪. আক্রান্ত ও সুস্থ উভয় মুরগিকে পটাশ মেশানো পানি খাওয়ানো যেতে পারে।
৫. সালফাডায়াজিন ট্যাবলেট চার ভাগ করে বড় মুরগিকে দিনে দুই বার খাওয়ানো যায়।

২. মুরগির বসন্ত

ফাউল পক্স ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। সব বয়সেই মুরগির এই রোগ হতে পারে। তবে বাচ্চা মুরগির জন্য এই রোগ মারাত্মক। আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়ে মুরগির বসন্ত রোগ সাধারণত বেশি দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ

১. মুরগির পালকবিহীন স্থানে যেমন কানের লতি, মাথায় ঝুঁটি, চোখের আশপাশে ইত্যাদি জায়গায় ছোট বড় ফোসকা দেখা দেয়, পরে ক্ষত সৃষ্টি হয়। আরো পরে এর উপরে কালো আবরণ সৃষ্টি হয়। এই আবরণের নিচে ঘা থাকে।
২. চোখের পাতার উপরে ঘা দেখা যায় এবং পাতা ফুলে ওঠে। ফলে চোখ আংশিক বা পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।
৩. মুখের ভেতর ঘা দেখা যায়। মুরগি খেতে পারে না।
৪. উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় ও ডিম দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।
৫. বয়স্ক মুরগি অনেক সময় বাঁচে কিন্তু বাচ্চা মারা যায়।


মুরগির বসন্ত

রোগ প্রতিরোধ

সময়মতো প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

টিকা ব্যবহার পদ্ধতি

ভায়েলের টিকাবীজ প্রথমে পাতিত পানিতে মিশিয়ে টিকা তৈরি করতে হবে। একটি দুই মুখওয়ালা সুই বারে বারে তৈরী টিকায় ডুবিয়ে তিন বার পাখার ভেতর দিকে পালকবিহীন জায়গায় ছিদ্র করে এ টিকা দিতে হয়। সাধারণত বছরে ১ বার টিকা দিলেই চলে।

প্রতিকার

১। পটাশের পানি দিয়ে ঘা পরিষ্কার করা আবশ্যক।
২। সালফোনিলামাইড পাউডার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
৩। আক্রান্ত মুরগি আলাদা করতে হবে।
৪। মুরগির ঘর আয়োসন দ্রবণ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৩. হাঁস-মুরগির কলেরা

এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়। সকল বয়সের হাঁস-মুরগি বছরের যে কোনো সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগ সাধারণত বাচ্চার বয়স ৪ মাসের ওপর হলে বেশি দেখা দেয়। অনেক সময় রোগের কোনো লক্ষণ না দেখা দিয়েই মুরগির ঝাঁকে কিছুসংখ্যক মৃত মুরগি পড়ে থাকতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় রোগের লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ

১. সবুজ বা হলুদ রঙের পাতলা পায়খানা হয়।
২. পালক খসখসে হয়ে যায়। মাথা এদিক ওদিক ঘুরাতে থাকে।
৩. খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়।
৪. মাথার ঝুঁটি, হাঁটু ও মুখের অন্যান্য অংশ ফুলে যায়।
৫. নাক, মুখ দিয়ে লালা ঝরে এবং পিপাসা বেড়ে যায়।

রোগ প্রতিরোধ

সুস্থ মুরগিকে প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

টিকা ব্যবহার পদ্ধতি

১০০ সিসি বোতলে এই টিকা পাওয়া যায়। প্রতিটি হাঁস-মুরগিকে ১ সিসি করে এই টিকা ইনজেকশন হিসেবে রানের মাংসে দিতে হয়। মুরগিকে জন্মের আড়াই মাস বয়সে এই টিকা একবার দিলে ৪-৫ মাস আর রোগের ভয় থাকে না। হাঁসের বেলায় দেড় মাস বয়সে প্রথমবার এই টিকা দিতে হয়।

রোগের চিকিৎসা

১. আক্রান্ত মুরগির ঘর পরিষ্কার রাখা উচিত।
২. এক থেকে দেড় গ্রাম কসুমিকস পাউডার ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে পর পর তিন বার খাওয়াতে হয়।
৩. সালফাডায়াজিন বা সালফামিজাথিন বা রেনামাইসিন বড়ি খাওয়াতে হবে।

৪. রক্ত আমাশয় (ককসিডিওসিস)

এই রোগ ককসিডিয়া নামক এক প্রকার পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে ঘটে। এই রোগ সাধারণত ২ মাস কম বয়সের বাচ্চায় বেশি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ৭০%-৮০% মুরগির বাচ্চা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

রোগের লক্ষণ

১. খাদ্য ও পানি খাওয়া বন্ধ করে দেয়। মুরগি ঝিমাতে থাকে।
২. পালক উস্‌কো খুস্‌কো হয়ে যায় এবং চোখ বন্ধ করে রাখে।
৩. রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা করে।
৪. মৃত্যুর পূর্বে বাচ্চা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ৪-৫ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।
৫. ডিম পাড়া মুরগির ডিমের খোসা পাতলা হয়ে যায় এবং ডিম পাড়া কমে যায়।

রোগ প্রতিরোধ

১. মুরগির ঘর আলো, বাতাস ও তাপপূর্ণ রাখতে হবে এবং ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি সর্বদা পরিষ্কার করতে হবে।
২. লিটার সর্বদা শুকনো ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে তুষ বা কাঠের গুঁড়া ব্যবহার করা যায়।

প্রতিকার

নিয়মিত খাবার এবং পানির সাথে (ক) সালফামিজাথিন ১৬% (খ) ইএসবি ৩% ও (গ) এমবাজিন জাতীয় ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়াতে হবে।

৫. গামবোরো রোগ

ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। এই ধরনের রোগ সাধারণত ৩-১২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চাদেরই বেশি হয়ে থাকে। এই রোগ হলে মুরগিতে সব ধরনের টিকার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় এবং মুরগি অতি সহজেই অন্যান্য রোগের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ

১. দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়। পালক উস্‌কো খুস্‌কো হয়ে যায়।
২. খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পানির পিপাসা বেড়ে যায়।
৩. কাঁপুনি, অতি ক্লান্তিতে মাটিতে শুয়ে পড়ার পর অবশেষে ডিহাইড্রেশনের কারণে মারা যায়।
৪. রোগে আক্রান্ত হওয়ার ৩ দিনের মধ্যেই ৩০%-৪০% বাচ্চা মারা যায়।

রোগ প্রতিরোধ

নিম্নরূপভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা-

১. স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে।
২. নিয়মিত গামবোরো রোগের টিকা প্রদান করে।
৩. টিকা প্রদান সম্ভব না হলে বাচ্চার বয়স যখন ১৪ দিন হবে ঐ দিন থেকে ২ দিন অন্তর ৩ মাস পর্যন্ত সর্বদা স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

প্রতিকার

১. দুপুর বেলায় প্রতি লিটার পানির সাথে ১০০ গ্রাম গুড় ও ১৫ মিলি ভিনেগার মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
২. সন্ধ্যায় বা রাতে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ প্যাকেট ওরস্যালাইন + ভিটামিন বি-১২ ট্যাবলেট ৪টি মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

৬. হাঁসের প্লেগ রোগ

প্লেগ রোগটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হয়। এটি একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এই রোগে মৃত্যুর হার খুব বেশি। যে কোনো বয়সের হাঁস এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণসমূহ

১. খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়, পিপাসায় কাতর হয়ে বারবার পানি খেতে দেখা যায়।
২. খুব পাতলা পায়খানা করে এবং লেজের আশপাশে মল লেগে থাকে।
৩. আলো দেখলে ভয় পায়। নাক মুখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হয়।
৪. পা এবং পাখা অবশ হয়ে যায়। মাথা, ঘাড় ও শরীরে কাঁপুনি দেখা যায়।
৫. আক্রান্ত হাঁস বুকের উপর ভর দিয়ে বসে পড়ে এবং ডিম পাড়া হাঁসীর ডিম দেওয়া হঠাৎ কমে যায়।

রোগ প্রতিরোধ

ডাক প্লেগ নামক টিকা দিয়ে এই রোগের হাত থেকে হাঁসকে বাঁচাতে হয়। প্রতিটি হাঁসের রানের মাংসে ১ মিলি করে ইনজেকশন হিসেবে এই টিকা দেওয়া হয়।

প্রতিকার

আক্রান্ত হাঁসের কোনো চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত হাঁসকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে। মৃত হাঁসের সঠিকভাবে সৎকার করতে হবে।

৭. পরজীবী রোগ

পরজীবী রোগ দুই প্রকার। যথা-

১. অন্তঃ পরজীবী : যেমন গোল কৃমি, ফিতা কৃমি।
২. বহিঃ পরজীবী : যেমন উকুন ও মাইটস। হাঁস-মুরগি এ সকল পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়।

অন্তঃ পরজীবী

সাধারণত খাদ্যের সাথে এবং স্যাঁতসেঁতে অপরিচ্ছন্ন মেঝে থেকে কৃমির ডিম মুরগির শরীরে ঢুকে পড়ে।
হাঁস-মুরগিকে বিভিন্ন ধরনের কৃমির রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এসব কৃমির মধ্যে গোলকৃমি, ফিতাকৃমি, সুতাকৃমি উল্লেখযোগ্য।
হাঁস-মুরগি কৃমিরোগে আক্রান্ত হলে তাদের দেহে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়-

১. মাথার ঝুঁটি সাদা বা ফ্যাকাসে হয়ে যায়।
২. চোখে মুখে রক্তশূন্যতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বুকের হাড় বেরিয়ে পড়ে।
৩. হাঁস-মুরগি শুকিয়ে যেতে থাকে। পালক উস্‌কো খুস্‌কো হয়ে দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৪. রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়। কখনও পায়খানার সাথে কৃমি বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।
৫. দেহের ওজন কমে যায় এবং ডিম পাড়া বন্ধ হয়ে যায়।
৬. কৃমির পরিমাণ বেশি হলে অন্ত্রনালির ছিদ্র বন্ধ হয়ে হাঁস-মুরগি মারা যায়।

কৃমি রোগ প্রতিরোধ

১. অন্ততপক্ষে প্রতি ৩ মাস পর পর কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে।
২. ঘর সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

প্রতিকার

মুরগির খাবারের সাথে পাইপাইয়াজিন জাতীয় ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়াতে হবে।

ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ

সুষম খাদ্যে ভিটামিনের অভাব হলে হাঁস-মুরগির শরীরে বিভিন্ন রকম উপসর্গ দেখা দেয়। এতে হাঁস-মুরগির উৎপাদন ব্যাহত হয়।

ভিটামিন এ

ভিটামিন এ-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়।

অভাবজনিত লক্ষণ

১. চোখের পাতা ফুলে যায় এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ে।
২. নাক ও মুখ দিয়ে গন্ধহীন পুঁজের মতো পদার্থ বের হয়।
৩. পালক উস্‌কো-খুস্‌কো হয়ে যায়।
৪. দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

প্রতিরোধ

সুষম খাদ্যের সাথে প্রতিদিন সবুজ শাকসবজি যেমন কফিপাতা, কলমিশাক, পালংশাক ছাড়াও কাঁচা ঘাস ও কডলিভার অয়েল খাওয়ানো যেতে পারে।

ভিটামিন ডি

অভাবজনিত লক্ষণ

১. ভিটামিন ডি-এর অভাবে রিকেট রোগ হয়।
২. ডিমের খোসা নরম ও পাতলা হয়ে যায়।

প্রতিরোধ

হাঁস-মুরগির ঘরে পর্যাপ্ত সূর্যালোকের ব্যবস্থা করতে হবে। সবুজ শাকসবজি ও কডলিভার অয়েল খাওয়াতে হবে।

ভিটামিন বি -১ বা থায়ামিন

অভাবজনিত লক্ষণ

১. তন্দ্রাভাব ও খাবারে অরুচি হয়

২. ঘাড় বেঁকে যায়, খিচুনি হয় এবং অবশ হয়ে শুকিয়ে মারা যায়।

প্রতিরোধ

গমের ভুসি, কলিজা, চিনাবাদাম ও কুঁড়া খাওয়ালে এর অভাব হয় না।

ভিটামিন বি-২ বা রাইবোফ্লোবিন

১. বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ডিম দেওয়া কমে যায়।
২. পায়ের আঙুল কুঁকড়ে যায়।

প্রতিরোধ

ঘাস ও শুঁটকি গুঁড়া খাবারের সাথে খাওয়াতে হবে।

টিকা সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিধি

টিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করলে টিকার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। টিকা সংরক্ষণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হাঁস-মুরগির টিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি

টিকার নাম	সংরক্ষণ ব্যবস্থা	সংরক্ষণ মেয়াদ
মুরগির রাণীক্ষেত, বসন্ত ও হাঁসের প্লেগ টিকা	১। ডিপফ্রিজ	৬ মাস
	২। রেফ্রিজারেটর	১ মাস
	৩। বরফসহ থার্মোফ্লাস্ক (বরফ গলে গেলে পুনরায় বরফ ভর্তি করতে হবে)	১ সপ্তাহ
	৪। পানিতে মেশানো অবস্থায় টিকা ব্যবহার করতে হয়।	২ ঘণ্টা
হাঁস-মুরগির কলেরা	১। রেফ্রিজারেটরে অথবা থার্মোফ্লাস্কে বরফ দিয়ে (৪° সে. তাপমাত্রায় দিয়ে টিকা বীজ সংরক্ষণ করতে হয়।)	১ মাস
	২। ঘরের মধ্যে শুষ্ক, ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা যায়।	২ দিন

টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দেশনা জেনে নিতে হয় এবং সেভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। কোনো কোনো টিকা হিমায়িত অবস্থায় আবার কোনো কোনো টিকা শুকনো স্থানে রাখতে হয়। ফ্লাস্কে বরফ দিয়ে টিকা বীজ পরিবহণ করতে হয়।

টিকার কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণ

১. টিকার সঠিক ব্যবহার না জানলে।
২. নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে টিকা প্রদান না করলে।
৩. মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা প্রদান করা হলে।
৪. যথাস্থানে ও যথানিয়মে টিকা না দিলে।
৫. একই সময়ে ২টি ভিন্ন ভিন্ন টিকা দিলে।
৬. সঠিক রোগের টিকা না দিলে।
৭. টিকা প্রদানের পূর্বে ঐ রোগে পাখি আক্রান্ত হলে।

টিকা প্রদানে করণীয়

১. টিকা অবশ্যই খ্যাতিসম্পন্ন প্রস্তুতকারক কোম্পানি অথবা তার মনোনীত এজেন্ট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
২. হাত ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
৩. সিরিঞ্জ, নিডল ও সুই ফুটানো পানিতে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
৪. টিকা পাতিত পানিতে মেশাতে হবে অথবা পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নিয়ে মেশানো যায়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ মুরগির রাণীক্ষেত রোগের টিকাদান

উপকরণ

১. টিকা বীজ ভায়েল
২. সিরিঞ্জ, সুই
৩. পাতিত পানি ২৫০ সিসি
৪. গেলিপট (টিকা মেশানোর পাত্র)
৫. তুলা ও স্পিরিট।

কাজের ধাপ

১. ভায়েল থেকে বের করে একটি গেলিপটে টিকা বীজ নাও।
২. প্রথমে ২ মিলি পানি গেলিপটে মেশাও।
৩. আর ৯৮ মিলি পানি মেশাও।
৪. সিরিঞ্জের মধ্যে উক্ত মিশ্রিত টিকা বীজ নাও।
৫. এখন এক সিসি পরিমাণ টিকা বীজ প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশন দাও।
৬. প্রতিটি মুরগিকে ইনজেকশনের পর স্পিরিট মিশ্রিত তুলা দিয়ে সুই ভালো করে মুছে নাও।

সাবধানতা

১. ঠান্ডা বা শীতল স্থানে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে ও টিকা দিতে হবে।
২. মিশ্রিত টিকা ১-২ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।
৩. লক্ষ রাখতে হবে টিকা দেওয়ার সময় মুরগির হাড়ে যেন সুই না লাগে।
৪. সকালে বা বিকালে দিনের ঠান্ডা সময়ে টিকা দিতে হবে।
৫. টিকা প্রস্তুত করার পর নির্দেশিত সময়ের মধ্যে টিকা প্রদান করতে হবে। সাধারণত ১ ঘণ্টার মধ্যে টিকা প্রদান করা নিরাপদ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হাঁসের মারাত্মক রোগ কোনটি?

ক. বসন্ত	খ. রাণীক্ষেত
গ. রাতকানা	ঘ. ডাক প্লেগ

২. সম্প্রতি একটি রোগ উপমহাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। রোগটির নাম কি?

ক. পি পি আর	খ. বসনত
গ. গামবোরো	ঘ. বার্ড ফ্লু

৩. মুরগির কোন রোগের টিকা দিতে দুই মুখওয়ালা সুই ব্যবহার করা হয়?

ক. কলেরা	খ. আমাশয়
গ. বসনত	ঘ. রাণীক্ষেত

৪. হাঁস মুরগি ক্রিমি রোগে আক্রান্ত হলে লক্ষণসমূহ-

i. মাথার ঝুঁটি সাদা/ ফ্যাকাশে হয়ে যায়
ii. সাদা চুনের মতো পাতলা মল ত্যাগ করে
iii. চোখে মুখে রক্ত শূন্যতার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

রহিমার মুরগি খামারে মুরগিগুলো চুনের মতো পায়খানা শুরু করে। রোগের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেলে সে তাড়াতাড়ি পশু সম্পদ অফিসে যায়। পশু সম্পদ কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে খামার পরিদর্শন করেন এবং কোনো প্রকার ওষুধ না দিলেও জরুরি কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। পরবর্তীতে রহিমার খামারে আর কোনো রোগে দেখা দেয়নি।

ক. হাঁস মুরগির রোগকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
খ. পশু সম্পদ কর্মকর্তা কোনো ওষুধ প্রদান করলেন না কেন? ব্যাখ্য কর।
গ. পরবর্তী সময়ে রোগ প্রতিরোধে রহিমা কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রহিমার খামারের মুরগিগুলো যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল তার ভয়াবহতা বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

গৃহপালিত পশু পালন

প্রথম পরিচ্ছেদ

গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন

বাংলাদেশে গবাদি পশু হাল চাষ ও গাড়ি টানার জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় জাতের গরুর কোনো উৎপাদনশীল স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নেই। তাই মাংস ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা এদের অনেক কম। একমাত্র জাত উন্নয়নের মাধ্যমেই এর মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। কম উৎপাদনশীল গবাদি পশুর সাথে অধিক উৎপাদনশীল গবাদি পশুর সংকরায়নের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন করা হয়। এক্ষেত্রেও মাংসের জন্য উন্নত জাতের পুরুষ গরুর সাথে স্ত্রী গরুর প্রজনন করা হয়। ফলে যে বাচ্চা জন্ম নেয় তার উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়।

গবাদি পশুর পরিচিতি

বাংলাদেশে যেসব গরু-মহিষ দেখা যায় তাদেরকে কোনো বিশেষ জাত বা উন্নতজাতের পশু বলা যাবে না। প্রাচীনকাল থেকেই গরু এদেশের কৃষকের ঘরে ঘরে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। যদিও উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম তবে এরা এদেশের জলবায়ু ও আবহাওয়ার সাথে খাপ খেয়ে ভালোভাবে টিকে আছে। সুষম খাদ্য ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে এরা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, আকারে ছোট হচ্ছে এবং উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গাভীর ওজন ১৫০-২০০ কেজি, দুধ উৎপাদন দৈনিক ১-২ লিটার। পূর্ণ বয়স্ক ষাঁড়ের ওজন ২০০-২২৫ কেজি। সদ্যপ্রসূত বাছুরের ওজন ৮-১০ কেজি।

গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশুসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি উন্নয়ন পশুসম্পদের উন্নয়নের ওপরও নির্ভরশীল। অথচ এই সম্পদ উন্নয়নে আমরা অন্যান্য দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। গবাদি পশু হতে বর্তমানে উৎপাদিত দুধ ও মাংস দেশের জনগোষ্ঠীর চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এই ঘাটতি আমদানির মাধ্যমে পূরণ সম্ভব নয়। বেকার সমস্যার সমাধানে আমাদেরকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, আর নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে তা করতে হবে।

১. দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা : দেশি গাভী দৈনিক ১-২ লিটার দুধ দেয়। তাকে উন্নত পরিবেশ এবং সুষম খাদ্য দিলেও এই উৎপাদন ৩ লিটারের বেশি আশা করা যায় না। কারণ এর বংশ গুণাবলি খুব নিম্নমানের। তবে দেশি গাভী উন্নত জাতের ষাঁড়ের সঙ্গে সংকরায়নের মাধ্যমে যে বাচ্চা হবে সেটি দৈনিক ১০-১৫ লিটার দুধ দেবে। এতে অতি অল্প সময়ে জনগোষ্ঠীর দুধের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

২. মাংসের উৎপাদন বাড়ানো : বাংলাদেশের গবাদি পশু আকারে ছোট। মাংস উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরুর ওজন গড়ে ১৫০-২০০ কেজি মাত্র। তবে এই গাভী উন্নত জাতের ষাঁড়ের সঙ্গে সংকরায়নের মাধ্যমে যে বাচ্চা হবে সেটি প্রাপ্ত বয়স্ক হলে ওজন হবে ৩০০-৪০০ কেজি। ফলে গরুর আকার বড় হবে, মাংস বেশি হবে, চামড়াও বড় হবে। এতে অতি সহজেই অল্প সময়ে জনগোষ্ঠীর মাংসের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

৩. গবাদি পশুর কর্মক্ষমতা বাড়ানো : আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্তমানে গবাদি পশুই কৃষির প্রধান চালিকা শক্তি। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে অবশ্যই জমি ভালোভাবে চাষাবাদ করতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। গবাদি পশুর গোবর জৈব সারের প্রধান উৎস। অতএব ফসলাদির উৎপাদন মূলত পশুসম্পদের উপরই নির্ভরশীল। এক জোড়া দেশি বলদ ৩-৪ একর জমি চাষ করতে পারে। সংকরায়িত এক জোড়া বলদ গরু দ্বারা বছরে ৭-৮ একর জমি চাষ করা সম্ভব।

৪. অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে : দেশি গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের ফলে দুধ, মাংস ও শক্তি উৎপাদন বাড়বে। এতে গ্রামীণ বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। তারা গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালনে আগ্রহী হবে। ফলে দুধ, হাল ও গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ আয় করতে পারবে। তাদের কর্মসংস্থান হলে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচন হবে।

৫. বড় আকারের খামার স্থাপন : সমাজে বিত্তশালী লোকেরা উন্নত জাতের গবাদি পশুর খামার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবে। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুধ ও মাংস উৎপাদন খামার গড়ে উঠবে। এতে একদিকে যেমন বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে অন্যদিকে খামারে উৎপাদিত দুধ ও মাংস দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যমে দেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে।

জাত উন্নয়ন পদ্ধতি

ব্যাপক হারে, অল্প সময়ে ও অল্প খরচে দেশি গবাদি পশুর উৎপাদন বাড়াতে হলে সংকরায়নের মাধ্যমে তা সম্ভব। পৃথিবীর সকল উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ প্রাথমিক পর্যায়ে সংকরায়নের মাধ্যমে তাদের দেশিয় গবাদি পশুর উন্নতি সাধন করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিই প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং দেশি বকনা বা গাভীকে উন্নত দুধের জাত, যেমন হলস্টেইন, ফ্রিজিয়ানা, জারসি, শাহিওয়াল ও সিন্ধি জাতের ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করাতে হবে। ফলে যে বকনা বাচ্চার জন্ম হবে তা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে অবশ্যই দেশি গাভী থেকে অনেক বেশি দুধ দেবে। এভাবে মাংসের জন্য এবং শক্তির জন্য নির্দিষ্ট উন্নত জাতের ষাঁড় দ্বারা ধারাবাহিকভাবে প্রজনন করালে উন্নত জাত বা ব্রিড তৈরি করা যায়, এটাই সংকরায়ন পদ্ধতি। সংকরায়ন দুই পদ্ধতিতে হতে পারে। যেমন

১. প্রাকৃতিক প্রজনন পদ্ধতি
২. কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি।

১. প্রাকৃতিক প্রজনন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে দেশি অনুন্নত ষাঁড় দিয়ে গ্রামাঞ্চলে সরাসরি গাভীকে প্রজনন করানো হয়। ফলে উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদিত হয় না এবং উৎপাদনও বাড়ে না। অপরদিকে উন্নত জাতের ষাঁড় দিয়ে দেশি গাভীকে প্রজনন করা যায়। কিন্তু বিদেশ থেকে এত বেশি সংখ্যক ষাঁড় আমদানি করা ব্যয়বহুল। বর্তমানে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে কিছু উন্নতমানের ষাঁড় প্রজননের জন্য সরকারিভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি

বর্তমানে দেশে গবাদি পশুর দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে এই প্রজনন পদ্ধতি চালু আছে। এতে অতি অল্প সময়ে কম খরচে এবং ব্যাপক হারে গবাদি পশুর উন্নতজাত তৈরি করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে উন্নত জাতের ষাঁড় থেকে বীজ বা সিমেন সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর সেই সিমেন দিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানো হয়। ফলে গাভী গর্ভবতী হয় এবং বাচ্চা দেয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াই হল কৃত্রিম প্রজনন। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত বাচ্চার মধ্যে উন্নতজাতের ষাঁড়ের প্রায় ৫০ ভাগ গুণাগুণ থাকতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রজননের দ্বারা ব্যাপক হারে দেশি গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন করা সম্ভব। এভাবে প্রজনন সময় হলে গাভীকে প্রজননের পূর্বে ভালোভাবে পরীক্ষা করে প্রজনন করা বিজ্ঞানসম্মত।
দেশি বকনা সাধারণত আড়াই থেকে তিন বছর বয়সে প্রজননের উপযুক্ত হয়। তবে প্রথম প্রজনন উদ্যমের ২-৩ মাস পরে প্রজনন করানো ভালো। এতে গাভীর জীবনচক্রে বাচ্চা ও দুধ বেশি পাওয়া যায়।

গর্ভবতী গাভীর লক্ষণ ও পরিচর্যা

নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গাভীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছে কিনা বোঝা যায়।

১. কৃত্রিম প্রজননের ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে গাভীটি পুনরায় প্রজনন উদ্যম হবে না।
২. গাভীর স্বভাব ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসবে।

৩. পেট বড় হতে থাকবে এবং কোমর নিচের দিকে নেমে যেতে থাকবে।
৪. গাভীর দুধ উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে থাকবে।
৫. প্রায় ৫ মাস পর বাচ্চার নড়াচড়া বোঝা যাবে।
৬. গর্ভকালের শেষ দিকে ওলান বড় হতে থাকে।

গর্ভবতী গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা

জমিতে বীজ বপনের পর বেশি ফসল ফলানোর জন্য যেমন বিশেষ পরিচর্যার দরকার তেমনি গবাদি পশু পালন করতে বিশেষ বিশেষ পরিচর্যার দরকার। একটি গাভী থেকে উন্নতমানের বাছুর এবং বেশি দুধ ও মাংস পেতে হলে ঐ গর্ভবতী বা দুগ্ধবতী গাভীর পরিচর্যার প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। গর্ভবতী গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর খেয়াল রাখতে হবে।

১. প্রসবের অন্তত এক মাস আগে থেকে গর্ভবতী গাভীকে আলাদাভাবে নিরাপদ ঘরে রাখতে হবে।
২. ঘরের মেঝেতে শুকনো পরিষ্কার খড়কুটা সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে পশু আরাম করে শুতে পারে।
৩. গাভীটিকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।
৪. মশা, মাছি ও হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে।
৫. গাভীর ঘরে যাতে বৃষ্টির পানি না ঢুকতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। পিচ্ছিল কোনো জায়গায় তাকে নেওয়া ঠিক হবে না।
৬. গর্ভবতী গাভীর দ্বারা শ্রমের কাজ করানো যাবে না এবং অন্য পশুর সাথে মাঠে চরতে দেওয়া ঠিক হবে না। পেটে যাতে কোনো আঘাত না পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
৭. ঘর অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম হবে না।
৮. গর্ভবতী গাভীকে প্রথম ১.৫ কেজি এবং ৬ মাস পর থেকে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত ২ কেজি দানাদার খাদ্য দেহরক্ষার জন্য দিতে হবে। সঙ্গে আরো প্রয়োজনীয় খড় ও কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জাতীয় খনিজ পদার্থ বেশি হওয়া প্রয়োজন।
৯. লবণসহ প্রত্যহ পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে।
১০. প্রসবের ৩-৪ দিন পূর্ব থেকে রাতে পাহারা দিতে হবে। কারণ রাত্রে প্রসব করলে গাভী গর্ভ ফুল পড়া মাত্র খেয়ে ফেলতে পারে। এতে গাভীর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

বাচ্চা প্রসবের সময় গাভীর পরিচর্যা

গর্ভকালীন সময়ে গাভীর যেরূপ যত্ন নেওয়া হয় প্রসবকালীন সময়ে এবং বাচ্চা প্রসবের পর ততোধিক যত্নবান হওয়া দরকার। এসময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর নজর দিতে হবে।

১. প্রসবকালীন সময় গাভীকে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে।
২. প্রসবের পর পরই গাভীর ফুল পড়ল কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফুল পড়ে গেলে তা সাথে সাথে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা ভালো। গাভী যাতে ফুল খেয়ে ফেলতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৩. ফুল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না পড়লে পশু চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে ফুল বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. বাচ্চা প্রসবের পর কুসুম গরম পানি দিয়ে গাভীকে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তাকে দানাদার খাদ্য ও গরম পানি খেতে দিতে হবে।
৫. গাভীর বাসস্থান শুকনো ও পরিষ্কার রাখতে হবে।
৬. গাভীর ওলান ও বাট কুসুম গরম পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুতে হবে। বাট থেকে শাল দুধ বের করতে হবে। বাটে বাছুরের মুখ লাগিয়ে শাল দুধ খেতে দিতে হবে।

গর্ভবতী গাভীর দৈনিক সুষম খাদ্য তালিকা

উপকরণ	পরিমাণ
সবুজ ঘাস	১৪-১৫ কেজি
খড় (শুকনো/ভেজা)	৩-৪ কেজি
দানাদার খাদ্য	২-৩ কেজি
পানি	পর্যাপ্ত

দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তালিকা

উপকরণ	পরিমাণ
গমের ভুসি	২ কেজি
খেসারি ভাঙা	২ কেজি
খৈল	৫০০ গ্রাম
চালের কুঁড়া	১.০০ কেজি
চিটা গুড়	৩০০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	১০০ গ্রাম
লবণ	১০০ গ্রাম
সর্বমোট	৬ কেজি

বাছুরের যত্ন

বাছুর প্রসবের পর পর তাকে গাভীর শাল দুধ খেতে দিতে হবে। শাল দুধ খেলে তার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। বাচ্চা প্রসবের পর পরই যে দুধ প্রথম ওলানে আসে তাকে শাল দুধ বলে। বাছুরের প্রথম ৩-৪ সপ্তাহে খুব সংকটপূর্ণ সময়। এ সময় বাছুরকে পরিমাণমতো দুধ খাওয়ানো দরকার। বাছুরকে দুধ পান করানোর পাত্র অবশ্যই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে। কারণ জীবাণু দুধের মাধ্যমে বাছুরের দেহে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে। বাছুর, দুগ্ধ খামারের মূল্যবান সম্পদ। বকনা বাছুরগুলোই পরবর্তীতে গাভীতে রূপান্তরিত হবে। সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে প্রসবের পূর্ব হতেই গাভীর প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। বাছুরের জন্মের পর পরই-

১. নাভি কেটে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে।

২. নাভির কাটা জায়গায় টিংচার আয়োডিন লাগাতে হবে।

৩. বাছুরকে পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে। সদ্যজাত বাছুরকে প্রথম তিনদিন গাভীর শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এই দুধ বাছুরের জন্য খুবই উপকারী। শাল দুধে যথেষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে যা বাছুরকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে রক্ষা করে। একটি বাছুর দৈনিক তার ওজনের দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ খাদ্য খেয়ে থাকে। অর্থাৎ বাছুরের ওজন ১০ কেজি হলে ১ কেজি দুধ খাবে। প্রথম বাছুরের জন্মের তিন মাস পর্যন্ত দুধের চাহিদা অনেক বেশি।

বাছুরের খাদ্য : তিন উপায়ে বাছুরকে খাওয়ানো যেতে পারে।

ক. মায়ের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানো

প্রথম ৩-৪ সপ্তাহ মায়ের দুধ খাওয়াতে হয়। পরে ননী তোলা দুধ খাওয়ানো যায়। ননী তোলা দুধের সাথে ভিটামিন-এ মেশাতে হয়। কেননা ননী তুলে নিলে এই দুধে এসব ভিটামিন থাকে না।

খ. দুধের পরিবর্তে অন্য কিছু খাওয়ানো

যেখানে দুধের দাম বেশি সেখানে এ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। মায়ের দুধ না দিয়ে সস্তা গুঁড়া দুধ, ভুসি ও গুড় গরম পানিতে মিশিয়ে ঠিক মায়ের দুধের মতো খাওয়ানো যায়। এটাই মায়ের দুধের বিকল্প খাবার হিসেবে দেওয়া হয়।

গ. দুধ ও সুষমজাতীয় খাদ্য মিশিয়ে খাওয়ানো

এক্ষেত্রে বাছুরকে ১০-১৫ দিন পর থেকে এই খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হয়। এই খাদ্য গ্রহণে প্রথম কিছুটা অনীহা দেখালেও পরে তা অভ্যাস হয়ে যায়।

বাছুরের দানাদার খাদ্য

উপকরণ	শতকরা হার
গম ভাঙা/জোয়ার ভাঙা	৪০ ভাগ
ভুট্টা ভাঙা	৪০ ভাগ
গমের ভুসি বা চালের কুঁড়া	১৮ ভাগ
লবণ	১ ভাগ
ভিটামিন মিশ্রণ	১ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ

পরিষ্কার পানি এবং খনিজ মিশ্রণ সর্বদা বাছুরের নাগালের মধ্যে থাকা উচিত। বাছুরের বয়স ১৫ দিন হলে নরম, ঘাস, লতা-পাতা, খড় ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। বয়স ৮ সপ্তাহ হলে বাছুরকে ৫০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য ও পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা ঘাস দিতে হবে। বয়স ৬ মাস হতে ১ বছর পর্যন্ত এ জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে প্রতিদিন ২ কেজি দানাদার খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন।

বাছুরের উপযোগী আমিষ জাতীয় দানাদার খাদ্য ২০% এর অধিক এবং ১০% এর কম হওয়া উচিত নয়। দৈনিক প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ঘাস বা উন্নতমানের আঁশ জাতীয় ঘাস থাকলে দানাদার খাদ্য কম দিলেও চলে। অন্যথায় দানাদার খাদ্য দিতে হবে। প্রচুর পরিমাণে পানি, ৭-৭.৫ গ্রাম লবণ ও খনিজ মিশ্রিত করে বাছুরকে সর্বদা দিতে হবে।

বাছুর খোজাকরণ

এঁড়ে বা ষাঁড় বাছুরের অন্ডকোষ দুটি ফেলে দেওয়াকে খোজাকরণ বলে। সাধারণত ছয় মাস বয়সেই খোজা করা ভালো।

স্বাস্থ্যবান বাছুর পেতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর নজর দিতে হবে।

১. আলো বাতাসযুক্ত পরিষ্কার বাসস্থান।
২. জন্মের পরপরই নাভি কেটে তাতে জীবাণুনাশক ওষুধ লাগানো।
৩. জন্মের পর ৩-৪ দিন শাল দুধ পান করানো।
৪. দুধ পান করানোর জন্য জীবাণুমুক্ত পাত্র ব্যবহার করা।
৫. খাদ্যাভ্যাসে হঠাৎ পরিবর্তন না আনা।
৬. উকুন ও পোকা থেকে রক্ষা করা।
৭. অসুস্থ বাছুরকে পৃথক রাখা এবং সুস্থ বাছুরকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

প্রজননক্ষম ষাঁড়ের যত্ন

প্রজননের জন্য যে ষাঁড় ব্যবহার করা হবে তাকে বাচ্চা অবস্থা থেকে ভালোভাবে যত্ন নিতে হবে যাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর তার কাছ থেকে দীর্ঘদিন এবং উঁচু মানের বীজ সংগ্রহ করা যায়। ষাঁড়ের যত্নের ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর নজর দিতে হবে-

১. প্রজননক্ষম প্রত্যেকটি ষাঁড়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে আলাদাভাবে রাখতে হবে।
২. তাদের আলাদা খাদ্য দিতে হবে।
৩. উপযুক্ত পরিমাণ সুষম খাদ্য ছাড়াও তাদের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজনের ওপর খেয়াল রাখতে হবে।
৪. প্রতি ১০০ কেজি দেহের ওজনের জন্য দৈনিক দেড় থেকে দুই কেজি দানাদার খাদ্য ও ৩-৪ কেজি কাঁচা ঘাস দিতে হবে।

৫ সপ্তাহে একবার বা দুইবারের বেশি সিমেন সংগ্রহ করা ঠিক নয়, তাহলে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটবে।

৬ রোগবালাই যাতে তাদের আক্রমণ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, রোগ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে পশু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ গাভী ও বাছুরের দানাদার খাদ্য তৈরিকরণ

উপকরণ

গমের ভুসি, ভাঙা গম, খৈল, জোয়ার, খেসারি বা মাষকলাই, চালের কুঁড়া, লবণ, দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা ও পাত্র।

কাজের ধাপ

১. উপাদান ভিত্তিতে উপকরণগুলো বাছাই কর।
২. পৃথকভাবে উপকরণসমূহের পরিমাণ নির্ণয় কর এবং শিক্ষককে দেখাও।
৩. নির্ণয়ের পর উপকরণসমূহ মেপে নাও এবং মিশ্রিত কর।
৪. সম্পূর্ণ কাজটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

সাবধানতা

১. লবণ ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন খুব কম, সুতরাং উপকরণগুলো মেশানোর পর এই দুটি উপাদান ভালোভাবে মেশাতে হবে।
২. উপকরণের প্রয়োজনীয় পরিমাণ যেন সঠিক হয় সেদিকে যত্নবান হতে হবে।
৩. দানাদার খাদ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় মেশাতে হবে।

বিষয় ঃ বাছুরের খাদ্য তৈরি

উপকরণ

তৈলবীজ, খৈল, গম ভাঙা ভুসি, যব, গম, ছানার পানি, হাড়ের গুঁড়া (সিদ্ধ) ও লবণ।
অন্যান্য বিষয়াবলি গাভীর খাদ্য তৈরির অনুরূপ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাচ্চা প্রসবের কত ঘণ্টার মধ্যে ফুল না পড়লে পশু চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে?

ক. ৮ খ. ১৬
গ. ২৪ ঘ. ৩২

২. বাছুরের জন্মের পর পরই-
i. নাভি কেটে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে
ii. পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করাতে হয়
iii. নাভির কাটা জায়গায় টিংচার আয়োডিন লাগাতে হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. প্রতি ১০০ কেজি দেহের ওজনের জন্য প্রজননক্ষম ষাঁড়ের দৈনিক ২ কেজি দানাদার খাদ্য লাগে। প্রতি কেজি দানাদার খাদ্যের দাম ১০ টাকা হলে ২০০ কেজি ওজনের ষাড়ের ১ মাসের দানাদার খাদ্য খরচ কত লাগবে?

ক. ১১০০ টাকা খ. ১২০০ টাকা
গ. ১৩০০ টাকা ঘ. ১৪০০ টাকা

সৃজনশীল প্রশ্ন

সাঁথিয়া থানার রফিকের বাড়িতে একটি দেশি বকনা বাছুর ও বলদ ছিল। সে মিল্কভিটা থেকে জাত উন্নয়নের পরামর্শ ও ঋণ গ্রহণ করে একটি দুধালো গাভী ক্রয় করে যা দৈনিক ১২ লিটার দুধ দেয়। রফিক তার দেশি বকনাটি প্রজননক্ষম হলে উন্নত জাতের ষাড় দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করায়। সে ক্রয়কৃত গাভীর দুধ বিক্রি করে মিল্কভিটার ঋণ পরিশোধ করতে থাকে। কিছুদিন পর তার দেশি বকনাটিও ক্রয়কৃত গাভীর মতো একটি বাচ্চা প্রসব করে। বড় হতে থাকে তার খামার।

ক. জাত উন্নয়ন কাকে বলে?
খ. জাত উন্নয়নের ১টি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্য কর।
গ. রফিক তার দেশি বকনা থেকে ক্রয়কৃত গাভীটির মতো বাচ্চা পেতে যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিল তার বর্ণনা দাও।
ঘ. রফিকের প্রচেস্টাটি দেশের গো খামার শিল্প বিকাশ ও উন্নত জাত উৎপাদনে কী ভূমিকা রাখতে পারে তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন

নিজ বাড়িতে নিজস্ব পরিবেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুগ্ধ খামার স্থাপনকে পারিবারিক দুগ্ধ খামার বলে। পরিবারকে কেন্দ্র করে আজকাল ছোট ছোট খামার গড়ে উঠেছে। এ ধরনের খামার বেকারত্ব দূর করে পারিবারিক সচ্ছলতা ও আয় বৃদ্ধি করে। পরিবারের দুধের চাহিদা মেটায়। এ জাতীয় খামার ব্যাপক হারে স্থাপনের মাধ্যমে দেশের দুধের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

খামার পরিকল্পনা

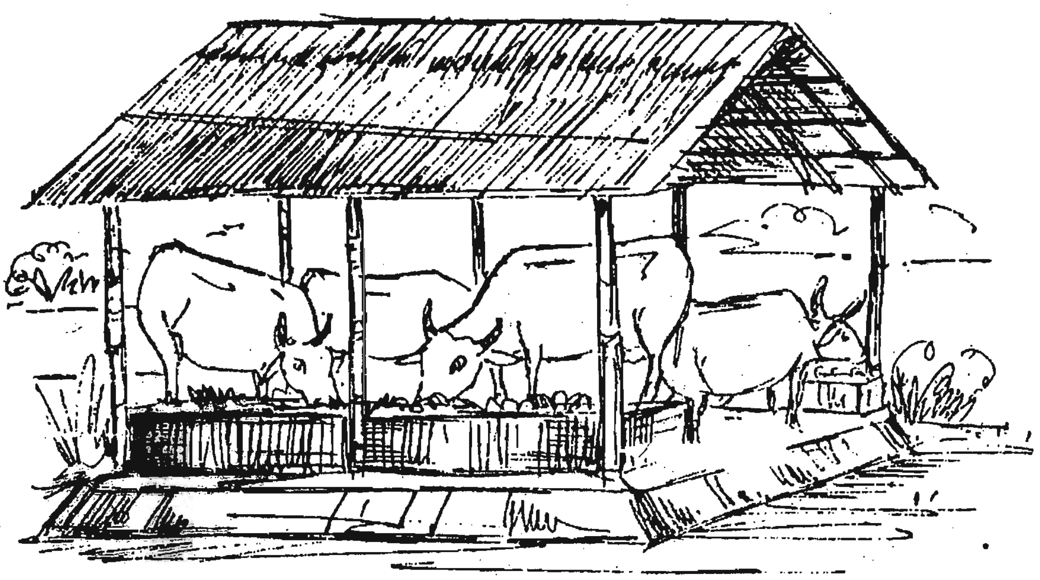
অল্প মূলধন নিয়ে পারিবারিক খামার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে পরিবারের নিজস্ব সুযোগ সুবিধা, জনশক্তি ও মূলধন ইত্যাদি বিবেচনায় এনে পারিবারিক খামারের কাঠামো তৈরি করা যায়। এই কাঠামোর মূল বিষয় হচ্ছে :

১. প্রাথমিকভাবে খামার স্থাপনে এককালীন কত মূলধন দরকার তা নিরূপণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে স্থান নির্বাচন, ঘর তৈরি, গাভীর ক্রয় ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম বাবদ ব্যয় কত লাগতে পারে তার হিসাব করতে হয়। এই ব্যয়কে স্থায়ী ব্যয় বলে।

২. খামারে দৈনিক কত ব্যয় হতে পারে তার হিসাব, গাভীর খাদ্য, টিকা, ওষুধ ইত্যাদি বাবদ ব্যয়কে দৈনন্দিন আবর্তক ব্যয় বলা হয়।

৩. দৈনিক খামার থেকে কত লাভ আসতে পারে তা লিপিবদ্ধ করতে হয়।

৪. খামারের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে গাভী নির্বাচন। উন্নতজাতের গাভী নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান জাতীয় গাভী (সংকর) নির্বাচন করা যেতে পারে। ২-৩টি গাভী দিয়ে খামার শুরু করা যেতে পারে। খামারের লাভের টাকা দিয়ে পরবর্তীতে ৮-১০টি গাভী কেনা যেতে পারে।



পারিবারিক খামার

খামারের আয়-ব্যয় হিসাব

খামারের স্থান বাবদ ব্যয় সাধারণত ধরা হয় না। কারণ নিজস্ব বাড়ির জায়গাতে এই জাতীয় খামার স্থাপন করা হয়।

নিম্নে একটি ছোট পারিবারিক দুগ্ধ খামারের আয়-ব্যয় দেখানো হল।

১। মূলধন বিনিয়োগ টাকা

ক. জমির পরিমাণ- ৬ শতক নিজস্ব

খ. ২টি গাভী বাছুরসহ। (সংকরজাত হলস্টেইন- ফ্রিজিয়ান)
প্রতিটি গাভীর মূল্য ২৫০০০/- টাকা হিসাবে ২টির মূল্য ৫০,০০০/- টাকা (প্রতিটি দৈনিক ১২ লিটার দুধ দেবে)

গ. বাসস্থান- প্রতিটি গাভী ও বাছুরের জন্য ৬ বর্গমিটার হিসাবে ২টি গাভীর জন্য প্রয়োজন ১২ বর্গমিটার। প্রতি বর্গমিটার ২০০০/- টাকা হিসাবে মোট ১২ × ২০০০ = ২৪০০০/- টাকা (একচালা টিনের ঘর)।

ঘ. খাবার পাত্র, পানির পাত্র, দুধ দোহনের বালতি ইত্যাদি বাবদ টাকা = ২০০০/-
মোট মূলধন বিনিয়োগ টাকা = ৭৬,০০০/-

২। আবর্তক ব্যয়

দানাদার খাদ্য : দুধ দেওয়াকালীন সময়ে ২টি গাভীর দানাদার খাদ্য প্রতিটির দৈনিক গড়ে ৩.৫ কেজি করে ২৮০ দিনের খাদ্য ১৯৬০ কেজি।
দুধ না দেওয়াকালীন সময়ে প্রতিটির গড়ে ১.৫ কেজি হিসাবে ২টির ৮০ দিনের দানাদার খাদ্য ২৪০ কেজির প্রয়োজন।
২টি বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্য দৈনিক গড়ে ১ কেজি করে ৩৩০ দিন = ৬৬০ কেজি।
বছরে সর্বমোট দানাদার খাদ্য = ১৯৬০ + ২৪০ + ৬৬০ = ২৮৬০ কেজি।
প্রতি কেজি ১০/- টাকা দরে = ২৮৬০০ টাকা মাত্র।

আঁশ জাতীয় খাদ্য : প্রতিটি গাভীর জন্য দৈনিক গড়ে ৩ কেজি করে ২টির জন্য ৩৬৫ দিনে = ২১৯০ কেজি খড় প্রয়োজন।

প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক গড়ে আধা কেজি হিসেবে ২টি বাছুরের জন্য ৩০০ দিনে = ৩০০ কেজি খড়।
গাভী ও বাছুরের একত্রে খড় প্রয়োজন = ২১৯০ + ৩০০ = ২৪৯০ কেজি।
প্রতি কেজি ১ টাকা হিসাবে মোট দাম ২৪৯০/- টাকা।
প্রতিটি গাভীর জন্য দৈনিক গড়ে ১৫ কেজি হিসাবে ২টি গাভীর জন্য ৩৬৫ দিনে = ১০,৯৫০ কেজি কাঁচা ঘাস।
প্রতিটি বাছুরের জন্য দৈনিক গড়ে ৫ কেজি হিসাবে ২টি বাছুরের জন্য ৩০০ দিনে মোট ৩০০০ কেজি কাঁচা ঘাস প্রয়োজন।
সর্বমোট কাঁচা ঘাস গাভী ও বাছুর একত্রে ১০,৯৫০ + ৩০০০ = ১৩,৯৫০ কেজি প্রয়োজন।
প্রতি কেজি ঘাস ০.৫০ টাকা দরে ১৩,৯৫০ × .৫০ = ৬৯৭৫ টাকা।

৩. গোয়াল ঘর মেরামত বছরে ১০০০/- টাকা।
৪. ওষুধসহ আনুষঙ্গিক খরচ বছরে ২০০০/- টাকা।
৫. একজন রাখালের মজুরি দৈনিক ৪০ টাকা হিসাবে ৩৬৫ দিনে = ১৪,৬০০ টাকা মাত্র।

পারিবারিক দুগ্ধ খামার

আবর্তক ব্যয়	টাকা
ক. দানাদার খাদ্য	২৮,৬০০
খ. আঁশ জাতীয় ঘাস (খড়)	২৪৯০
গ. ঘাস (কাঁচা)	৬৯৭৫
ঘ. গোয়ালঘর মেরামত	১০০০
ঙ. ওষুধসহ আনুষঙ্গিক খরচ	২০০০
চ. রাখালের মজুরি (বছরে)	১৪৬০০
মোট ব্যয়	৫৫,৬৬৫

খামারের উৎপাদন ও আয় (দুধ ও গোবর থেকে)
ক. প্রতি গাভী থেকে প্রাপ্ত দৈনিক ১২ লিটার দুধ ২৮৫ দিন। ২টি গাভীর মোট ২ × ২৮৫ × ১২ = ৬৮৪০ লিটার দুধ উৎপাদন।
প্রথম এক বছরে আয়
প্রতি লিটার দুধ ১৬/- টাকা হিসাবে মূল্য ৬৮৪০ × ১৬ = ১,০৯,৪৪০/- টাকা।

খামার ব্যবস্থাপনা

খামারের আয়-ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে বাবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং খামারের সঠিক ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

দুইটি গাভীর মডেল খামারের হিসাবের উদাহরণ (বার্ষিক)

খাত	বিবরণ	পরিমাণ		মোট টাকা
ক. মূলধন ব্যয়				
জমি	উঁচু জমি/বসতবাড়ি	৬ শতক	নিজস্ব	
ঘর	একচালা টিনের ঘর	১২ বর্গমিটার		২৪,০০০
গাভী	সংকর হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান	২টি গাভী (বাছুরসহ)		৫০,০০০
যন্ত্রপাতি	বিভিন্ন	৪টি		২,০০০
মোট				৭৬,০০০
খ. আবর্তক ব্যয়				
দানাদার খাদ্য	গাভী ও বাছুর	২৮৬০ কেজি		২৮,৬০০
খড়	গাভী ও বাছুর	২৪৯০ কেজি		২,৪৯০
কাঁচা ঘাস	গাভী ও বাছুর	১৩৯৫০ কেজি		৬,৯৭৫
গোয়ালঘর মেরামত	এক বছরে	–		১,০০০
চিকিৎসা ব্যয়	এক বছরে	–		২,০০০
রাখাল/শ্রমিক	এক বছরে	–		১৪,৬০০
মোট ব্যয়				৫৫,৬৬৫
গ. আয়				
দুধ	–	৬৮৪০ লিটার		১,০৯,৪৪০
গোবর	১টি গাভী ও ২টি বাছুর	–		৫০০
বাছুর	বিক্রি (মিশ্র)	২টি বাছুর		১২,০০০
মোট আয়				১,২১,৯৪০

বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব (সংক্ষিপ্ত)

প্রকৃত আয় = মোট আয় (মোট আবর্তক ব্যয় + মূলধন ব্যয়ের ২০% ডিপ্রিসিয়েশন)
এই সূত্রে প্রাথমিকভাবে আয় ব্যয় হিসাব নির্ণয় করা যেতে পারে।

১. খামারের স্থান নির্বাচনে উঁচু জায়গা নিতে হবে। এতে আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
২. গোয়ালঘর নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। সপ্তাহে ২ দিন জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে ঘর ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
৩. খামারে নিয়মিত দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কমপক্ষে ১৫ দিনের খাদ্য সর্বদা ঘরে মজুদ রাখতে হবে। কাঁচা ঘাস চাষের জন্য বাড়ির আঙিনা সংলগ্ন জমি ব্যবহার করা যেতে পারে।
৪. প্রতিদিন গাভীকে ৩ থেকে ৪ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১২-১৫ কেজি কাঁচা ঘাস দিতে হবে। এছাড়া ও দৈনিক ৩-৪ কেজি খড় দিতে হবে। গাভীকে সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে। নিয়মিত গোসল করাতে হবে।

৫. গাভী অসুস্থ হলে তাকে সাথে সাথে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। নিয়মিত টিকা দিতে হবে।
৬. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ দোহন করতে হবে।
৭. গাভীর খাবার ও পানির পাত্র ২-৩ দিন পরপর পরিষ্কার করতে হবে।
৮. গাভীর প্রজনন সময় হলে তাকে সময়মতো প্রজনন করাতে হয়।
৯. প্রতিদিনের খাদ্য খরচ খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।
১০. দৈনিক দুধ বিক্রির টাকা খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো মেনে চললে খামারের উৎপাদন বাড়বে এবং খামার লাভজনক হবে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ একটি পারিবারিক দুগ্ধ খামার পর্যবেক্ষণ

উপকরণ

মাপের জন্য ফিতা, খাতা, কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. শিক্ষক মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক নিকটবর্তী একটি খামারে যাও।
২. খামারটি ভালো করে দেখ এবং খামারের অবস্থান ও আশপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর।
৩. খামারে গরুর জাত, সংখ্যা, দুধ উৎপাদন ও অন্যান্য কার্যক্রম ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।
৪. ব্যবহারিক খাতায় যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ কর।

সাবধানতা

১. খামার পরিদর্শনকালে অসতর্ক অবস্থায় কোনো পশুর কাছে যাবে না।
২. খামারে যাওয়ার পর কোনো পশুকে বিরক্ত করবে না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১-৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নিজ বাড়িতে নিজস্ব পরিবেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুগ্ধ খামার স্থাপনকে পারিবারিক দুগ্ধ খামার বলে। আজকাল পরিবার কেন্দ্রীক অনেক ছোট ছোট খামার গড়ে উঠেছে।

১. পারিবারিক দুগ্ধ খামারে সংকর জাতের কতটি গাভী নিয়ে খামার শুরু করা যায়?
ক. ১-২ টি খ. ২-৩ টি
গ. ৩-৫ টি ঘ. ৫-৭টি

২. গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক হারে পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের-
ক. মাংসের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব খ. দুধের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব
গ. জৈব সারের অভাব মোচন সম্ভব ঘ. দেশের বেকারত্ব পুরোপুরি দূর করা সম্ভব।

৩. পারিবারিক দুগ্ধ খামার -
   i. বেকারত্ব পুরোপুরি দূর করে
   ii. পরিবারের দুধের চাহিদা মেটায়
   iii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. আবু মিয়ার খামারের ১০টি গাভী আছে। প্রতিটি গাভী দৈনিক গড়ে ১০ লিটার দুধ দেয়। তাঁর দৈনিক আবর্তক ব্যয় ১০০০/- টাকা। প্রতি লিটার দুধের দাম ২০/- টাকা হলে আবু মিয়া মাসে কত টাকা সঞ্চয় করে?

ক. ১০,০০০/- টাকা
খ. ২০,০০০/- টাকা
গ. ৩০,০০০/- টাকা
ঘ. ৪০,০০০/- টাকা

সৃজনশীল প্রশ্ন

সারণি : তিনটি গবাদি পশুর খামারের স্থায়ী ব্যয়, আবর্তক ব্যয় এবং মোট আয়।

খামার নম্বর	স্থায়ী ব্যয়	আবর্তক ব্যয়	মোট আয়	প্রকৃত আয়
১	৮০ হাজার টাকা	৬০ হাজার টাকা	১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা	
২	৮০ হাজার টাকা	৫০ হাজার টাকা	১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা	
৩	৬০ হাজার টাকা	৪৬ হাজার টাকা	১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা	

সারণি : পর্যালোচনা করে রিপন তার খামার পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

ক. খামার ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
খ. খামারের ব্যয়ের খাত বর্ণনা কর।
গ. আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ণয় করে দেখাও কোন খামারটি অধিক লাভজনক।
ঘ. কোন খামারটি কম লাভজনক, একে লাভজনক করতে কী করবে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গাভীর দুধ দোহন

গাভী থেকে পরিমিত দুধ সংগ্রহের জন্য দুধ দোহন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনেক। গাভীর ওলানে দুধ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও দুধ দোহন পদ্ধতি না জানার ফলে ঠিকমতো দুধ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

দুধ দোহন পদ্ধতি

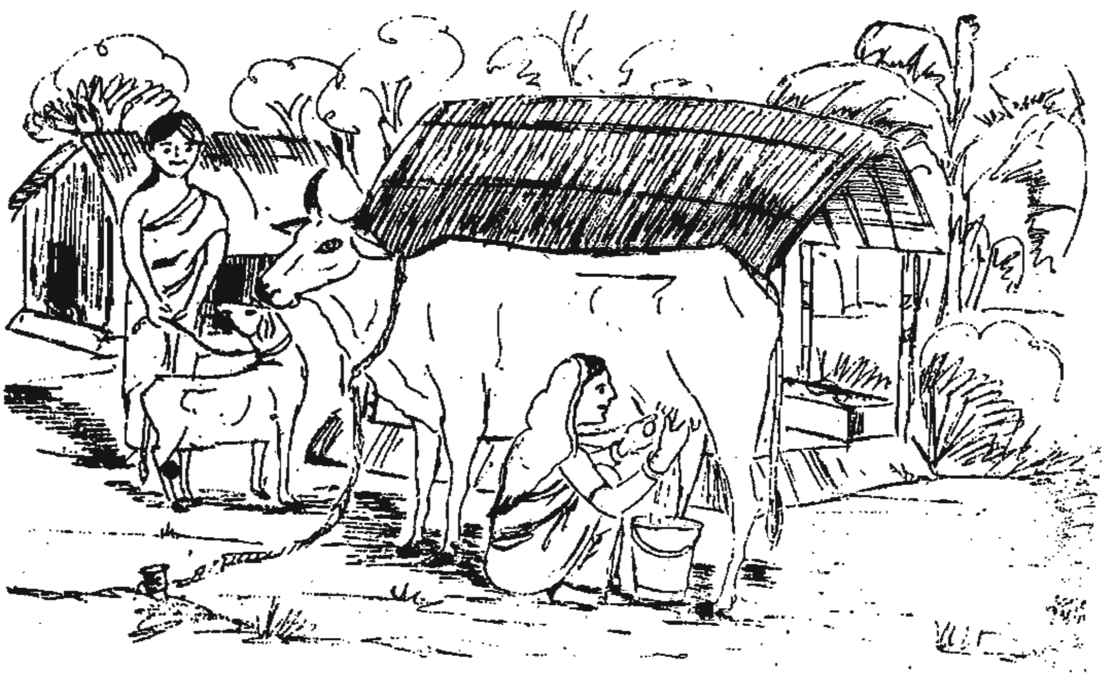
সাধারণত দুই পদ্ধতিতে দুধ দোহন করা হয়।

সনাতন পদ্ধতি : এক্ষেত্রে দোহনকারী কর্তৃক গাভীর ওলান থেকে হাত দিয়ে টেনে দুধ দোহন করা হয়।

আধুনিক পদ্ধতি : মেশিনের সাহায্যে গাভীর ওলান থেকে দুধ বের করে আনা হয়।

দুধ দোহনের প্রস্তুতি হিসেবে দোহনকারীর হাত, গাভীর ওলান, বাঁট ও দোহন পাত্র পরিষ্কার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। অন্যথায় দুধে বহু রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দোহন না করলে গাভীর ওলানে ক্ষতিকারক রোগজীবাণু ঢুকে ওলানে প্রদাহ রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

দুগ্ধবতী গাভী থেকে দিনে ২ বেলা দুধ দোহন করা যায়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে একই ব্যক্তি দ্বারা দোহন করা ভালো। দুধ দোহনের ৬-৭ ঘণ্টা আগে থেকে বাছুরকে তার গাভীর কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে।



দুধ দোহন

নিম্নে দুধ দোহনের সময় করণীয় কাজগুলো আলোচনা করা হল।

১. দুগ্ধবতী গাভীকে এমনভাবে বাঁধতে হবে যেন নড়াচড়া করতে না পারে।
২. বাছুরকে গাভীর কাছে ছেড়ে দিতে হবে যাতে বাছুর গাভীর দুধের বাঁট থেকে দুধ খেতে থাকে।
৩. বাছুরকে সরিয়ে একটি খুঁটিতে বাঁধতে হবে। বাছুরটি গাভীর মাথার কাছে রাখতে হবে।

৪. হাত ও দুধ রাখার পাত্র (বালতি) এবং গাভীর ওলান ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
৫. গাভীর দুধের বাঁট বৃদ্ধ আঙুল ও তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে টেনে দুধ আনতে হবে।
৬. দুধের বাঁট টানার সুবিধার্থে সামান্য তেল ব্যবহার করা যেতে পারে।
৭. দুধ দোহনের সময় কুকুর বা অন্য কেউ যেন গাভীকে বিরক্ত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

দুধ সংরক্ষণ

নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত দুধকে পচনমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলা হয়। দুধের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন সহজ নয়। কারণ দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন খুব সহজে ঘটে। যেমন ফ্রিজে দুধ জমালে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় না ঠিক, কিন্তু দুধের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে যায় ফলে দুধের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। আবার দুধকে ৪ ঘণ্টা পর পর ২০ মিনিট করে ফুটালে প্রায় সব রকম জীবাণুমুক্ত থাকে। তাতেও দুধের পুষ্টিকারিতা কিছুটা কমে যায় উচ্চতাপ প্রক্রিয়ায় কিছু পরিমাণ ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। বড় বড় দুগ্ধজাত খামারে পাস্তুরিকরণের মাধ্যমে দুধের সব রকম রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু বিনষ্ট করা হয়। কাঁচা দুধ অপেক্ষা পাস্তুরাইজ করা দুধকে বেশি সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। গুঁড়া দুধ তৈরি করে বেশ অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়। এতেও দুধের গুণগতমান কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়। দুধ ফুটিয়ে ৭-৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ দুধ দোহন পর্যবেক্ষণ

উপকরণ

দুগ্ধবতী গাভী বাছুরসহ, বালতি, পানি, তেল, খুঁটি, দড়ি, কাগজ কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

শ্রেণী শিক্ষক একটি গাভীর খামারের মালিকের সাথে আলোচনাক্রমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।
১. শিক্ষক মহোদয়ের নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট খামারে যাও।
২. খামার মালিকের ব্যবস্থা মোতাবেক খামার পরিদর্শন কর এবং দুধ দোহন দেখ।
৩. খামারে বিভিন্ন সদ্যজাত গরু ও দুধ দোহন ব্যবস্থা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।
৪. পর্যবেক্ষণের পর সম্পূর্ণ কাজটি কীভাবে করা হল তা ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবন্ধ কর।

সাবধানতা

খামারে দোহন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের সময় গবাদি পশুগুলোকে কোনো রকম বিরক্ত করবে না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বাস্থ্য সম্মতভাবে দুগ্ধ দোহন না করলে গাভীর কোন রোগ হতে পারে?
ক. তড়কা খ. বাদলা
গ. দুধ জ্বর ঘ. ওলান প্রদাহ

২. দুধ পাস্তুরীকরণ করে বাজারে বিক্রি করার কারণ -
   i. জীবানুমুক্ত করা
   ii. স্বাদ পরিবর্তন করা
   iii. অল্প সময়ের জন্য দুধ সংরক্ষণ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i   খ. ii
   গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

৩. দুধ দোহনের সময় কোন পাত্রটি ব্যবহৃত হয়-
   ক. মগ   খ. পাতিল
   গ. গামলা   ঘ. বালতি।

সৃজনশীল প্রশ্ন

তাসনিয়া অসুস্থ নানিকে দেখার জন্য নানাবাড়িতে যায়। অসুস্থ নানি গত দু'দিন থেকে গাভীটি দোহন করতে পারছে না। তাসনিয়াকে নিয়ে তার নানা দুধেল গাভী দোহনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ বাড়ির উঠানে যায়। কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো দুধ তারা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়।

ক. সাধারণত কয়টি পদ্ধতিতে দুধ দোহন করা হয়?
খ. তাসনিয়ার নানা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে দুধ না পাওয়ার মূখ্য দুটি কারণ বর্ণনা কর।
গ. উল্লিখিত পরিস্থিতিতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে গাভীটি থেকে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ পাওয়া যেতে পারে? বর্ণনা কর।
ঘ. তাসনিয়ার দৃষ্টিতে "দুধ দোহন একটি কারিগরি প্রক্রিয়া" উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

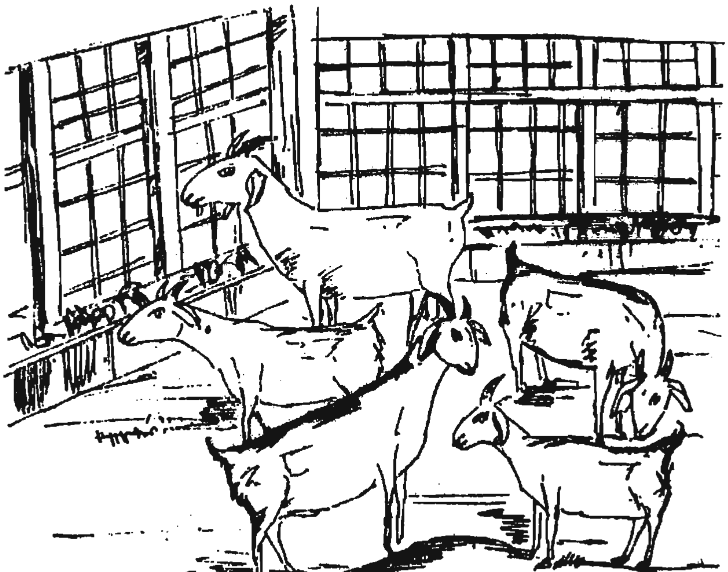
পারিবারিক ছাগল পালন

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছাগল পালন করা হয়। ছাগল মাংস ও দুধ উৎপাদন করে আমিষের চাহিদা মেটায়। ছাগলের চামড়া ও লোম দিয়ে চামড়াজাত সামগ্রী তৈরি ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছাগলের মল জমিতে উত্তম জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

* ২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশের ছাগলের সংখ্যা প্রায় ২.০৭৫ কোটি। এই উপমহাদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগলের চামড়া উন্নতমানের এবং বিশ্বে এর চাহিদা অনেক। ব্ল্যাক বেঙ্গাল জাতের ছাগল একসঙ্গে ২-৩টি বাচ্চা দেয়। অতএব, ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে চামড়া রপ্তানি করেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পারিবারিক ভাবে ছাগল পালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সামান্য মূলধনে পরিবারের সকলেই ছাগল পালনে অংশগ্রহণ করতে পারে। মাত্র একজোড়া ৪ মাসের ছাগী ক্রয় করে পারিবারিক ছাগল পালন শুরু করা যেতে পারে।

১. ছাগলের বাসস্থান

ছাগলের আকৃতি ছোট। এদের পালার জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে গ্রামের কৃষকরা সাধারণত শোবার ঘরে বা বারান্দায় ছালা বিছিয়ে দিয়ে রাত্রে ছাগলের শোবার ব্যবস্থা করে থাকে। এই ব্যবস্থা বাড়ির লোকজনের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অর্থের সংকুলান না হলে শোবার ঘরের সাথে অন্তত বেড়া দিয়ে ছাগলের থাকার ঘর আলাদা নির্মাণ করাই শ্রেয়।



ছাগলের বাসস্থান

ছাগলের সংখ্যা বেশি হলে ছাগল রাখার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করা প্রয়োজন। ছাগলের ঘর উঁচু স্থানে করতে হবে। ঘরে প্রচুর বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঘর যেন স্যাঁতসেঁতে না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে।

প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের ক্ষেত্রে ২ মি. লম্বা ১ মি. প্রশস্ত বাসস্থান তৈরি করা যেতে পারে। ছাগলের ঘরের ছাউনি টিন, ছন অথবা মুলি বাঁশ দ্বারাও দেওয়া যেতে পারে ঘরের মেঝে বা ফ্লোর পাকা করা যেতে পারে এবং বেড়ার নিচে ৬০ সেমি ইটের গাঁথুনি দেওয়া ভালো। এ জাতীয় ঘরের সম্মুখভাগ ২ থেকে ৩ মিটার এবং পিছন দিক ১ থেকে ১.৫ মি.

* উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৮

উঁচু হওয়া প্রয়োজন। এই ঘরের পিছনের দিকে ঢালু করতে হবে। বাঁশ বা কাঠ দ্বারা ঘরের মেঝে বা ফ্লোর থেকে ১ মিটার উঁচু মাচা তৈরি করে ছাগল রাখা যেতে পারে। এ ধরনের মাচা ছাগলের আরামে থাকার জন্য উপযুক্ত। এ ক্ষেত্রে মেঝে বা ফ্লোর থেকে মাচায় ওঠার জন্য বাঁশের সিঁড়ি তৈরি করে দিতে হয়। ঘরের মেঝেতে মাচা তৈরি করে দিলে মাচার ফাঁকে মলমূত্র নিচে পড়ে যায়। ঘর পরিষ্কার করতে সুবিধা হয়। ঘরে আলো-বাতাস ভালোভাবে চলাচল করতে পারে।

পরিচর্যা

আবহমানকাল থেকে এদেশের গৃহস্থের ঘরে ছাগল অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। পারিবারিক ছাগল পালনে বড় সুবিধা হল, ছাগলের পিছনে খাটুনি কম। এর জন্য বাড়তি মানুষ নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। খুব ভোরে ছাগলের ঘর থেকে ছাগল বের করে উঠানে বেঁধে দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর দানাদার খাবার খাওয়াতে হয়। বেলা ৯-১০ টার দিকে ছাগল মাঠে চরাবার জন্য বেঁধে দিয়ে আসতে হবে।

দুধ উৎপাদন করা না হলে অথবা শুধু মাংসের জন্য ছাগল পালন করলে বাচ্চাকে মাঠে মায়ের সাথে চরাতে দিতে হবে। মায়ের সাথে বাচ্চারও যত্ন নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যদি দুটো বাচ্চা থাকে তবে দুটো বাচ্চা যেন মায়ের দুধ সমানভাবে পায়।

চিকিৎসা

নিয়মিত ছাগল ও ছাগলের বাচ্চাকে ক্রিমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। নিয়মিত রোগ প্রতিরোধের টিকা দিতে হবে।

২. ছাগলের খাদ্য

ছাগল প্রধানত খোলা জায়গায় ঝোপ-ঝাড়ে বা মাঠে চরে লতাপাতা খেয়ে থাকে। সবুজ পাতা ও শুকনো ঘাস এদের পছন্দনীয়। এরা সাধারণত ময়লা ও ভিজা খাবার খেতে চায় না। এরা যে কোনো গাছ এমনভাবে মুড়ে খায় যা সহজে পুনরায় গজায় না।

কাঁঠাল, ঝিগা, বট, আম, মান্দার ইত্যাদি গাছের পাতা এদের বিশেষ পছন্দনীয়। এছাড়া সবুজ শাকসবজি ও দানাদার খাদ্য যেমন ওট, বার্লি, ভুট্টা, বিভিন্ন প্রকার তৈল বীজ, খৈল ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। যে কোনো আস্ত দানার পরিবর্তে ভাঙা দানা খেতে এরা বেশি পছন্দ করে।

গরু, মহিষ ও ভেড়ার ন্যায় ছাগলও রোমন্থনকারী পশু। এদের পাকস্থলি চারটি ভাগে বিভক্ত। খাদ্য গ্রহণের পর খাদ্যগুলো চর্বিত না হয়ে পাকস্থলিতে জমা হয়। পরে অচর্বিত খাদ্যগুলো আবার মুখে নিয়ে এসে চিবায়। এই প্রক্রিয়ার জন্যই তাদেরকে রোমন্থনকারী পশু বলা হয়।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি

ছাগল পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে সামনের দুই পা গাছে বা বেড়ায় ঠেকিয়ে গাছের লতা, গুল্ম টেনে ছিঁড়ে খায়। শক্ত ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে অনায়াসে অত্যধিক ক্ষুদ্র ঘাস, সবুজ পাতা, পাতার কুঁড়ি ইত্যাদি টেনে খাওয়া ছাগলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। খাদ্যের টক, ঝাল, লবণাক্ততা, মিষ্টতা ইত্যাদি স্বাদের পার্থক্য করার ক্ষমতাও অন্যান্য পশুর তুলনায় ছাগলের অনেক বেশি।

বাচ্চা ছাগলের খাদ্য

জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে বাচ্চাকে মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এই শাল দুধ তিন দিন পর্যন্ত খাওয়ানো প্রয়োজন। শাল দুধে খাদ্য উপাদানসমূহ স্বাভাবিক দুধের চাইতে বেশি থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি। ফলে বাচ্চার জন্য এই দুধ খুবই উপকারী। জন্মের ১ম সপ্তাহে বাচ্চাকে দিনে ৩-৪ বার দুধ খাওয়াতে হবে। ২-৩ কেজি ওজনের বাচ্চাকে দৈনিক ৩০০ থেকে ৪০০ মিলি দুধ সকাল এবং বিকালে খাওয়ানো উচিত। এছাড়াও প্রতিটি বয়স্ক বাচ্চার জন্য ১০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন। সেই সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ কাঁচা ঘাস দিতে হবে।

পূর্ণ বয়স্ক দুধ দেওয়া ছাগীর জন্য দানাদার খাদ্যের একটি তালিকা দেওয়া হল।

উপকরণ	পরিমাণ
ছোলা	৭ কেজি
ভুট্টা	১৮ কেজি
বাদাম খৈল	১২.৫ কেজি
গমের ভুসি	১০ কেজি
খনিজ মিশ্রণ	১.৫ কেজি
লবণ	১ কেজি
মোট	৫০ কেজি

দৈনিক একটি বড় ছাগলকে ১৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হয়। দুগ্ধবতী ছাগীর প্রতিটির জন্য দিন ৪০০ গ্রাম অতিরিক্ত খাদ্য খেতে দিতে হবে। ইহা দিনে ২ বার ভাগ করে দিতে হবে। এর সঙ্গে ঘাস, লতাপাতা পর্যাপ্ত পরিমাণ মতো পরিষ্কার পানি দিতে হবে।

প্রজননক্ষম পাঁঠা

প্রজননক্ষম পাঁঠাকে সর্বদা সবুজ ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে। প্রজনন মৌসুমে তাকে দৈনিক ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি দানাদার খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। প্রতি ক্ষেত্রেই খাদ্যের সাথে পরিষ্কার পানি খেতে দিতে হবে।

৩. খামার ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খামার ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনার আগে ছাগলের খামার সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা থাকা উচিত। যেখানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছাগল প্রতিপালন করা হয় তাকে ছাগলের খামার বলে। খামারের স্থায়ী ও দৈনন্দিন যাবতীয় কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাধান এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকেই খামার ব্যবস্থাপনা বলে। উন্নত ব্যবস্থাপনা খামারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

খামারের স্থান

১. আশপাশের স্থান হতে খামারের জায়গা উঁচু হতে হবে, যাতে পানি না জমে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ময়লা পানি খামারে ঢুকতে না পারে।
২. উন্মুক্ত ও খোলা জায়গায় খামারটি হওয়া উচিত। এতে প্রচুর আলো-বাতাস চলাচল করতে সুবিধা হবে।
৩. খামারের ভেতরে ও আশপাশে চারণ ভূমি থাকা দরকার। খামারের ভেতর বিভিন্ন প্রকার গাছ যেমন- ইপিল ইপিল, কাঁঠাল, ঝিগা, আম, জাম ইত্যাদি চাষ করে ছাগলকে খাওয়ানো যায়।
৪. খামারে যথেষ্ট পরিমাণ পরিষ্কার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৫. শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ছাগলের খামারে প্রয়োজনীয় ঘর

১. ছাগী রাখার ঘর
২. খাসি রাখার ঘর
৩. বাচ্চা পালনের ঘর
৪. গর্ভবতী ও প্রসূতি ছাগলের ঘর
৫. অসুস্থ ছাগলের ঘর
৬. পাঁঠা পালনের ঘর
৭. খাদ্য রাখার ঘর
৮. স্টোর রুম

খামার স্থাপনের আনুষঙ্গিক সুবিধাদি, যেমন

১. বিদ্যুতের সরবরাহ থাকা উচিত
২. খামারের সাথে শহরের যোগাযোগ থাকা দরকার।
৩. সুলভে খাদ্য সংগ্রহের সুবিধা থাকা দরকার।
৪. সুলভে শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা থাকা দরকার।

ছাগলের ঘর তৈরি

১. ছাগলের ঘর তৈরিতে সাধারণত দেশি নির্মাণ সামগ্রী যেমন টিন, এসবেসটাস, ছন, মুলি, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করাই উত্তম। এ সকল সামগ্রী সুলভে সর্বত্র পাওয়া যায়। প্রয়োজনে ৩-৪ বছর পর বদলানো যায়। তবে পাকা ঘরও তৈরি করা যেতে পারে।
২. ছাগলের খামারের ঘরগুলো সারিবদ্ধভাবে এবং দক্ষিণমুখী হওয়া উত্তম। এতে অল্প সময়ে ঘরের সকল কার্যক্রম, যেমন খাবার দেওয়া, চলাফেরা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যায়।
৩. ঘরগুলোতে যাতে আলো-বাতাস ঢুকতে পারে এবং ছাগল আরামে থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

ছাগলের ঘরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়

ক. যৌথ বা একত্রে থাকার ঘর

খ. পৃথক স্টল যুক্ত ঘর।

ক. যৌথ বা একত্রে থাকার ঘর : যে ঘরে অথবা কক্ষে একত্রে অনেকগুলো ছাগল থাকার ব্যবস্থা করা হয় তাকে যৌথ বা একত্রে থাকার ঘর বলে। এ ধরনের ঘরে ছাগলের বয়স ও উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে পৃথকভাবে রাখা যায়। এ জাতীয় ঘরে একত্রে অনেক ছাগল পালন করা যায়। সংখ্যা অনুপাতে ঘরের জায়গা বাড়াতে হয়। দুগ্ধবতী ছাগলকেও যৌথ ঘরে রাখা যায়। তবে এদের জন্য পৃথক ঘর থাকা ভালো। কারণ দুধ উৎপাদনের জন্য তাদের পৃথকভাবে দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। ঘরের মেঝে পাকা এবং উঁচু হওয়া ভালো। অথবা কাঠের বা বাঁশের মাচা করে দেওয়া যেতে পারে।

খ. পৃথক স্টল যুক্ত ঘর : যে ঘরে প্রতিটি ছাগলকে পৃথক পৃথক খোপে বা কক্ষে রাখা হয় তাকে স্টল ঘর বলে। এ ধরনের স্টল ঘরে দুগ্ধবতী, গর্ভবতী ও প্রসবকালীন দানাদার খাদ্য পৃথকভাবে দেওয়া যায়। পাঁঠার স্টল ছাগীর স্টল থেকে দূরে থাকা উচিত। প্রতিটি স্টলে আলো-বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকা উচিত। ঘরের মধ্যে উভয় দিকে স্টলের ব্যবস্থা থাকলে, খাদ্য পরিবেশনের রাস্তা উভয় সারির মধ্য বরাবর থাকা ভালো। এতে ছাগলের পরিচর্যার সুবিধা হয়। স্টলের পিছন দিকে একটু ঢালু থাকা ভালো তাতে মলমূত্র অপসারণের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা সহজ হয়।

স্টলে পানি এবং ঘাস দেওয়ার পাত্র রাখার ব্যবস্থা থাকে। এগুলো প্রতিদিন পরিষ্কার রাখা দরকার যাতে রোগজীবাণু জন্মাতে না পারে। স্টলের এক পাশে ঘাস জাতীয় খাদ্য নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরী ঝুড়ির ব্যবস্থা থাকে।

ড্রেন বা নর্দমা ব্যবস্থা

খামারের নর্দমা ব্যবস্থা এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে ছাগলের পায়খানা, প্রস্রাব অতি সহজেই সরাসরি ড্রেনের মাধ্যমে গর্তের মধ্যে জমা হয়। এই জাতীয় গর্তকে ‘সারপিট’ বলে। সারপিটের উপরে ছাউনি দেওয়া হয় যাতে বৃষ্টির পানি এবং রোদের আলো ঢুকতে না পারে।

খামারের দৈনন্দিন কার্যক্রম

১. প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ঘরের মলমূত্র পরিষ্কার করে ছাগল আঙিনায় ছেড়ে দিতে হবে।
৩. প্রজননের সময় হলে ছাগীকে প্রজননের ব্যবস্থা করাতে হবে।
৪. খামারের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক যথাসময়ে কাজে যোগদান করল কিনা তা দেখতে হবে।

দুধ দোহন

প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে দুধ দোহন করা উচিত। দিনে একবার সকাল ৯টা-১০টার মধ্যে তা করা যেতে পারে। এই এলাকার ব্ল্যাক বেঙ্গাল জাতের ছাগলের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কম, দৈনিক ৪০০ থেকে ৫০০ মিলি। অনেক সময় বাচ্চার জন্যই এই দুধ যথেষ্ট নয়। কিন্তু অধিক দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের ক্ষেত্রে সকালে ও বিকালে দুধ দোহন করা যেতে পারে।

ছাগলের শরীর ব্রাশ করা

ছাগলের শরীর পরিষ্কার রাখার জন্য প্রত্যহ বিকালে তাকে ব্রাশ করা দরকার। ছাগল জন্মগতভাবেই পানি বা ঠান্ডায় স্পর্শকাতর। তাই গোসলের পরিবর্তে তাকে ব্রাশ করে পরিষ্কার করা দরকার। এতে শরীরে উকুন জাতীয় পোকা বা ময়লা থাকবে না।

স্বাস্থ্য পরিচর্যা

প্রতিটি ছাগলের জন্য বয়স অনুপাতে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে। খাবার পাত্র ও পানির পাত্রসহ ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি পরিষ্কার করে সপ্তাহে দুই দিন রোদে শুকাতে হবে। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত এবং দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য রেজিস্টারে লিপিবন্ধ করতে হবে।

ছাগলের কানে নাম্বার লাগানো

খামার পর্যায়ে ছাগলকে চিহ্নিত করার জন্য তার কানে এক প্রকার নাম্বার লাগানো হয়। এই নাম্বার দ্বারা ছাগলকে চিহ্নিত করা হয় এবং হিসাব খাতায় লিপিবন্ধ করা হয়।

অনুৎপাদনশীল ছাগল বাছাই

অনুৎপাদিত ছাগল বাছাই করে তা বিক্রি করে দিতে হয়। অন্যথায় খামারের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

শ্রমিক নিয়োগ

খামারের দৈনন্দিন কার্যাবলি ও ছাগলের পরিচর্যার জন্য খামারে শ্রমিক নিয়োগ প্রয়োজন। একজন শ্রমিক দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা কাজ করবে। প্রতি ১০০টি ছাগল পালনের জন্য ২-৩ জন শ্রমিক প্রয়োজন।

বাণিজ্যিক ছাগলের খামারে নিম্নলিখিত তথ্যাবলি ও বিষয়সমূহ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন

১. সম্পদ তালিকা এতে থাকবে যন্ত্রপাতি, ছাগলের সংখ্যা, ছাগলের ঘর, বাসস্থান ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী।
২. ছাগলের স্টক রেজিস্টার।
৩. দুধ ও মাংস উৎপাদন রেজিস্টার।
৪. ছাগী প্রজনন রেজিস্টার।
৫. খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ রেজিস্টার (দানাদার খাদ্য)।
৬. বাচ্চা উৎপাদন রেজিস্টার।
৭. চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য পরিচর্যা রেজিস্টার।
৮. মৃত্যু রেকর্ড রেজিস্টার।
৯. আয়-ব্যয়ের হিসাবের রেজিস্টার।
১০. শ্রমিক হাজিরা খাতা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ছাগল কোন স্বাদগুলোর পার্থক্য অনুভব করতে পারে?

ক. টক, ঝাল, লবণাক্ততা খ. টক, তিতা, মিষ্টিতা
গ. ঝাল, কষ, টক ঘ. ঝাল, তিতা, টক

২. যদি একটি ছাগল পালনে ২মি × ১মি জায়গায় প্রয়োজন হয়। তবে ৫০ মিটার জায়গায় কতটি ছাগল পালন করা যাবে?

ক. ১০ খ. ১৫
গ. ২৫ ঘ. ৫০

৩. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিশ্বে জনপ্রিয়; কারণ -

i. এর চামড়া উন্নতমানের
ii. এর মাংস সুস্বাধু
iii. এর দুধ সুস্বাধু।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণদান করে থাকে। অল্প বয়সেই স্বামী মারা গেলে দিশেহারা আকলিমা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ করে। আকলিমা ছাগল পালনের জন্য নিজ বাড়িতে উপযুক্ত ঘর নির্মাণ করে এবং ৪টি ছাগী ক্রয় করে। একটি ছাগী ছয় মাস বয়সে গর্ভধারণ করে ও বছরে ২ বার করে প্রতি বারে ২-৩ টি বাচ্চা দেয়। তিন বছরেই ছাগল বৃদ্ধি পেয়ে ২৫টি তে উন্নীত হল। ইতোমধ্যেই তিনি ঋণ পরিশোধ করে সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছেন।

ক. রোমন্থনকারী পশু কী?
খ. ছাগলের ঘর কেমন হওয়া উচিত ব্যাখ্যা কর।
গ. তিন বছরে আকলিমার ৪টি ছাগল বৃদ্ধি পেয়ে ২৫টিতে উন্নীত হল। গর্ভধারণকাল ও এককালীন প্রসব বিবেচনা করে বিষয়টি বর্ণনা কর।
ঘ. দারিদ্র্য বিমোচনে আকলিমার পারিবারিক ছাগল পালনের ধারণাটি মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গবাদিপশুর রোগ

সাফল্যজনকভাবে গবাদি পশুপালন করতে হলে গবাদি পশুর রোগ সময়মতো প্রতিরোধ ও দমন করতে হয়। একটি সুস্থ পশু সবার কাম্য। তাই একটি সুস্থ ও অসুস্থ পশু চেনা খুবই প্রয়োজন। বাহ্যিক লক্ষণ দেখেও তা বোঝা যেতে পারে। একটি সুস্থ পশুর বাহ্যিক লক্ষণ নিম্নরূপ –

১. পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সজাগ থাকবে ও গতিবিধি স্বাভাবিক হবে।
২. নাক, মুখ ও চোখ পরিষ্কার থাকবে ও নাকের অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু ঘাম থাকবে
৩. শরীরের লোম মসৃণ থাকবে, কান ও লেজ নেড়ে মশা মাছি তাড়াবে।
৪. খাওয়ার রুচি থাকবে এবং খাওয়ার পর জাবর কাটবে।
৫. মলমূত্রের প্রকৃতি স্বাভাবিক থাকবে।

উপরে বর্ণিত সুস্থ পশুর লক্ষণগুলোর কোনো ব্যতিক্রম দেখা দিলেই বুঝে নিতে হবে পশুটি অসুস্থ।

গবাদি পশুর রোগের প্রকার

গবাদি পশুর রোগসমূহকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন

১. সংক্রামক রোগ
২. পরজীবীঘটিত রোগ
৩. অপুষ্টিজনিত রোগ
৪. বিষক্রিয়াজনিত রোগ।



গরুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

রোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা

রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য সতর্কতা হিসেবে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলা হয়। গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. বর্তমানে বিভিন্ন রোগের টিকা বের হয়েছে। গবাদি পশুকে নিয়মিত টিকা দিলে বহু সংক্রামক রোগ থেকে পশুকে রক্ষা করা যায়।
২. পুষ্টিহীনতার জন্য গবাদি পশুর নানা প্রকার রোগ হয়ে থাকে। গবাদি পশুকে সুষম খাদ্য খাওয়ালে অপুষ্টিজনিত রোগের মাত্রা কমে যায়।
৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনেক রোগ প্রতিরোধের উপায়। গবাদি পশুকে নিয়মিত গোসল করালে, বিশুদ্ধ পানি ও টাটকা খাদ্য খাওয়ালে পশু সাধারণত রোগমুক্ত থাকে।
৪. গবাদি পশুর বাসস্থান জীবাণুনাশক ওষুধ মিশ্রিত পানি দিয়ে প্রতিদিন ধুয়ে দিলে পরিবেশ ভালো থাকে।
৫. রোগে আক্রান্ত পশুকে তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা করতে হবে যাতে সুস্থ পশুতে রোগ না ছড়ায়।
৬. কোথাও একসঙ্গে অনেক পশু হঠাৎ মারা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১। সংক্রামক রোগ

বাংলাদেশে গবাদি পশুর সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবই সবচেয়ে বেশি। এসব রোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন –

ক. ভাইরাস সংক্রামিত রোগ
খ. ব্যাকটেরিয়া সংক্রামিত রোগ।

ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষুরা রোগ, জলাতঙ্ক রোগ ও গো-বসন্ত। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত রোগের মধ্যে তড়কা, বাদলা, গলা ফুলা, ওলান প্রদাহ, নিউমোনিয়া, টিটেনাসই প্রধান। এসব রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার নিম্নে দেওয়া হল।

ক. ভাইরাসজনিত রোগ

ক্ষুরা রোগ

ক্ষুরা রোগ ভাইরাস জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এই রোগ ছোঁয়াচে। গবাদি পশুর মুখ ও ক্ষুরা এই ভাইরাসের প্রধান আক্রান্ত স্থান।

আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে এলে পানি, খাদ্য, চারণভূমির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে। ভাইরাস দ্রুত মুখের ভেতর, জিহ্বায় ও পায়ের ক্ষুরায় ছড়িয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ

মুখে ও ক্ষুরায় ঘা হওয়া এ রোগের প্রধান লক্ষণ। ভাইরাস দেহে ঢুকলে রোগ প্রকাশ পেতে দুই থেকে পাঁচ দিন সময় লাগে। মুখ দিয়ে লালা পড়ে। শরীরের তাপমাত্রা ৪০.৫ থেকে ৪১.২ সে. গ্রে. পর্যন্ত ওঠে। আক্রান্ত পশু কিছু খেতে পারে না।

জিহ্বায় ও মুখে ঘা হয়। দুধাল গাভীর দুধ কমে যায়। শারীরিকভাবে পশু দুর্বল হয়ে পড়ে। পায়ের ক্ষুরে ঘা হওয়ায় হাঁটতে পারে না। এ রোগে আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।



ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত গরুর মুখে ফেনা

চিকিৎসা

১. পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত পানিতে পা ও মুখ বারবার ধুয়ে দিতে হবে।
২. বরিক এসিড ও ফিটকারি পানিতে মিশিয়ে বারবার মুখ ধুয়ে দিতে হবে।
৩. এন্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

১. ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত পশুকে আলাদা করে দিতে হবে।
২. খামার বা গোয়াল ঘর জীবাণুনাশক ওষুধ যেমন– ডেটল বা ফিনাইল দ্বারা ভালোভাবে ধুয়ে দিতে হবে।
৩. রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে আশপাশের সকল সুস্থ পশুকে ক্ষুরা রোগের টিকা দিতে হবে।

ভাইরাসজনিত রোগ

জলাতঙ্ক রোগ

জলাতঙ্ক ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। সাধারণ কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী এই ভাইরাসের জীবাণু বহন করে। ভাইরাসে আক্রান্ত কুকুরের কামড়ে গবাদি পশু আক্রান্ত হয়। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত পশুর মুখের লালায় ভাইরাস থাকে। আক্রান্ত পশুর কামড়ের ফলে এই ভাইরাস সুস্থ মানুষ ও প্রাণীতে ছড়িয়ে পড়ে। সুস্থ প্রাণীর দেহের ক্ষতে লালা লেগে এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত পশুর কামড়ানোর ১৪ দিন, ৩ মাস, কখনও ৬ মাস পর রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত পশু পাগলামি ভাব দেখায়। এমনকি আক্রমণ করতে তেড়ে আসে। মুখ দিয়ে লালা ঝরবে, পরে আস্তে আস্তে পক্ষাঘাত দেখা দেবে। পশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে। খাবার খেতে চায় না। পশুর নিচের চোয়াল ঝুলে যায়। জিহ্বা বেরিয়ে আসে, পশু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এক সময় মাটিতে শুয়ে পড়ে ও মারা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর চিকিৎসায় কোনো ফল পাওয়া যায় না। কারণ রোগজীবাণু ততক্ষণে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ করে ফলে। রোগাক্রান্ত গবাদি পশু অন্য সুস্থ পশুকে কামড়ালে কামড়ানোর স্থান সাথে সাথে সাবান বা সাইট্রিক এসিড দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। পোষা কুকুরকে যথাসময় প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য বেওয়ারিশ কুকুর মেরে ফেলতে হবে।

চিকিৎসা

এই টিকা ৩০ মিলি করে দিনে একবার করে মোট ১৪ দিন চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হয়।

গো-বসন্ত রোগ

এটি ভাইরাস জীবাণু ঘটিত সংক্রামক রোগ। দুগ্ধবতী গাভীর ওলান ও বাঁটের ত্বক, ষাঁড়ের শুক্র থলির ত্বক এবং বাছুরের মুখের ত্বকে এই রোগ হয়। গোয়ালার হাত, দুগ্ধ দোহন যন্ত্রের টিটকাপের দ্বারা ও মশা মাছির কামড়ে এই রোগ সংক্রামিত হয়।

রোগের লক্ষণ

রোগাক্রান্ত পশুর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। সরিষার দানার মতো লাল লাল দাগ বা ফুসকুড়ি বের হয়। ঐ ফুসকুড়িগুলো এক হয়ে ফোস্কার মতো আকার নেয়। মুখে ও খাদ্য নালিতে ঘা হয়। পায়খানা পাতলা ও মুখে দুর্গন্ধ হয়। পশুর শ্বাসকষ্ট হয়। আক্রান্ত পশু কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়।

চিকিৎসা

১. ক্ষতে ব্যবহারযোগ্য জীবাণুনাশক মলম বা লোশন ব্যবহার করা যেতে পারে।
২. এন্টিবায়োটিক বা সালফোনিলামাইড ইনজেকশন দিলে পশু সুস্থ হয়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

আক্রান্ত পশুকে আলাদা ঘরে রাখা উচিত। প্রতিরোধ হিসেবে সুস্থ পশুকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।

খ. ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগ

তড়কা

তড়কা ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি মারাত্মক রোগ। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

রোগাক্রান্ত পশু খুব অল্প সময় বাঁচে। পশুর দেহের তাপমাত্রা ৪১.৭° সে. গ্রে. পর্যন্ত উঠতে পারে। পাতলা বা রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হতে পারে। প্রস্রাবেও রক্ত থাকতে পারে। নাক, মুখ ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মতো রক্তযুক্ত ফেনা বের হয়। পশু হঠাৎ মাটিতে ঢলে পড়ে এবং খিচুনি দিয়ে মারা যায়।

চিকিৎসা

অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায় না। তবে প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পশুকে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিলে ভালো হতে পারে। পেনেসিলিন ইনজেকশন ১০-৪০ লাখ ইউনিট পর পর ৩-৪ দিন প্রধানত উরুর উপরের মাংসপেশিতে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বর্ষাকালে বিশেষ করে স্যাঁতসেঁতে ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। তাই বর্ষার পূর্বেই পশুকে টিকা দিতে হয়।

বাদলা

এটাও গবাদিপশুর একটি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। গুরু, মহিষ, ভেড়া এই সংক্রামক রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের বাছুরই বেশি আক্রান্ত হয়। কাটা ঘা দিয়ে জীবাণু দেহে প্রবেশ করে।

রোগের লক্ষণ

১. রোগাক্রান্ত পশু দলছাড়া হয়ে ঝিমুতে থাকে। পরে খোঁড়াতে দেখা যায়।
২. খুব তাড়াতাড়ি রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত ৪৮ ঘণ্টায় মধ্যেই আক্রান্ত পশু মারা যায়।
৩. আক্রান্ত পশুর দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
৪. দেহের স্থানে স্থানে ফুলে যায়। ফুলা জায়গায় হাত দিলে চড়চড় শব্দ হয়।
৫. আস্তে আস্তে ফুলা স্থান কালচে রঙের হয়ে যায় এবং পচন ধরে।
৬. রোগাকান্ত পশু খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায়।

চিকিৎসা

রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এণ্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। তড়কা রোগের ন্যায় একই ধরনের চিকিৎসা করাতে হয়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

রোগ দমনের জন্য সুস্থ পশুকে ৬ মাস বয়স থেকে ৬ মাস অন্তর টিকা দিতে হবে।

গলা ফুলা রোগ

এই রোগ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সকল বয়সের পশুই আক্রান্ত হয়। বর্ষার পরপর স্যাঁতসেঁতে জমিতে পশুকে চরালে এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। অসুস্থ পশুর লালা, মলমূত্র, দূষিত খাদ্য ও পানি দ্বারা এ রোগ ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ

১. অসুস্থ পশুর মাথা, গলা ও গলকম্বল ফুলে যায়।
২. দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং পাতলা পায়খানা হয়।
৩. জাবর কাটা ও দুধ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।
৪. চোখ দিয়ে সর্বদা পানি পড়ে।
৫. আক্রান্ত পশুর শ্বাসকস্ট হয়। গলা বাড়িয়ে হা করে মুখের সাহায্যে শ্বাস নিতে চেস্টা করে।
৬. রোগাক্রান্ত পশু ২৪-৩৬ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

চিকিৎসা

এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন বা সালফোনিলামাইড জাতীয় ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

১. আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করতে হবে।
২. গ্রামের সকল সুস্থ পশুকে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
৩. নিয়মিত টিকা প্রদান রোগ প্রতিরোধের উপায়।

ওলান প্রদাহ

ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়। কাটা ঘায়ের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। সাধারণত দুগ্ধ উৎপাদনশীল গাভী ও ছাগী এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ

১. ওলান ফুলে যায়।
২. দেহের তাপ বেড়ে যায়।
৩. দুধ দোহন করলে দুধে রক্তাক্ত হলদে বর্ণের তলানি পড়ে।
৪. ওলানের ভেতরে পুঁজ হয়। দুধ কমে যায়। ওলান ও বাঁট ক্রমশ শক্ত হয়ে দুধ বন্ধ হয়ে যায়। যথাসময়ে চিকিৎসা না করালে ওলান সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। গাভী মারাও যেতে পারে।

চিকিৎসা

১. নিয়মিত দুধ বের করতে হবে, যাতে ওলানে দুধ না থাকে।
২. আক্রান্ত গাভীকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এণ্টিবায়োটিক দিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

গাভীকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে যাতে ওলানে ময়লা না লাগে। অপরিষ্কার হাতে কখনও দোহন করা যাবে না। যাতে কোনো প্রকার আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

নিউমোনিয়া রোগ

এটাও একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। প্রধানত ঠান্ডা পরিবেশে এই রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

১. আক্রান্ত পশুর কাশি হয় ও নাক মুখ দিয়ে সর্দি বের হয়।
২. পশু ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে। শ্বাস নিতে শব্দ হয়। পশুর খাওয়া কমে যায়।
৩. রোগের তীব্রতায় দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

চিকিৎসা

১. আক্রান্ত পশুকে শুকনো পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে।
২. খড় দিয়ে পশুর বিছানা করে দিতে হবে যেন ঠান্ডা না লাগে।
৩. পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়াতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

পশুর বাসস্থানের পরিবেশের প্রতি সর্বদা যত্ন ও খেয়াল নিতে হবে। অসুস্থ পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা রাখতে হবে।

কাফ স্কাওয়ার রোগ

সাধারণত কম বয়সী বাছুরের এই ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ হয়। এটা বাছুরের জন্য একটি মারাত্মক রোগ। রোগে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বাছুর সাদা, পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা শুরু করে।

রোগের লক্ষণ

১. বাছুর সাদা পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা করতে থাকে। প্রথম দিকে জ্বর হয় এবং তাপমাত্রা বেড়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে তাপমাত্রা কমে স্বাভাবিকের নিচে নেমে আসে।

২. বাছুর ধীরে ধীরে নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। খাওয়া ছেড়ে দেয় ও মারা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

১. বাছুরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে।
২. জন্মের পর পর বাছুরকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
৩. অসুস্থ বাছুরকে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডিপথেরিয়া রোগ

এটি বাছুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি মারাত্মক রোগ। ছয় মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরের এই রোগ দেখা দেয়। অপরিষ্কার খাবার পাত্রের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। একই সাথে অনেকগুলো বাছুরের ডিপথেরিয়া হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

১. প্রথমেই দেহে তাপ বৃদ্ধি পেয়ে মুখ থেকে লালা ঝরে, খাবার খেতে অসুবিধা হয়।
২. কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয় এবং দেহের ওজন কমে যায়।

চিকিৎসা

পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চিকিৎসা দিতে হবে। যথাসময়ে চিকিৎসা ও যত্ন করলে ভালো হয়। খাবারের পাত্র সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

পরজীবীঘটিত রোগ

দুটি জীবন পরস্পর সাহচর্যে অবস্থানকালে যদি জীবন ধারণের জন্য অপর জীবটির ওপর নির্ভর করে উপকৃত হয় তবে উপকার প্রাপ্ত জীবটিকে পরজীবী বলে। পরজীবী যার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে তাকে পোষক বলে। বাংলাদেশে ৮০%-৮৫% গবাদি পশু পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়।

অবস্থান অনুসারে পরজীবী দুই প্রকারের হয় :

১। **অন্তঃপরজীবী :** পোষকের দেহের ভেতরে অবস্থান করে। যেমন-সব ধরনের কৃমি।
২। **বহিঃপরজীবী :** পোষকের দেহের বাইরে থাকে। যেমন- উকুন, আটালি, মাছি ও মশা।

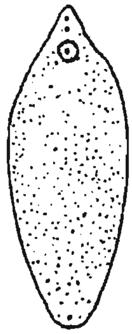


গবাদি পশুর আটালি ও উকুন

অন্তঃপরজীবী

তিন ধরনের অন্তঃপরজীবী গবাদি পশুর ক্ষতিসাধন করে। যেমন-

১. গোলকৃমি
২. পাতাকৃমি
৩. ফিতাকৃমি



পাতা কৃমি

বহিঃপরজীবী

বহিঃপরজীবী আমাদের দেশে গবাদিপশুর যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এরা কামড়িয়ে রক্ত শোষণ করে গবাদিপশুর চামড়ার ক্ষতি করে থাকে। গবাদি পশুর দেহের ক্ষতিকারক বহিঃপরজীবীর মধ্যে মাছি, মশা, উকুন, আটালি ও মাইটস প্রধান। এসব পরজীবী গবাদি পশুর দেহের চামড়ার উপর বাস করে রক্ত শোষণ করে। ফলে পশু রক্তশূন্য হয়ে যায়। আক্রমণের ফলে পশু অস্বস্তি বোধ করে। যন্ত্রণায় শক্ত বস্তুর সাথে শরীর ঘসে ঘসে চামড়ার ক্ষতি করে।

তাছাড়া এসব পরজীবী চামড়াকে ছোট ছোট ছিদ্র করে দেয়, ফলে চামড়ার মূল্য কমে যায়। অনেক সময় চামড়া ছিদ্র করে ডিম পাড়ে এবং ছিদ্র পথে ঘা হয়। অত্যধিক বহিঃপরজীবীর আক্রমণে পশুর দৈহিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়, কম খায়। ফলে দুধ কমে যায়। কর্মক্ষমতা কমে যায়।

চিকিৎসা

বহিঃপরজীবী দমনে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তার নির্দেশ মোতাবেক দেহে ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। পশুর চামড়ায় আরও অনেক রোগ হয়। যেমন-দাদ ও চুলকানি, জোয়াল কান্দা ও কুঁজে ঘা।

দাদ : এই রোগটি সংক্রামক ও ছত্রাক দ্বারা ঘটে থাকে। গবাদি পশু এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়, ক্ষত থেকে রস পড়ে। চোখের ও মুখের চারপাশেই এটা বেশি দেখা যায়। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

জোয়াল কান্দা : সাধারণত জোয়ালের ঘসায় ঘসায় ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত জায়গা ফুলে ওঠে। ক্ষতে রোগজীবাণু ও মাছি বসে তার পরিধি বাড়িয়ে দেয়। সময়মতো চিকিৎসা না করালে পশুর কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। রোগ দমনে পশুকে বিশ্রাম দিতে হয় ও ক্ষতে ওষুধ দিতে হয়।

কুঁজে ঘা : মাছি দ্বারা এই রোগ বিস্তার লাভ করে। কুঁজে কোনো জীবাণু দ্বারা ক্ষত সৃষ্টি হলে সেখানে মাছি বসে এই রোগ বাড়িয়ে দেয়। মাছি সেখানে ডিম পাড়ে। ফলে ঘা বেড়ে গিয়ে অনেক সময় পচন ধরে। পশু খাওয়া কমিয়ে দেয় ও কার্যক্ষমতা হারায়। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হয়।

পরজীবী প্রতিরোধ ও দমনের উপায়

১. গোয়াল ঘর, আশপাশের জায়গা ও চারণভূমি পরিষ্কার রাখতে হয়।
২. গোশালায় পরিমাণ মতো চুন ছড়িয়ে দিলে ভালো হয়।
৩. জলাবদ্ধ জমিতে গবাদি পশুকে চরানো যাবে না।
৪. কৃমিনাশক ওষুধ নিয়মিত খাওয়াতে হবে।
৫. গবাদি পশুর দেহ ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
৬. প্রতিদিন গরু মহিষকে গোসল করাতে হবে।
৭. আটালি ও মাইট জাতীয় বহিঃপরজীবীকে হাত দিয়ে মেরে ফেলতে হবে।
৮. আবর্জনা শুকিয়ে রাতে নিয়মিত গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দিতে হবে।

অপুষ্টিজনিত রোগ : সাধারণত সুষম খাদ্যের অভাবে এই রোগ হয়। গবাদি পশু যাতে তার প্রয়োজন মতো সুষম খাদ্য পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। গবাদি পশুকে আমিষ, শর্করা, স্নেহ জাতীয় পদার্থ নেওয়ার পরও ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, কোবাল্ট, দস্তা ও ভিটামিন দেওয়া উচিত। অপুষ্টিজনিত রোগের মধ্যে হাড় রোগ, দুধ জ্বর ও বন্ধ্যাত্ব্য প্রধান।

গাভীর দুধ জ্বর দমন

গাভীর বাচ্চা প্রসবের পর পরই এই রোগ দেখা দিতে পারে। এটি একটি পুষ্টিজনিত রোগ। গাভীর দুধের সাথে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম বের হওয়ার ফলে এই দুধ জ্বর হয়। এই রোগে আক্রান্ত গাভী মাটিতে শুয়ে পড়ে ঘাড় উল্টিয়ে মাথা পিঠের সাথে যুক্ত করে রাখে। সময়মতো চিকিৎসা না করালে গাভীটি মারা যেতে পারে। এই সময় গাভীকে প্রচুর কাঁচা ঘাস ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য ও খনিজ পদার্থ দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

টিকা সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিধি

ক. টিকা সংরক্ষণ : টিকা সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ না করা হলে এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। সংরক্ষণের নির্দেশনা বোতলের গায়ে লেখা থাকে। আবার আলাদা কাগজেও লেখা থাকে। যে টিকা হিম শুষ্ক অবস্থায় ভায়েলে বা স্পুলে থাকে সেগুলো শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচে রাখতে হবে সেজন্য এসব টিকা রেফ্রিজারেটরে, ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে। তড়কা, বাদলা, ক্ষুরা রোগ ও গলাফুলা রোগের তরল টিকা বোতলে ভরে ৪০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখতে হবে। টিকা নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ব্যবহার করা উচিত নয়।

খ. টিকা পরিবহণ : বিভিন্ন স্থানে টিকা বীজ পৌছানোর জন্য সঠিকভাবে পরিবহণ করতে হবে। পরিবহণে ত্রুটি হলে টিকা বীজের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। টিকা শীতল ভ্যানে করে জেলা সদরে সরবরাহ করে শীতল কক্ষে বা ছোট ছোট ফ্লাস্কে ভরে বরফ দিয়ে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যেতে হয়। টিকা প্রয়োগের সময়সীমা পর্যন্ত টিকার শীতলতা বজায় রাখতে হবে। নতুবা টিকার গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাবে।

গ. টিকা ব্যবহার পদ্ধতি : টিকা বীজ সংগ্রহকালে টিকা উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ব্যবহার বিধি জেনে নিতে হবে। এছাড়া বোতলের গায়েও ব্যবহার বিধি লেখা থাকে। বিভিন্ন টিকার ব্যবহার বিধি ও পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হল।

টিকা পরিচিতি : বাংলাদেশে নানা ধরনের সংক্রামক রোগ আছে। সব রোগের টিকা এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হয়নি। তবে যে সকল সংক্রামক রোগের টিকা গবাদি পশুকে দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলো হল-

১. রিন্ডার পেস্ট
২. ক্ষুরা রোগ
৩. জলাতঙ্ক
৪. তড়কা
৫. বাদলা
৬. গলাফুলা
৭. গো-বসন্ত
৮. পি পি আর।

ক্ষুরা রোগের টিকা : এই টিকা গবাদি পশুর চামড়া বা গলকম্বলের নিচে ইনজেকশন দিয়ে দিতে হয়। প্রতিটি গরু, মহিষকেও ইনজেকশন দিতে হয়। আবার ৪ মাস পর আরেকটি এরপর প্রতি বছর ১টি করে ইনজেকশন দিতে হয়। বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত টিকার ডোজ বিভিন্ন হতে পারে।

জলাতঙ্ক : এই টিকা গরু, মহিষের পেটের চামড়ার নিচে দিনে একবার দেওয়া হয়। দৈনিক ৩০ মিলি হিসেবে মোট ১৪ দিন দিতে হয়।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে কুকুরের ৩ মাস বয়সে মাংসপেশিতে প্রথম টিকা দিতে হয়। এক বছর অন্তর একই মাত্রায় এ টিকা দিতে হয়। এই টিকা ভর্তি ভায়েল ফ্রিজে রাখতে হয়। বিশুদ্ধ পানি দ্বারা এই টিকা দিতে হয়।

গবাদি পশুর তাপমাত্রা, নাড়ির স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হার পরীক্ষা :

তাপমাত্রা নির্ণয়

গবাদি পশুর দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়ের থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের পূর্বে থার্মোমিটারের পারদ ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিচের দিকে নামাতে হয়। থার্মোমিটারে ভেসলিন লাগিয়ে তা গবাদি পশুর মলদ্বারের মিউকাস ঝিল্লি যাতে স্পর্শ করে এরূপভাবে ২-৩ মিনিট রাখতে হয়। তারপর থার্মোমিটার বের করে পারদের রিডিং নিলে পশুর দেহের সঠিক তাপমাত্রা জানা যায়।

গৃহপালিত পশুর দেহের তাপমাত্রা

পশু	তাপমাত্রা	গড় তাপ
বাছুর	৩৮.৫-৪০° সে.গ্রে	৩৯.৫° সে.গ্রে
গাভী	৩৭.৫°-৩৯.০° সে.গ্রে	৩৮.৫° সে.গ্রে
ষাঁড়	৩৮.৩৫-৩৯.৫° সে.গ্রে	৩৮.৯° সে.গ্রে
বলদ	৩৭.৫°-৩৯.৫° সে.গ্রে	৩৮.৫° সে.গ্রে
মহিষ	৩৭.৫°-৩৯.৫° সে.গ্রে	৩৮. ৫° সে.গ্রে
ছাগল	৩৮.৩৫°-৪০.৬০° সে.গ্রে	৩৯.৫° সে.গ্রে
ভেড়া	৩৮.৫°-৪০° সে.গ্রে	৩৯. ৫° সে.গ্রে

নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় পদ্ধতি

গবাদি পশুর নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করা খুব সহজ। এদের চোয়ালের ধমনী বা লেজের গোড়ার নিচের দিকের ধমনীকে আঙুলের মৃদু চাপ দিয়ে নাড়ির স্পদন হার জানা যায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে নাড়ির স্পন্দনের কিছুটা তারতম্য হতে পারে। সাধারণত কম বয়সে নাড়ির স্পন্দন বেশি থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্পন্দন কমতে থাকে।

গবাদি পশুর দেহের স্বাভাবিক নাড়ির স্পন্দন হার নিচে দেওয়া হল।

গবাদি পশুর নাড়ির স্পন্দন হার (প্রতি মিনিটে)

বাছুর	৯০-১০০ বার
গাভী	৬০-৯০ "
ষাঁড়	৪০-৬০ "
বলদ	৩৫-৫৫ "
মহিষ	৬৫-৯০ "
ছাগল	৬৫-৯০ "
ভেড়া	৬৫-৯০ "

শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নির্ণয়

প্রতি মিনিটে গবাদি পশুর শ্বাস-প্রশ্বাস কত তা জানা থাকা দরকার। শ্বাস-প্রশ্বাসের তারতম্য হলেই বুঝতে হবে পশুটি অসুস্থ। কাজেই পশুটির দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেও শ্বাস-প্রশ্বাস কমবেশি হতে পারে। যেমন-পাকস্থলি অধিক পূর্ণ হলে, দেহে অত্যধিক চর্বি জমে গেলে, উত্তেজিত হলে, গর্ভাবস্থায়, অত্যধিক পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় বেশি পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে তা বাড়তে পারে।

গবাদি পশু স্থিরভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় তার পাশে দাঁড়িয়ে বুক ও পেটের ওঠানামা মিনিটে কতবার হচ্ছে তা গণনার মাধ্যমে অতি সহজেই শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া নাকের সম্মুখে হাত রেখেও মিনিটে কতবার শ্বাস ত্যাগ হচ্ছে তা গণনা করে হার জানা যায়।

পশুর শ্বাস প্রশ্বাসের হার (প্রতি মিনিটে)

বাছুর	৩০-৪০ বার
গাভী	২৪-৩০ "
ষাঁড়	১০-৩০ "
ছাগল	১২-২০ "
ভেড়া	১২-২০ "

ওষুধ খাওয়ানো এবং ইনজেকশন ব্যবহারের পদ্ধতি :

১. সরাসরি ওষুধ খাওয়ানো
২. দেহের বহিরাংশে ওষুধ লাগানো
৩. দেহে সরাসরি ইনজেকশন দেওয়া।

১. গবাদি পশুকে ওষুধ খাওয়ানোর আগে চিন্তা করতে হবে কী ধরনের ওষুধ খাওয়ানো হবে। তরল ওষুধ, গুঁড়া ওষুধ, পিল (ছোট বড়ি), ট্যাবলেট, বোলস (বড় ধরনের বড়ি), ক্যাপসুল।
২. মাংসপেশিতে সুই ফুটানো — সাধারণত উরুর মাংসপেশিতে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে জোরে চামড়া ছেদ করে মাংসের মধ্যে সুইটা ঢুকিয়ে দিতে হয়। এরপর সিরিঞ্জের ওষুধটা পুরে দিতে হয়।
৩. শিরায় সুই ফুটানো — গবাদি পশুর গলার দু পাশে মোটা শিরাগুলোতে ইনজেকশন দেওয়া হয়।
৪. চামড়ার নিচে সুই ফুটানো — এক্ষেত্রে পেটের গলকম্বলের চামড়ায় ইনজেকশন দিতে হয়।
৫. কোমরের হাড়ের ফাঁকে সুই ফুটানো — কোমরের শেষ হাড় এবং লেজের প্রথম হাড়ের সংযোগ স্থলে ইনজেকশন দিতে হবে।

ব্যবহারিক

বিষয় ঃ গরুর নাড়ির স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নির্ণয়

উপকরণ

একটি গরু।

কাজের ধাপ

১. গরুর চোয়ালের নিচের ধমনী, লেজের গোড়ার নিচের ধমনী স্পর্শ করে নাড়ির স্পন্দন হার নির্ণয় করে
২. ব্যবহারিক খাতায় ধাপ উল্লেখপূর্বক নাড়ির স্পন্দন হার লেখ এবং শ্রেণী শিক্ষককে দেখাও।

সতর্কতা

১. গরুকে আদর করে অগ্রসর হবে।
২. কখনও গরুকে উত্তেজিত করবে না।
৩. গরুকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে একাজ করতে হবে।
৪. একাজের জন্য শান্ত গরু হলে ভালো হয়।

বিষয় ঃ গো-বসন্তের টিকা বীজ ব্যবহার হাতে কলমে শিক্ষা

উপকরণ

একটি গরু, গো-বসন্তের টিকা বীজ, ইনজেকশন সিরিঞ্জ, সুই, তুলা, গরম পানি, স্পিরিট, বিশুদ্ধ পানি, টিকা মেশানোর বাক্স, ডেটল।

কাজের ধাপ

১. গবাদি পশুর খামারে অথবা কৃষকের বাড়িতে যাও।
২. একটি গরুকে শক্ত খুঁটির সাথে বাঁধ।
৩. গরম পানি দ্বারা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, সুই ভালোভাবে ধুয়ে নাও।
৪. সাবধানতার সাথে টিকা বীজের ভায়েলের মুখ ভেঙে নাও।
৫. সিরিঞ্জ ও সুই সংযুক্ত কর।
৬. সিরিঞ্জ দ্বারা ২-৩ সিসি বিশুদ্ধ পানি ভায়েলের ভেতরে ঢুকাও।
৭. ভায়েলের ভেতরে পানি ও টিকা বীজ নাড়াচাড়া করে মেশানোর পাত্রে ঢেলে দাও।
৮. সিরিঞ্জ দ্বারা মেশানো পাত্রের পানি ও টিকা বীজ ভালোভাবে মেশাও।
৯. ১ মিলি করে মিশ্রিত টিকা বীজ সিরিঞ্জে পুরে নিয়ে গরুর গলার চামড়ার নিচে ইনজেকশন দাও।
১০. ব্যবহারিক খাতায় গরুর বিবরণ, টিকার নাম, তারিখ ইত্যাদি লিখে রাখ।

সতর্কতা

১. গরুকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
২. টিকা বীজ ভায়েল সতর্কতার সাথে খুলতে হবে।
৩. টিকা বীজ মেশানোর পর ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে এবং ১ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

পশু চিকিৎসক ইউনুছ সাহের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসে লক্ষ করলেন বাড়ির আঙিনায় বাঁধা কয়েকটি গরুর কাঁধের ক্ষতে কিছু মাছি বসে আছে। তিনি গরুর মালিককে এ সমস্যার সমাধানের পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে কয়েক মাসেই এ রোগটি সেরে গেল।

১. গরুর কী রোগ হয়েছিল?
ক. দাদ খ. জোয়াল কান্দা
গ. কুঁজে ঘা ঘ. চুলকানি

২. রোগটি কোন ধরনের?
ক. সংক্রামক খ. পরজীবী ঘটিত
গ. বিষক্রিয়াজনিত ঘ. চর্মজাত

৩. এ রোগের চিকিৎসা হল -

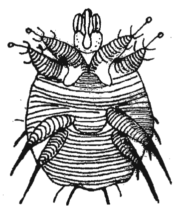
i. পশুকে বিশ্রাম দেওয়া
ii. ইনজেকশান দেওয়া
iii. ক্ষতে ওষুধ প্রয়োগ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

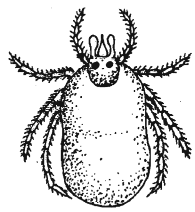
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

চিত্র দুটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র-১



চিত্র-২

ক. পরজীবী কী?
খ. অবস্থান অনুসারে পরজীবী কত প্রকার ও কী কী। পরজীবীর আক্রমণে পশুর ক্ষতির অন্যতম একটি দিক বর্ণনা কর।
গ. চিত্র- ১ এবং চিত্র- ২ এর পরজীবীদ্বয়ের আক্রমণের ক্ষতি থেকে পশু সম্পদ রক্ষার্থে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
ঘ. পশু সম্পদের ক্ষেত্রে চিত্র- ১ এবং চিত্র-২ এ বর্ণিত পরজীবীদ্বয়ের ক্ষতির ভয়াবহতার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২০১০
শিক্ষাবর্ষ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন - দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোল
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য